বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

ত্রয়োদশ অধিবেশন।

মেদিনীপুর

কার্য্য-বিবরণী।

বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সাল

১লা বৈশাখ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

ত্রয়োদশ অধিবেশন

মেদিনীপুর

সূচনা।

বর্ষে বর্ষে সাহিত্য সম্মিলনের পবিত্র মণ্ডপে জননী বীনাপাণির পূজার া্য অর্ঘ্য-সম্ভার হস্তে সমবেত ভক্ত মণ্ডলীর পার্শ্বে রিক্ত মনে দীনবেশে ার দাঁড়াইয়াছি ততবারই মেদিনীপুরে অনুরূপ পূজার আয়োজন করিয়া ভক্তের সমাবেশ দেখিবার ও তাহাদের সেবা সাহচর্য্যে ধন্য হইবার একটা া বাসনা হৃদয়ে জাগিয়াছে। কত রজনীতে সে বাসনা সোনার স্বপ্নরূপে া উঠিয়াছে। কল্পনা নয়নে দেখিয়াছি মেদিনীপুরের এই বন্ধুর কঙ্করময় যেন এক অপরূপ নন্দনকানন রচিত হইয়াছে, কত সুধী সাধু গুনী ও বাণীসেবকগণের পদরেণুস্পর্শে সে দেশ এক পুণ্যতীর্থে পরিণত য়াছে আর সেখানে নিবিড় তিমির রাত্রির অবসানে প্রকৃতি যেন জ্ঞানদাত্রী তধাত্রীর উদ্ভাসিত রূপশ্রী হেরিয়া পুলক আলোকে তাঁহারই বন্দনায় হতেছেন।

চল মর্ম্মর পত্র গহন নূপুর তব বাজে
শ্যাম বিপিন শীর্ষে তব ঘন কুন্তল রাজে,
রঞ্জিত পদ রাগে, রক্ত কমল জাগে
ভাতিল তব দুগ্ধ ধবল হাস্য কুমুদজালে
চন্দন রজ অঙ্গ সুরভি, রবি সিন্দুর ভালে;
ভেদ দ্বন্দ্ব মোচন করি সেবকজন মাতৃ
এস জ্ঞানদাত্রী! গো এস জগতধাত্রি!

কিন্তু হায়! চকিতের মধ্যে দরিদ্রের মনোরথের মত আমাদের সে হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই বি...ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সালের ড়া সহরে নববর্ষের আনন্দধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনের মিলনগীতি উচ্চে া যখন নীরব হইয়া গেল এবং পর পর দুইবার আসিয়া নববর্ষ অতর্কিতে খায় চলিয়া গেল, হৃদয়ের দ্বারে বাণীর ভক্তগণের মধুর মিলনরাগের ল সুরই আর আসিয়া পৌঁছিলনা তখন কোন দিনই যে আর সুপ্ত বাসনা সফল হইবার আশা নাই ইহা বুঝিয়া শাখা পরিষদের ক্ষুদ্রতম

কেন্দ্রে বাণীর নিভৃত সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বি
সম্মিলনের প্রাণ স্বরূপ পরলোকগত মহাত্মা ব্যোমকেশ বোধ হয় মেঘের
পরপারে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাই তিনি যেন
আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার অজনকল্প প্রিয়শিষ্য আমাদের
অগ্রজোপম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের মর্ম্মস্থলে আসিয়া
আবির্ভূত হইলেন। এক অলৌকিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত মহাশয়
আমাদিগকে বারবার মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য
অনুরোধ করিলেন। নিজেদের দৈন্য অভাব ও অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া
এই বিরাট ব্যাপারে দেশের সহানুভূতি ও সম্মতি লাভের পূর্ব্বে আমরা
তাঁহাকে এ বিষয়ে সহসা কোনও আশা দিতে পারিলাম না। আশানুরূপ
উত্তর না পাইয়া তিনি স্বয়ং মেদিনীপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রথম দিন
বার লাইব্রেরীতে দিবসের কার্য্য শেষে দেশের গণ্যমান্য কয়েকজনকে লইয়া
এক পরামর্শ সভার বৈঠক হইল। কিন্তু উৎসাহে ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে
সে বৈঠকে যেরূপ নিরুৎসাহের বাতাস বহিল তাহাতে আশার ক্ষীণ দীপ
শিখাটুকুও নিভিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় একবারে দমিয়া গেলেন, আমাদের
চিরপোষিত আশার মূলে ছাই পড়িল দেখিয়া আমরাও কম মর্ম্মাহত
হইলাম না। সৌভাগ্যের কথা মেদিনীপুরের ক্ষুদ্রতম সাহিত্য পারিষৎ স্বীয়
স্রষ্টা ব্যোমকেশের অলক্ষিত স্নেহ দৃষ্টি হইতে সে দুর্দ্দিনেও বঞ্চিত
হয় নাই; বুঝিবা তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের ন্যায় কয়কটি
দীনতম সেবকের মস্তকে তাঁহার আশীষ ধারা বর্ষণ করিতে ছিলেন।
তাই আবার মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের কয়েকটি ক্ষুদ্র সেবক
আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে পরিষদ গৃহে আনিয়া বসাইলাম। দেশের
সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে অগ্রণী প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মাইতি
মহাশয় এবং আমাদের উদ্যমশীল সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু
সরস্বতী এম্ এ, বি, এল্ মহাশয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া সাহস সহকারে সম্মিলন
আহ্বান করিয়া বসিলাম। বলিতে কি, তখনও পর্য্যন্ত আমাদের সম্বল মাত্র
মায়ের রাঙ্গা পা দুখানি; অতিথি সৎকারের জন্য সামান্য নীবার কণাও তখনও
সঞ্চিত হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বাহ্নেই এই সংবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য
সম্মিলন পরিচালন সমিতিতে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলেন। বঙ্গাব্দ ১৩২৮

সালের ২৪শে মাঘ, ইংরাজী ১৯২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এই সমিতির অধিবেশনে মেদিনীপুর হইতে সম্মিলন আহ্বানের প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হইল এবং পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর এই সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। ইহার অনতিকালপরেই অক্লান্তকর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় আবার মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমত বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের ২৯শে মাঘ, ইংরাজী ১৯২২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় বেলীহলে একটি সাধারণ সভা আহূত হইল। মেদিনীপুরের পক্ষ হইতে আমরা এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি দেখিয়া সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমাদের কাতর আহ্বান মেদিনীপুরবাসী সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল তাই তাঁহারা দলে দলে আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত মহাশয় সেদিন সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। দেশবাসীর সহায়তা লাভ করিয়া নবীন আশা উৎসাহ ও উদ্যমে সেদিন পঙ্গু হইয়াও আমরা যেন গিরিলঙ্ঘনের পণ সঙ্কল্প করিলাম। অচিরে অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়া এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া আমরা নিজ নিজ অক্ষম স্কন্ধে গুরুতর সেবার ভার গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। তারপর বাণীর অভয় নাম স্মরণে পরলোকগত মহাত্মা ব্যোমকেশের চরণোদ্দেশে বারবার সভক্তি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া উৎসাহ সহকারে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম, এ, পি, আর, এস, সি, এস মহোদয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া এই দুরূহ সেবাব্রত গ্রহণ করায় আমরা তাঁহাকে সাদরে আমাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলাম। আমাদের এই সারস্বত যজ্ঞে দেশের রাজপুরুষগণ, জমিদারবর্গ ব্যবসায়ী ও ব্যবহারজীবিগণ সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার প্রতিনিধি ও সম্পাদকগণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারীগণ, স্বেচ্ছাসেবকবর্গ এবং দেশের আপামর জনসাধারণ সকলেই অর্থ সামর্থ্য এবং উৎসাহ ও সহানুভূতি দানে আমাদের এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন এই প্রসঙ্গে আমাদের বিদ্যোৎসাহী, দানশীল, জমিদার কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁন বাহাদুরের লোকপ্রিয় সদর সবডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিচরণ

বসু রায় শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বসু বাহাদুর এবং মেদিনীপুর মতি প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ফকির দাস চন্দ্র মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মিলনের সাফল্য কল্পে নানারূপ বিশেষতঃ অর্থ সাহায্যে ইঁহাদের অকৃত্রিম সহায়তা ও সহানুভূতি না পাইলে মেদিনীপুরে এই প্রকার হিতানুষ্ঠান সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। আমরা চিরদিনই ইঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিব।

তারপর নববর্ষের আনন্দবাসরে শ্রদ্ধাভাজন রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর মহাশয়ের উদ্বোধন বাঁশরী রবে বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীর প্রান্ত হইতেও মায়ের ডাকে যে দিন ভক্তের দল বিচিত্র সুরভি কুসুমদাম লইয়া তাঁর মন্দির দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন সেদিন কৃতাঞ্জলিপুটে পুলকাশ্রুবিগলিত নয়নে সমস্বরে গাহিলাম।

মাগো! সার্থক হো'ক, সার্থক হো'ক
পূজা আয়োজন সব,
আজি, মিলন বাসরে, ধ্বনিয়া উঠুক
ভক্তের কলরব।
তব, ধ্যান মন্দিরে আজি কুতূহলে,
দিল অঞ্জলি যারা দলে দলে
ধন্য হউক, ধন্য হউক,
তাহাদের জয় রব।
আজি, জ্ঞানেরি প্রদীপে লহ মা আরতি;
ভাব ভাষা রূপে জাগো মা ভারতী
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
সাধনার গৌরব।
আজি, তোমার নামেতে পরাণে পরাণে,
প্রীতির যমুনা বহুক উজানে,
সত্য হউক, সত্য হউক,
এ মিলন উৎসব।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ, পরিষদের সভ্য মহাশয়গণ, ও ভ্রাতৃগণ,

আজ আমাদের সুপ্রভাত; বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে আজ আপনাদিগকে উপস্থিত দেখে আমরা—মেদিনীপুরনগরবাসী ও মেদিনীপুর প্রদেশবাসী সকলে ধন্য হ'লাম। মেদিনীপুর নগরে যে এ বৎসর এ অধিবেশন হ'তে পারবে তা আমরা অতি অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেও মনে স্থান দিতে পারি নাই। সর্ব্ব মঙ্গলময় পরম পিতার কৃপায় আমরা যে আজ এই সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান করতে পেরেছি তা'তে আমরা কৃতার্থ হ'লাম। সম্মিলনের সভ্যমহোদয়গণ, আপনারা সকলে দেশ দেশদেশান্তর হ'তে অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে, আমাদিগকে উৎসাহিত করতে এখানে এসেছেন, সে জন্য আমি নগরবাসী ও প্রদেশবাসীদের পক্ষ হ'তে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনাদের সৎকারের জন্য আমরা যা' কিছু সামান্য আয়োজন করতে পেরেছি তাতে অশেষ ত্রুটি লক্ষিত হ'বে, সেজন্য আমরা দুঃখিত; তাই কি বলতে গেলে লজ্জিত আছি। এই মাত্র আমাদের ভরসা যে আপনারা নিজ নিজ ঔদার্য্যগুণে আমাদের শত শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন। আমরা আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার দিচ্ছি।

উপক্রমণিকাতে আমি একটী মাত্র কথা ব'লে "প্রকৃত অনুসরণ" ক'রব। যে দুই মহাত্মা, এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠান ও পরিপোষণ কল্পে প্রাণপণ ক'রে যত্ন করতেন—তাঁদের নাম আপনাদের কারও অবিদিত নাই—অর্থাৎ আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও মহানুভব ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দিগের নামোল্লেখ না ক'রেও তাঁদের স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ কামনা না ক'রে আমি আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অভিভাষণ আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারি না। আর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়, যিনি অক্লান্তকর্ম্মী হ'য়ে আমাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী করেছেন, আমি তাঁকেও ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পারি না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তৎসংসৃষ্ট সাহিত্য সম্মিলন আমাদের দেশের ও আমাদের সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রবে। সম্মিলনটীকে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গত দুইবৎসর কাল সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়; তবে অতীতের আলোচনায় লাভ নাই। ভবিষ্যতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'বে যেন এরূপ ত্রুটি আর না হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম কি বৌদ্ধ কি জৈন কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র, কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেরই এই বাগ্দেবীর মন্দিরে প্রবেশ ক'রবার আর তাঁর সেবা ক'রবার সমান অধিকার। যিনিই সাহিত্যানুরাগী বা সাহিত্যসেবী তিনিই এখানে আদর পাবেন। যে সকল মুসলমান ভ্রাতৃবর্গ অনেক ক্লেশ ভোগ করে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক'রবার জন্য এখানে এসেছেন আমি তাঁদিগকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেইরূপ অন্যধর্ম্মাবলম্বী সাহিত্যসেবী যাঁহারা আছেন তাঁরাও আমার ও আমাদের নগর ও দেশবাসীদের বিশেষ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, আমাদের সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন কর্ব্বে আমি এই আশা রাখি। এই কথাটী একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে হবে। আর সেই আলোচনা কর্ত্তে হ'লে আমাদের সমাজ কি উপাদানে গঠিত, আমাদের সমাজের ও সভ্যতার ভিত্তি কি, কি উদ্দেশ্যে প্রাচীন ঋষিগণ সমাজ স্থাপিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট ক'রে গেছেন, আমাদের সমাজ পূর্ব্বে কি ছিল এখনই বা কিরূপ হ'য়েছে তার একটু আলোচনা ক'রার প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ব'লে থাকেন যে বাঙ্গালীর অধিবাসীদের মধ্যে অনার্য্যশোনিতই অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আমি এসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করি না। যদি স্বীকারই করা গেল যে অনার্য্যশোনিত আমাদের দেহে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, তাহলেও এটী সর্ব্ববাদীসম্মত যে আমরা বর্ত্তমানে—আর বর্ত্তমানই লইয়াই আমাদের কাজ, চেষ্টা ও উদ্যোগ—অনার্য্য শাস্ত্রের (যদি অনার্য্যদিগের কোন শাস্ত্র ছিল) বা অনার্য্য সভ্যতার বা অনার্য্য রীতি, নীতি, আচারপদ্ধতির উপর দণ্ডায়মান নাই; আমরা আর্য্যশাস্ত্র আর্য্যসমাজ,

আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যঅনুশাসনেরই দোহাই দিয়ে থাকি। আমরা বেদ বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির উপর, আর মুখ্যভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের উপরই নির্ভর করি। এই জন্য আর্য্য সমাজ কি উপাদানে গঠিত, কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন অনুশাস্তাগণ কি ভাবে সমাজ পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট ক'রে গেছেন, আর কি ভাবে ভবিষ্যতে চালিত হ'বে তার উপদেশ দিয়ে গেছেন, সে কথাগুলি আমাদিগকে বিশেষ ধীরতার সহিত ভাব্‌তে হ'বে। অতীত বর্ত্তমানকে জন্ম দেন, যেমন বর্ত্তমান ভবিষ্যতকে জন্ম দিবে। আমরা কি ছিলাম এ না জান্‌লে আমরা বর্ত্তমানে কি হয়েছি তা ভাল করে বুঝ্‌তে পারা যাবে না, এই জন্য অতীতের আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দু সমাজ, আর্য্যসমাজ সাত্ত্বিকতার উপর আধ্যাত্মিকতার উপর, ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মই হিন্দুর আদর্শ, ধর্ম্মই হিন্দুর লক্ষ্য, ধর্ম্মই হিন্দুর প্রাণ। বলিতে কি, এমন ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল বা আছে এমত বোধ হয় না। এ কথা বলে আমি যে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের উপর কোন কটাক্ষ কর্‌ছি তা যেন কেউ মনে না করেন। ধর্ম্ম সকল জাতিরই, সকল যুগেরই লক্ষীভূত; কিন্তু হিন্দুর জীবনের প্রত্যেক কাজটীই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, আদান, প্রদান, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কাজেই হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে থাকেন, ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে করেন; এমনটী অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

"ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুম, বিবাহে চ প্রজাপতিম্

"শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দ্দনম্"

ইত্যাদি শ্লোকগুলি পাঠ করে বা উদ্ধৃত ক'রে আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করি না; তবে হিন্দুর এই ধর্ম্মপ্রাণতার চিত্রটী কতক পরিমাণে স্পষ্ট ক'রবার জন্য আপনাদিগকে আমাকে কিছু কষ্ট দিতে হ'বে। হিন্দুর পরম শ্রদ্ধার ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা উপদেশ দিচ্ছেন।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ

"যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্,"

তুমি যে কোন কাজ কর্‌বে, যা আহার করবে যা হবন করবে অর্থাৎ যজ্ঞে আহুতি দিবে, যা দান কর্‌বে, যে তপস্যা কর্‌বে, সে সকলই আমাতে অর্থাৎ

ভগবানে অর্পণ ক'রে করবে। আবার হিন্দু শাস্ত্রেই এই উপদেশও আছে।

"ওম্ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি"
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং।"

সাধুগণ,—আর আমরা ইচ্ছা করে অসাধু কে হ'তে চাই?—সকল কার্য্যেই মাধবের অর্থাৎ ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে থাকেন। গীতার এই শ্লোকের পারস্য ভাষায় অনুবাদ ক'রে সেখ ফৈজী বলে গেছেন।

"বা আবাজে হর্ কার উরা বথান্"

প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে তাঁর অর্থাৎ ভগবানের, খোদার নাম উচ্চারণ করবে, নাম ব্যাখ্যা করবে, তাঁর গুণ কীর্ত্তন করবে। হিন্দু প্রাতঃকালে কি শ্লোকগুলি উচ্চারণ ক'রে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করেন তার নিদর্শন আমি আপনাদিগকে কিছু দিচ্ছি।

"ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশীভূমিসুতোবুধশ্চ।
"গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু, কেতু, কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মমসুপ্রভাতম্॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, একই মূর্ত্তি; তিন ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে। আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য একই জিনিসকে, একই শক্তিকে, একই চৈতন্যকে তিনভাবে দেখবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। মহাকবি কালিদাস, কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের একস্থলে বলে গেছেন।

"একৈব মূর্ত্তি র্বিবিধে ত্রিধা সা,
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বং"

একই মূর্ত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, এদের মধ্যে ছোটও নাই বড়ও নাই; উপাসক কাজের সুবিধার জন্য কখনও কাকে বড় ব'লে মনে করেন এই মাত্র। জগতেও আমরা দেখতে পাই যে যেখানেই যে কোন কিছু ঘটনা হোক না কেন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, অর্থাৎ নাশ তার মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হ'য়ে রয়েছে। কোন একটা শক্তির ক্রিয়া হ'ল, এই সৃষ্টি; শক্তির বিকাশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হল এই স্থিতি; পরক্ষণেই শক্তির সেই ক্রিয়াটা লোপ পেয়ে, অন্য বা অন্যবিধ ক্রিয়ার উদয় হ'ল এই প্রলয় বা নাশ। এই যে শক্তির বিকাশ তা হিন্দু দৈনিক কার্য্যের প্রারম্ভেই, শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌তেন। পরের শ্লোক হ'চ্ছে—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গা ক্ষরদ্বয়ং।
"আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

শক্তি আর শক্তিমান একই, তবে পৃথক ক'রে দেখা আর বলা কেবল আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য; আমাদের দুর্ব্বলতার অনুরোধে এইরূপ বিভেদ করা। স্রষ্টার আদ্যাশক্তি সর্ব্বত্র বিরাজ কচ্ছেন। শক্তি না হলে আমরা কোন কাজই করতে পারি না, এক পাও চলতে পারি না। সেই আদ্যাশক্তি "দুর্গা" "মহামায়া" প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন; তাঁকে স্মরণ করলে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হ'তে উদ্ধার পাওয়া যায়। এ যে পৌত্তলিকতা, এরূপ ভ্রমে কেউ যেন না পড়েন; এ কেবল সৃষ্টির স্বরূপ বর্ণনামাত্র। থাক্ সে কথা; এখন হিন্দুর ভগবানে কিরূপ বিশ্বাস, কিরূপ অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণ, তার শ্লোক একটী উল্লেখ কর্‌ছি।

"লোকেশ চৈতনাময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
"প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রাং বিনিবর্ত্তয়িষ্যে।"

প্রভু তোমারই আজ্ঞায় তোমারই প্রীতির, বা প্রীতি বিধানের জন্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রব, সংসারের করণীয় কার্য্যগুলি ক'রব। এখানে দার্শনিক অবশ্যই বলবেন, যে ভগবানের আবার প্রীতি আর অপ্রীতি কি! আমরা কোন কাজ করি বা না করি তাতে তাঁর প্রীতিও নাই অপ্রীতিও নাই। কথাটী খুবই ঠিক, তবে সাধু বা উপাসক, প্রীতি ভক্ত বা সাধক, নিজের দিকে দেখে এই কথা বলছে; প্রকৃত পক্ষে যে কোন কাজ কর্‌লে যে ভগবানে খুসী হবেন বা না কর্‌লে অখুসী হবেন তা নয়। এ কেবল নিষ্ঠাবান মানবের নিজের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসবাণী মাত্র! তার পর আরও অধিকমাত্রায় ভগবানে আত্মনির্ভরের কথা।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
"জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
"ত্বয়া হৃষিকেশ! হৃদিস্থিতেন
"যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

এ সকল অতিশয় গভীর আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত কথা; এর সবিস্তার আলোচনা করবার এ ক্ষেত্রও নয়, আর তার জন্য যত সময়ের দরকার তত সময়ও আপনারা দিতে পারবেন না। এ কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না যে আমার ততদূর ক্ষমতাও নাই যে এই শ্লোকের পূর্ণব্যাখ্যা আমি করি। তবে মোটের উপর এই কথা বুঝা যায়, যে ভগবানে হিন্দুর সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর।

ভগবান যা করাচ্ছেন সে তাই কচ্ছে, সে ভালও বোঝে না মন্দও বোঝে না,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি
"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

এটী গীতারই উক্তি। ফৈজি তার অনুবাদ করে বল্‌ছেন।

দিলি নিস্ত কো মন্‌জিলেঽয়্যারনিস্ত।
আজ হন্‌ রাজ হর্‌কষ খবর্‌দার নিস্ত॥

এমন দিল অর্থাৎ হৃদয়, অর্থাৎ জীব নাই, যেটী ভগবানের থাকবার স্থান নয়; এই গুহ্যতত্ত্ব অনেকেই জানেন না।

এইরূপ হিন্দুর জীবনের প্রত্যেক কাজেই ভগবানের নাম; ভগবানের উদ্দেশেই প্রত্যেক কাজ করা; নিজের সুখের জন্য নয়। এ আদর্শ বড় সহজ নয়; সহজ নয় কেন অতিশয় কঠিন, এ আদর্শে মানুষ যদি আপনাকে গড়্‌তে পারে, তবে সে উদ্ধার হ'য়ে যাবে, সে ভগবানের সাযুজ্যলাভ ক'র্‌বে।

এই হ'ল অতি সামান্য, অতি স্থূলভাবে, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয়। তবে এর থেকে কেউ এরূপ মনে যেন না করেন, যে হিন্দু কেবল ধর্ম্ম নিয়েই সংসারে থাক্‌তেন; আর কোন দিকে দৃষ্টি কর্‌তেন না। অন্তর্জ্জগতের কথা কাজ, কারবার নিয়েই সমস্ত সময়, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যোগ ব্যয়িত করতেন, বহির্জ্জগতের কোন খোঁজখবর রাখ্‌তেন না। এ কথা মনে করলে আমরা মহাভ্রমে পড়্‌ব। যে জাতির শাস্ত্রে "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ "বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" এই অনুশাসন ছিল ও আছে—যখন বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করতে হবে, তখন মনে ক'র্‌তে হবে আমি অজর ও অমর; তদুপযোগী বিদ্যা ও অর্থ আমার উপার্জ্জন কর্‌তে হবে—সে জাতি যে কেবল অন্তর্ম্মুখাই ছিল এ কথা বলা উচিত নয়।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই মহাবাণী যে জাতির মধ্যে চিরকাল ঘোষিত হ'ত তাঁরা যে কেবল ধর্ম্ম নিয়েই থাক্‌তেন, এ কথা আমরা কেমন ক'রে বল্‌তে পারি? আর ইতিহাস কি এ সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে হিন্দু, আর্য্য অতি প্রাচীন কাল হ'তেই অর্ণবযানে আরোহন ক'রে সুদূর লঙ্কা দ্বীপে, সুদূর সুমাত্রা, বোর্ণিও যাভা প্রভৃতি দেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে; সুদূর চীন ও সুদূরতর জাপানে, তিব্বতে, মধ্য এসিয়ায়, মঙ্গোলিয়া তাতার প্রভৃতি স্থানে, স্থলপথে বা জলপথে যখন যে প্রকারে সুবিধা পেয়েছে সেই ভাবে নিজের ধর্ম্ম,

নিজের সাহিত্য, নিজের শাস্ত্র, নিজের সভ্যতা বিস্তার করতে শত শত বৎসর ধ'রে চেষ্টা করেছে, ও সে চেষ্টার ফললাভও করেছে। আর এ যদি ঐতিহাসিক ঘটনা (ও বার প্রচুর প্রমান আছে) তাহলে আমরা কি ক'রে বলতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল ধর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। চীনে ও তিব্বতে, হিন্দুধর্ম্মের, বেদান্তের, তন্ত্রের, প্রচুর পরিমাণে বিস্তার হয়েছিল তার ভূরি ভূরি নিদর্শন, সাহিত্যে, প্রত্নতত্ত্বে ভাস্কর্য্যে ও অন্ত বিবিধ প্রকারে বর্ত্তমান আছে। চাই কি, পৃথিবীর নূতন মহাদ্বীপে—যাকে পাতাল বা মহীরাবণের রাজ্য বলা যেত সেখানেও হিন্দু আপনার শাস্ত্র, সাহিত্য ও সভ্যতার বিস্তার করেছিল ব'লে কিংবদন্তী আছে। এ সম্বন্ধে সব কথা বলতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে, সুতরাং আমাকে অগত্যা ক্ষান্ত হ'তে হ'ল।

আর হিন্দুর ধনুর্ব্বেদের কথা, আর ধনুর্ব্বেদে হিন্দুর অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা আলোচনা করলে, কে বলতে পারেন যে হিন্দুর বহির্ম্মুখী, অর্থাৎ জড়জগত সম্বন্ধে বিবিধ বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ছিল না? দ্রোণের মত ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য কি আমরা আর কোন দেশের উপাখ্যানে তাকে কিম্বদন্তীই বলা যাক বা ইতিহাসই বলা যাক্ দেখ্‌তে পাই? অর্জ্জুনের মত যোদ্ধা যিনি সব্যসাচী নাম পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি বাম দক্ষিণ উভয় হাতেই সমান নৈপুণ্যের সহিত শরচালনা ক'রতে পারতেন—কি অন্য কোন দেশের পুরাণ বা ইতিহাসে আছে? আর এ সকল কথা কেবল অতিশয়োক্তিপূর্ণ, কেবলমাত্র অতিরঞ্জিত, এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুই নাই, এ বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মহাভারতে যে সকল উপাখ্যান আছে তার সকল কথাই যথাযথ ভাবে ঘটেছিল কিনা সে তর্ক করিবার এ স্থান নয়, কিন্তু যদিও স্বীকার করা যায় যে এ সকল বর্ণনার মধ্যে কল্পনার মিশ্রণ আছে, তাহলেও তাদের ভিত্তি পর্য্যন্তও নাই; মহাভারতোক্ত আর্য্যসমাজ আর্য্যসভ্যতা আর্য্যরীতি, নীতি, আচার, পদ্ধতি, সকলই কাল্পনিক এ কথা কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি বলবার ইচ্ছা করবেন বা বলবেন এমন আমি মনে করতে পারি না। মহাভারতোক্ত যুগে হিন্দুসমাজের যে চিত্র এত বিশদরূপে চিত্রিত হয়েছে তা অবশ্যই সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত। কোনও কোনও অংশ অতিশয়োক্তিযুক্তও হ'তে পারে। এই কথা যদি আমরা মনে রাখি তাহ'লে অর্জ্জুনের যুদ্ধ বিদ্যায় কিরূপ অসাধারণ, অলৌকিক শক্তি ও নৈপুণ্য ছিল, তা আলোচনা ক'রলে আমাদিগকে বিস্মিত হ'তে হয়। আকাশে,

ঊর্দ্ধদেশে, লক্ষ্য ঘুরছে; এত ঊর্দ্ধে যে তা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তার প্রতিবিম্ব জলে পড়েছে, সেই প্রতিবিম্ব দেখে লক্ষ্যভেদ করতে হবে, যে করতে পারবে সে রাজ কন্যাকে—যাঁর স্বয়ম্বরের জন্য এই আয়োজন হয়েছিল—বিবাহ করতে পারবে; আর অর্জ্জুন, অন্যান্য শত শত যোদ্ধা, রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষগণ পরাস্ত হ'লে পর সেই চক্রভেদ করলেন,—এরূপ কথা কিম্বদন্তীই বলা যা'ক বা ইতিহাসই বলা যাক্, অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন সমাজে যে আছে এমত কোথাও প্রকাশ নাই। ব্যূহ রচনার কথা মহাভারতে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আলোচনা ক'রলে আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি যে এই বিংশ শতাব্দীর মহারথীরাও সেই বর্ণনা হ'তে যুদ্ধবিদ্যাসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব শিখতে পারেন। তবে শ্লোকের বা বর্ণনার খালি অনুবাদ দেখে এ সকল কথা বোঝা যায় না; বিশ্বাস স্থাপন ক'রে গভীর অভিনিবেশের সহিত আর গুরুমুখী হ'য়ে, এই বিষয়ে চিন্তা ক'রলে প্রকৃত তথ্য ধ'রে ক'রতে পারা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক বলবার কথা আছে; বাহুল্য ভয়ে আমি বলতে ক্ষান্ত থাকলাম। যদি আমরা হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের কথার উল্লেখ করি, সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে—কেননা এ কথা সকলেই জানেন যে হিন্দুশাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থই লোপ পেয়েছে—সে সম্বন্ধে যদি যৎকিঞ্চিৎ ভাবেও আমরা অনুধাবন করি তাহ'লে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা স্মরণ করে আমাদিগকে বিস্মিত হ'তে হবে। হিন্দুর ঔষধের মধ্যে মকরধ্বজ জগতে এক অপূর্ব্ব জিনিস। সিদ্ধ মকরধ্বজ বা ষড়্গুণবলিজারিত-মকরধ্বজের মত ঔষধ কোন দেশের আয়ুর্ব্বেদে নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। লোহা জলের চাইতে কতগুণ ভারি তা আপনারা সকলে জানেন; সেই লোহাকে সহস্র-পুটপাক দ্বারা হিন্দুভিষকেরা জলের চাইতেও হাল্কা করতেন, আর সেই লোহাই অমৃততুল্য বিশেষ বিশেষ রোগে ফল দিত। পারাভস্ম আর কোন দেশের আয়ুর্ব্বেদে নাই, তাকে ভস্ম ক'রবার প্রণালী আর কোন দেশের ভিষকরা জানতেন না। পৃথিবীতে এমন কোন উদ্ভিজ নাই যার গুণাগুণ হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বর্ণনা না ক'রে গেছেন, অনেক ভৈষজ্যের আজকাল আমরা পরিচয়ই পাই না জীবনীবর্গ; মেদা মহামেদা প্রভৃতির পুঁথিগত লক্ষণই আমরা জানি, জিনিষগুলি কি তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। সুশ্রুতে শল্যতন্ত্রের যে সকল প্রক্রিয়া

আছে—দুই হাজার বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে যে তাদের আবিষ্ক্রিয়া হ'য়েছিল তা মনে ক'রলেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়। কত অনুষ্ঠান, কত গবেষণা কত পর্য্যবেক্ষণ, শত শত সহস্র সহস্র বৎসর ধরে কত ভূয়োদর্শনের ফলে, আর রাজন্যবর্গের সাহায্যসূত্রে যে এই সকল সত্য, এই সকল তত্ত্ব উদ্ভাসিত হ'য়েছিল তা আমরা ভেবেও নির্ণয় ক'রতে পারি না। শারীরস্থান সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদের অদ্ভুত গবেষণা পরিলক্ষিত হয়। সে কালে ভিষকদিগের সমিতি সঙ্ঘ, মণ্ডলী, সভা, পরিষৎ, বসত। এই সকল সভাসমিতিতে নানাবিষয়িনী আলোচনার পর চিকিৎসার মূলতন্ত্রগুলি নির্দ্ধারিত হ'ত। কৃত্রিম নাসা প্রস্তুত করিবার প্রণালী (Rhinopbastic operations) ইউরোপ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ হ'তে গ্রহণ করেছেন এ সকল পণ্ডিতই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য। আর্য্যভিষকগণ মাথার খুলি কেটে রোগের চিকিৎসা করবার প্রণালী নির্দ্ধারিত করে গেছেন। আর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে যে চিকিৎসাতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হ'তেই, বোগদাদ্‌ ও স্পেন দেশ হ'য়ে সেই ভূখণ্ডে প্রবেশ লাভ করেছিল এ কথারও প্রতিবাদ করবার কাহারও সাধ্য নাই। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ব'লবার আছে, সময় সংক্ষেপ বশতঃ আমি ক্ষান্ত থাক্‌লাম।

ভারতে গণিতের যে অপূর্ব্ব আলোচনা হয়েছিল তা আপনারা সকলেই বিদিত আছেন। রেখাগণিত মিশর দেশে বা গ্রীসদেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয় নাই; আবিষ্কৃত হ'য়েছিল ভারতে আর সুদূর বৈদিক যুগে। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল, গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যালোচনা আর তদুপযোগী যন্ত্র সকলের আবিষ্কার (যার কতক পরিমাণে নিদর্শন আমরা কাশীর ও জয়পুরের মানমন্দিরে এখনও দেখ্‌তে পাই) এ সকল বিষয়ে আর্য্যদিগের অসাধারণ ধীশক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান আছে। কিমিয় শাস্ত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে যে কিরূপ আলোচনা ও গবেষণা হ'ত ও হয়েছিল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রী নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করেছেন তাঁহারা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বজ্রলেপ নামে জোড়া দিবার এমন এক মসলা (যাকে ইংরাজীতে cement বলে) ভারতে তৈরী হ'ত যার তুলনা অন্য দেশে নাই বললে অত্যুক্তি হ'বে না। পাথরের উপর পাথর গাঁথা হয়েছে বজ্রলেপ দিয়ে, হাজার দু'হাজার

বছরের প্রাচীন মন্দিরের সেই পাথরে তীক্ষ্ণধার ছুরিও প্রবেশ করাতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতে যে সকল ভাস্কর্য্যের প্রাচীন মন্দিরের, যথা, ভুবনেশ্বর পুরীধামে কোনার্ক (কনারক) মন্দিরে, দক্ষিণ ভারতে কাঞ্জিবারম্, রামেশ্বর প্রভৃতি নগরে, অজন্তা, খণ্ডগিরি, এলোরা প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে, অপূর্ব্ব কীর্ত্তি আজও বিদ্যমান আছে, তার কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য, পর্য্যালোচনা করলে বিস্মিত হ'তে হয়। দিল্লিতে কুতবমিনারের কাছে যে প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে, সেটা যে কি করে ঢালা হয়েছিল তা এপর্য্যন্ত ঠিক ক'রে কেউ বল্‌তে পারেন নি। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে খনিজ বিদ্যার ও লৌহ বিদ্যার কিরূপ চর্চ্চা ভারতে হয়েছিল, এই লৌহ স্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনই মসলা দিয়ে সেই লৌহস্তম্ভ ঢালা হয়েছিল যে দুহাজার বৎসরের মধ্যেও তাতে মরিচা ধরে নাই।

শিল্পে ভারত যে এক সময় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল একথাও আমরা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। অতি অল্পদিন হ'ল ঢাকাতে যে মসলিন তৈয়ারী হ'ত তা জগতে অতুলনীয়। কোনার্ক মন্দিরে যে একটা বিশাল প্রস্তর খণ্ড, মন্দির হ'তে ভেঙ্গে বাড়ীর উপর পড়ে আছে,—যাতে নবগ্রহের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত খোদিত আছে—তা যে কি ক'রে সেই সময়ের শিল্পী ও কারিকরেরা মন্দিরের উপর উঠিয়েছিল তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি না। আমি ১৮৯১ সালের ৩১শে মে তারিখে কোনার্ক মন্দির দেখ্‌তে যাই; তার পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস্ ইলিয়ট সাহেব আদেশ করেছিলেন যে সেই প্রস্তরফলকটী জাহাজে উঠিয়ে কলকাতার মিউজিয়মে এনে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করা হ'ক। কিন্তু সেই ফলক উঠিয়ে বয়ে আনবার কোন উপায় কর্‌তে ইঞ্জিনিয়ারগণ পারলেন না। যাঁরা ডাক্তার ব্রজেন্দ্র কুমার শীল মহাশয়ের Positive Science of the Hindus নামক গ্রন্থ পাঠ করেছেন তাঁরা জানবেন প্রাচীন ভারতে বিধি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বলবার অনেক কথা আছে কিন্তু আমাদের সময়াভাব। কৃষিবিদ্যা, বয়নশিল্প, কলা, চিত্রবিদ্যা সঙ্গীত নৃত্যগীত প্রভৃতি সুকুমারশিল্প কামশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি—যাহাকে ইংরাজীতে Mesmerism, Hypnotism প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। বহুবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে মৌলিক গবেষণা ও আলোচনা

যে কত প্রকার হয়েছিল তা আমরা ব'লে শেষ করতে পারি না। আজমিরের হর্ষবিলাস নামক এক পণ্ডিতপ্রবর একটী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাঁদের এ বিষয়ে কৌতুহল আছে তাঁদের আমি সেই গ্রন্থ পাঠ ক'রতে অনুরোধ করি।

এইত গেল ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ও প্রাচীন সমাজের অতি সামান্য ও অতি সংক্ষিপ্তভাবে এক আংশিক বর্ণনা। যদিও প্রবন্ধ কিছু বড় হয়ে পড়ছে, তথাপি কথাটা একটু ভাল ক'রে বোঝবার জন্য, এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী বিষয়ের অবতারণা না ক'রে আমি থাকতে পারি না। অনেকে বলেন—প্রতীচ্য দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন ও লিখে গেছেন যে ভারতে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, নাগরিক সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনই আলোচনা বা গবেষণা হয় নাই। আমি বহুদিন হ'তেই একটা ধারণা পোষণ করে আস্‌ছি, আর তা আমি, অনেককেই অনেক সময়ে ব'লে থাকি— সে ধারণাটী এই :—

কোন গ্রন্থ লিখতে গেলে ভুল আর মিছে কথা না লিখে থাকা যায় না। ভারতে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, অর্থনীতি প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র ছিল না ; Vincent Smith এর ন্যায় পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকও এই কথা আপনার গ্রন্থে প্রকাশ করে গেছেন। এটা আমারই পূর্ব্বোক্ত ধারণার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই, সকল সমাজতত্ব সম্বন্ধে ভারতে প্রভূত আলোচনা হয়েছিল। চানক্য এই সকল শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন। বলতে কি এই শাস্ত্র এক অগাধ সমুদ্র বিশেষ যা অনেকেরই অবিদিত। মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে রাজশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কতদূর উন্নতি হয়েছিল—আর মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য বোধ হয় পরিমাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় একটা কম ছিল না—তা আমাদের ভারতের ইতিহাসের এক অজানিত পরিচ্ছেদ। নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে আমি বলতে ভুলেই গেছি। আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এবং এখনও বলছি যে সময়াভাবে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হ'চ্ছে যাহ'ক এই কয়েকটী কথা হ'তেই আমরা প্রাচীন ভারতের এক আংশিক চিত্র দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌তে পাই যে যেমন একদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদ বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য মহাকাব্য অলঙ্কার নাটক প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভারত উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে

গেছেন (যোগশাস্ত্র প্রভৃতির কথা এস্থলে উল্লেখই করা হ'লনা) সেইরূপ অন্যদিকে বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গণিত, ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সুকুমার কলা, নৃত্যগীত, সঙ্গীত, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি আরও বহুবিধ জড়জগত সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় গবেষণায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় ভারত আশ্চর্য্য উন্নতি ও পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যসমাজ জগতের গুরু, শিক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্ঞানদাতা, ও শীর্ষস্থানীয় ছিল।

সত্যের অনুরোধে অবশ্যই বলতে হবে যে আমাদের বর্ত্তমানে সেদিন নাই। আমাদের গর্ব্ব করবার অনেক জিনিষই ছিল। দর্পহারী ভগবান আমাদের সে দর্প চূর্ণ করেছেন—কেন করেছেন তা মানব বুদ্ধির অগোচর। তবে একথা ঠিক যে যে চিত্রের আংশিক আভাষ আমরা আগে দেখ্‌লাম, সে চিত্র এখন নাই। সে "সাজান বাগান" আমাদের "শুকিয়ে" গেছে। কালের কঠোর প্রভাবে আমরা অতি হীন দীন অবস্থায় এসে পড়েছি; আমাদের সে জ্ঞান গরিমা নাই; সে সভ্যতার আলোক অন্তর্হিত হয়েছে; আমাদের সমাজে অনেক অনাচার, অত্যাচার, অনেক দীনতা, হীনতা, পঙ্কিলতা, অনেক পাপ, অনেক প্রবঞ্চনা প্রতারণা অনেক ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা দলাদলি, অনেক কুসংস্কার ও অনেক ভাবী অমঙ্গলের কারণ পরম্পরা প্রবেশ ক'রেছে। একথাটী আমাদের বিশেষ ক'রে জানা উচিত। আর আমার বোধ হয় আমরা তা অস্বীকার করতে পারবো না। এখন আমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি এই বিষয়টীর আমাদিগকে আলোচনা করতে হবে, আরও আলোচনা করতে হবে যে আমি যে সকল কথা বলে এতক্ষণ আপনাদিগকে ব্যক্ত করলাম তার সঙ্গে সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ কি, আর সাহিত্য পরিষদ এ বিষয় আমাদের কি করতে পারবেন তাও আমাদিগকে ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌তে হবে।

বর্ত্তমান যুগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ,—ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল দেশে সকল সমাজে সকল বিষয়ে, বিদ্যা অর্জ্জনে, ধন অর্জ্জনে, বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে; রেল জাহাজ তাড়িতবার্ত্তাবহ ও এবম্বিধ অপরাপর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে; মানব আপনারা উন্নতি সাধন করতে হলে, যত প্রকারের উদ্যোগ, চেষ্টা, অধ্যবসায়, ও শক্তি প্রকাশ করতে বাধ্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে,

প্রতিদিন, প্রতিমূহূর্ত্ত বললেও অত্যুক্তি হবে না, ঘোরতর, তীব্র, তীব্র হইতে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। যে মানুষ, যে জাতি, যে সমাজ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে টিকৃতে পারছে না তাকে ধরাধাম হতে শীঘ্রই অন্তর্হিত হতে হবে। এই যে যুগধর্ম্ম প্রবল প্রতাপ বিস্তার ক'রে চলেছে তার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার উপায় নাই। এই যুগধর্ম্ম আমরা বদ্‌লাতে পার্‌ব সংসারের কোনও জাতি পার্‌বে এমন বোধ হয় না; যদি আমরা বেঁচে থাকৃতে আর আপনাদের উন্নতি সাধন কর্‌তে চাই, আমাদিগকেও এই স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে সর্ব্বপ্রকার উদ্দাম চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, আত্মনির্ভরতা ও নব নব আবিষ্কৃত উপায় অবলম্বন ক'রে কষ্টে বা অতিকষ্টে সাঁতার দিয়ে অগ্রসর হতে হবে! এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আমরা পূর্ব্বে দেখেছি, যে প্রাচীন ভারত বহির্ম্মুখী বিদ্যার আলোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তথাপি সত্যের অনুরোধে একথা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার কর্ত্তে হ'বে যে বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে, আমেরিকায়, আর এসিয়ার জাপান সাম্রাজ্যে যে ভাবে বাহ্য জগতে সর্ব্বপ্রকার জয়লাভ ক'রবার; নূতন নূতন উপায়ে বিজ্ঞানের সত্য সকল, আহরণ করবার; জলে জলগর্ভে স্থলে, অন্তরীক্ষে বিচরণ করবার রেল জাহাজ তাড়িত বার্ত্তা প্রভৃতির সংযোগে অদৃষ্টপূর্ব্ব বেগের সহিত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ ও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বলিত বিবিধ সংবাদ প্রেরণ ক'রবার; যত প্রকারে হউক ধনাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের; কৃষি, শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে যত প্রকার উন্নতি হ'তে পারে তার চেষ্টার; যে সকল প্রণালী ও অনুষ্ঠান হ'চ্ছে, আরও যতই এ ভাবে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হবে ততই অনুষ্ঠান পরম্পরা হ'বে এ ভাবে প্রাচীন ভারতে চেষ্টা উদ্যোগ বা অধ্যবসায় ব্যয়িত বা নিয়োজিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদিগকে এখন সেরূপ চেষ্টা যত্ন, পরিশ্রম অধ্যবসায়, অবলম্বন কর্ত্তে হবে; তা নাহ'লে আমরা বর্ত্তমান যুগের পৃথিবীতে টিকৃতে পা'রব না। এই জন্য এখন আমাদের অতি প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে এই:—প্রাচীন ভারতের সাত্ত্বিকতা আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে; আমাদের পিতৃপৈতামহিক যে সকল অমূল্য রতন, অমূল্য নিধি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি, সে গুলির কোন একটীও না হারিয়ে, আমাদের নিজের ধন তুচ্ছ বলে পরকে বিলিয়ে

না দিয়ে; বর্ত্তমান যুগের ইউরোপ ও আমেরিকার জড় জগতের শক্তিপুঞ্জের উপর মানবের প্রভাব বিস্তার করবার যত কিছু উপায় উদ্ভাবিত হ'চ্ছে; শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, লৌহবর্ম্ম প্রভৃতি নির্ম্মাণের যতকিছু যন্ত্রের প্রয়োজন; ভূতত্ত্ব বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যা, বাণিজ্য বিদ্যা, যন্ত্র বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা ও বিস্তারের জন্য যত কিছু নূতন নূতন প্রণালীর সৃষ্টি হ'চ্ছে সেজন্য মূলমন্ত্র আমাদিগকে সংগ্রহ কর্ত্তে হ'বে। যে অদম্য উৎসাহ যে অপরিমেয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ের মহত্ত্ব দেখিয়ে প্রতীচ্য জাতিগণ, বল্‌তে গেলে পৃথিবীকে ভেঙ্গে, চুরে, নূতন ক'রে গড়বার চেষ্টা করছে, আমাদেরও সেইরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় সঙ্কলন করতে হবে। আমাদের যুবকগণ যাতে পূর্ণমাত্রায় শারীরিক, ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়; যাতে পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য বজায় রেখে সর্ব্বপ্রকার ও জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে তার চেষ্টা তার আয়োজন আমাদিগকে করতে হবে। আমরা কোনও জাতির পশ্চাতে প'ড়ে থাকব এমন কোনও কাজ করবও না আর ক'র্‌তেও দিব না। আমাদের জাতির অভিব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে বজায় রেখে তার সঙ্গে এই নূতন মাল মসলা যোগ দিতে হ'বে। ধর্ম্মপ্রাণতা ও সাত্ত্বিকতা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মকুশলতা আমাদিগকে অর্জ্জন করতে হ'বে। আমাদের জাতির আলস্যের সহিত আমাদের চিরবিচ্ছেদ জন্মিয়ে দিতে হ'বে; এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে, আমাদিগকে Superman অতিমানুষের সৃষ্টি করতে হ'বে। একাধারে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর যেন আমাদের দেশে তৈরী হ'তে পাবে তার উপায় বিধান কর্ত্তে হ'বে। এমন এক নূতন জাতির সৃষ্টি আমাদের মধ্যে হবে যা জগতে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। প্রাচ্যজগতের সাত্ত্বিকতা ও প্রতীচ্য জগতের রাজনীতিকতা এই দুই উপাদানে গঠিত ক'রে এক নবীন জাতির উৎপত্তি হ'বে; ভারত পুনরায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবে।

ভ্রাতৃগণ, আমি অতি প্রবল আস্তিক্যবুদ্ধি পোষণ করি। আমি আমাদের জাতীয় ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশ হবার কোনই কারণ দেখি নাই। বিবিধ কারণ পরম্পরা বশতঃ (যার উল্লেখ এখানে বিস্তৃত ভাবে করবার প্রয়োজন নাই) আমাদের মধ্যে এখন এক নবজীবনের নব শক্তির আবির্ভাব হ'চ্ছে। আমাদের যুবকদের মধ্যে এমন এক পরার্থপরতা, সেবাধর্ম্মে প্রবল আগ্রহ ও আসক্তির ভাব এসে পড়ছে যা দেখে আমি খুবই আশা করি যে উপযুক্ত

নেতার প্রেরণা পেলে তারা আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারবে। আমাদের দেশের শত শত অভাব আছে; কিন্তু সে সকল অভাব যে দূর হতে পারেনা তা আমি বিশ্বাস করি না ও করতে পারিও না, তবে এ কাজে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হ'চ্ছে উপযুক্ত নেতার, আর প্রয়োজন হ'চ্ছে আমাদের যুবকদের মধ্যে প্রাচীন সংযম ফিরিয়ে আনা। প্রাচীন আর্য্যসমাজে যুবকদের মধ্যে যে সংযম ছিল সে সংযমের ভাব আমাদিগকে পুনরায় ষোল আনা প্রবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। সমবেত চেষ্টা করলে যে সে ভাব আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না তা আমার মনে হয় না; কেননা আমরা যতই অধঃপতিত হইনা কেন আমাদের "ধড়ে এখনও প্রাণ" আছে,—আমাদের আসল জিনিস এখনও বজায় আছে। আমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছি বটে, কিন্তু জাগিয়ে দিলেই আমরা জেগে উঠতে পারব এমন সজীবতা এখনও আমাদের প্রাণে আছে। ভারত কখনও নাস্তিক হবে না। ভারত পুণ্যভূমি; এ পুণ্যভূমি চিরকালই পুণ্যভূমি থাকবে; এ পুণ্যভূমিতে পাপের এরূপ বৃদ্ধি কখনই হ'বে না কলিযুগেও না— তবে আমাদিগকে, আমাদের নেতা দিগকে সাবধান হ'তে হবে। আমাদের যুবকদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার মোহ হ'তে উদ্ধার করতে হবে; ছাত্রের, অন্তেবাসীর, শিষ্যের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা দরকার তাদের মধ্যে সেই সকল গুণ প্রবেশ করাতে হবে। পূর্ব্ব আদর্শ ফিরিয়ে আনতে হবে, আর তার সঙ্গে নবযুগের উদ্যমশীলতার আত্মনির্ভরতার অক্লিষ্টকর্ম্মিতার মূলমন্ত্রগুলি এমনভাবে যোজিত কর্ত্তে হবে যেমন দুই আদর্শ মিলে খাপ খেয়ে এক হয়ে যায়। এক আদর্শ আর একটা আদর্শের উপর ভেসে ভেসে বেড়াবে এমন যেন না হয়; দুই আদর্শের এক নূতন ছাঁচে যুবকদিগকে গড়তে হবে। আমি যুবকদিগের কথাই বিশেষ ক'রে বলছি কেননা তারাই আমাদের ভবিষ্যত আশার স্থল। তবে বালকদের সম্বন্ধে যে কথা, বালিকাদের সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রয়োজিত হবে।

আমি নিশ্চয় বলতে পারি, অনেকে বলবেন এ বড় কঠিন কথা। আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে, আমাদের এই জরজীর্ণ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ রোগগ্রস্ত দেশে আমাদের এই অশিক্ষিত, কুসংস্কারাপন্ন, দরিদ্র, অনশন বা অর্দ্ধাশনে কালযাপনকারীর দেশে এ সকল ঘটনা কি কখনও সম্ভবপর হ'বে? বিশদ ভাবে এই প্রশ্নের, এই আশঙ্কার, এই সকল আপত্ত্যের উত্তর দিতে গেলে

অনেক কথা বল্‌তে হয়, আর সে সকল কথা বলার সময় আমাদের নাই। কিন্তু ইঙ্গিতছলে আমি জাপানের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত আমার বন্ধুবর্গের সামনে উপস্থিত করব। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি "অসভ্য জাপান" ব'লে যে জাতির উল্লেখ ক'রে গেছেন, সেই জাপান আজ সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় না হ'ক সভ্য জগতে এক বরেণ্য, মহনীয়, মহিমান্বিত পদবীতে আরূঢ় হয়েছে। অনেক জাপানি পণ্ডিতেরাই স্বীকার ক'রে গেছেন যে ভারত জাপানের গুরু। শিষ্যে যা সম্ভব হয়েছে, তা কি গুরুতে সম্ভব হ'তে পারবে না? জাপান যত বড়ই হ'ক না কেন, ভগবানের গাঢ় বিশ্বাস আর্য্যের যত আছে জাপানে তত নাই। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের বরণীয় আদর্শ চোখের সাম্‌নে রেখে, সমবেত চেষ্টার ফলে আমরা যে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারব সে বিষয়ে আমি সন্দেহ নিজেও করি না ও আমার সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দকে সন্দেহ কর্‌তেও নিষেধ করি।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

আমরা আমাদের যুবকদিগকে কাপুরুষ হ'তে দিব না। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহের আদর্শ অবলম্বন ক'রে, সোৎসাহে, সতেজ, স্থায় নিষ্ঠার সহিত, ব্রহ্মকৃপার উপর সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করে লক্ষ্মীলাভ অর্থাৎ ধর্ম্মলাভ ও কর্ম্মলাভ উভয়বিধ ক্ষেত্রে সফলকাম হ'বার পথে অগ্রসর করবার বিধি ব্যবস্থা ক'রব। এ কাজ কঠিন, কঠিন কেন অতিশয় কঠিন, কিন্তু অতি কঠিন হ'লেও অসম্ভব নয়। নেপোলিয়োন বল্‌তেন যে অসম্ভব কথা মানবের অভিধান থেকে তুলে দেওয়া উচিত; সেই মহাবীরের উক্তি অনুসরণ করে আমিও বলি যে জগতে কোনও কাজ অসম্ভব মনে করবার কারণ নাই। এক ইংরাজ কবি বলে গেছেন যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের চাইতে বড় আর কিছুই নাই আর মানুষের মধ্যে মনের চাইতে বড় আর কিছুই নাই। ইংরাজ কবি মন এখানে যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন আমরা সে অর্থে আত্মাকে বুঝি। হিন্দু ঋষিও বলে গেছেন যে মানুষ সহজ জিনিস নয়; মানুষ মনে ক'রলে কি যে কি কর্‌তে পারে তা বলা যায় না। শাস্ত্রেই আছে।

"অহং দেবা ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং নশোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।"

মানুষে যা করে গেছে মানুষে তাই করতে পারবে; যেখানে ইচ্ছা আছে

সেখানে পথও আছে, এ সকল প্রতীচ্য দেশের প্রবাদও আপনাদের অবিদিত নাই। আর এরূপ যে কেউ যেন মনে না করেন যে কর্ম্মবীর হ'তে গেলেই ধর্ম্মবীরতার হানি হ'বে। এরূপ মনে করলে শাস্ত্রের অবমাননা ক'রা হয়। আর্য্যশাস্ত্র ব'লে গেছেন।

"পুঙ্খানু পুঙ্খ বিষয়ে যদু রঞ্জিতোঽপি ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দ পদারবিন্দং।
"সঙ্গীত নৃত্য কর চিত্ত বশংগতাপি মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধী র্নটীব॥"

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকলেও জ্ঞানী মুকুন্দ পদারবিন্দ অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি কখনও পরিত্যাগ করেন না। এই বলে এক উদাহরণ দিয়েছেন যেমন নর্ত্তকী সর্ব্বপ্রকারে অন্যান্য বিষয়ে আকৃষ্ট থাকলেও মাথার উপরে যে কলসীটা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টি সর্ব্বদাই রাখে। আমি জিজ্ঞাসা করি, বাণিজ্যে লিপ্ত হ'লেই কি সততার সহিত বাণিজ্য করা যায় না? বিজ্ঞান চর্চ্চায় আজীবন রত থাকলেই কি ভগবদ্ভক্তি হারাতে হ'বে? কলকারখানার কাজে, অর্থাগমের বিবিধ উপায়; কৃষির উন্নতিকল্পে; শিল্পের বিস্তার সম্বন্ধে; রাজ্যশাসন সম্বন্ধে চাই কি যুদ্ধবিদ্যায়ও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে উদ্যোগী ও চেষ্টাবান হ'লেই কি নাস্তিকতা পোষণ করতে হবে? এরূপ ধারণা অতিশয় ভ্রমাত্মক। আমি আবার শাস্ত্রেরই দোহাই দিচ্ছি।

"যা রাকা শশীশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী
"সা সৌন্দর্য্যাবিদগ্ধতা প্রণয়নী সা কামিনী কামিনী।
"যা গোবিন্দরমঃ প্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী
যা লোকদ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী॥

সকল যামিনীই (রাত্রি) যামিনী নয়। পূর্ণচন্দ্রশোভনা মেঘমুক্তা যে যামিনী সেই যামিনীই যামিনী; সকল কামিনীই কামিনী নয়—সৌন্দর্য্য বিদগ্ধতা প্রভৃতি গুনান্বিত যে কামিনী সেই কামিনীই কামিনী। সকল মাধুরীই মাধুরী নয়, ভগবদ্ভক্তিরূপ মাধুরী যে জিনিষে আছে তার মাধুরীই মাধুরী—আর মানবের সেই চাতুরীই প্রকৃত চাতুরী যাতে উভয়লোক—ইহলোক এবং পরলোক অর্থকাম এবং ধর্ম্ম আর মোক্ষ উভয়দিকই বজায় থাকবে; কর্ম্ম আর ধর্ম্ম উভয়পথই আয়ত্তীকৃত হবে, ধর্ম্মবীর আর কর্ম্মবীর উভয়েই একাধারে বর্ত্তমান থাকবে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরের একাধারে বিদ্যমানতার অভাব

ছিল না—রাজা ও ঋষি একাধারে বর্ত্তমান ছিলেন।—অর্জ্জুন ধর্ম্মবীরও ছিলেন কর্ম্মবীরও ছিলেন।—রামচন্দ্র ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর দুই ছিলেন।

"ব ফিরোজ ! মন্দান্, ধনম, রামচন্দ্

কেনামস্ বহর্ দো যাঁহা শুদ্ বুলন্দ্"

(গীতার উক্তি, ফৈজীর অনুবাদ)

ভগবান বল্‌ছেন ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে আমি রামচন্দ্র ; যাঁর নাম উভয়লোকে —ইহলোকে এবং পরলোকে—ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে—বরেণ্য মহিমান্বিত ও জয়যুক্ত। আর যাঁকে কোটী কোটী হিন্দু ভগবানের অবতার ব'লে বিবেচনা করেন সেই শ্রীকৃষ্ণের ত কথাই নাই। তিনি মানবের আদর্শ ; ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর ; জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর। মহারাজ জনক রাজাও ছিলেন, ঋষিও ছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে মহারাজ অশোক ধর্ম্মবীরও ছিলেন কর্ম্মবীরও ছিলেন। অতি অল্পদিন হ'ল মধ্যভারতে এক নারী জন্মগ্রহণ করেন যিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শ একাধারে দর্শিয়ে গেছেন। আপনারা অবশ্যই বুঝ্‌তে পারছেন যে আমি পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাইকে উল্লেখ ক'রে একথা ব'লছি, —আর এক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী—স্বর্ণময়ীর নামও কি উল্লেখ কর্‌তে পারা যায়না ?

এখন আমাদের আর একটী কথার আলোচনা কর্‌তে হ'বে। কেউ কেউ বলবেন এ সকল না হয় স্বীকারই করলাম, কিন্তু এ সকলের সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্যসম্মিলনের কি সম্বন্ধ আছে তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এবারে এই কথাটী আমাকে বুঝতে হবে আর বুঝাতে হ'বে। আমি সাহিত্যসম্মিলনের স্থান জাতীয়জীবনে অতি মহান বলে বিবেচনা করি। সাহিত্য সমাজের জাতির, প্রাণ ; সমাজ যদি দেহ হয়, সাহিত্য তার প্রাণ বা প্রাণের প্রাণ। অতি অধম অতি দীন হীন সে জাতি যে জাতির সাহিত্য নাই। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই, বা ক্ষণপ্রভার ন্যায় উৎপন্ন হইলেও ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, সে জাতির ন্যায় হীন জাতি আর জগতে নাই। সাহিত্য না থাকলে জাতীয় জীবনের কিছুই আর থাকতে পারে না। রামচন্দ্রের অস্তিত্ব কে জান্‌ত যদি মহাকবি বাল্মিকী রামচন্দ্রের জীবনী, রামায়ণ রচনা না করতেন। যুধিষ্ঠিরকে

পুণ্যশ্লোক বলে প্রাচীন ঋষিরা বর্ণনা করে গেছেন—তাঁর কথাই বা কে জানত যদি মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা না করতেন। ভগবানের অবতার যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেই বা কে স্মরণ করতে পারত যদি ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত না হ'ত। সুতরাং আমরা বুঝতে পারব যে সাহিত্য বড় সহজ জিনিষ নয়। আর অবশ্য আমি এ স্থলে সাহিত্যের যে প্রশস্ততর অর্থ আছে, যে অর্থে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ইতিহাস, প্রভৃতি তথা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থনীতি প্রভৃতি যত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা আছে সকলই সাহিত্যের অন্তর্গত ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত? এই সাহিত্য যে জাতীয় জীবনে প্রবল প্রতাপ বিস্তার ক'রবে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এই সাহিত্যকে আমাদের এমন করে চালিত ক'রতে হবে, এমন উদার ভাবে অনুপ্রাণিত করতে হ'বে যেন তার দ্বারা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গুণগুলি সঙ্কলিত ক'রে যে জাতীয় জীবন ও যে জাতীয় চরিত্র গঠিত হ'বে তার পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য হ'তে পারে। যে সাহিত্য নিজের নামের অগৌরব ক'রে যে কেবল মাত্র আপাতঃমনোরম কতকগুলি উদ্দেশ্যহীন, গল্প কথা উপন্যাসে ও নবন্যাসে আপনার দেহ অলঙ্কৃত বা বর্দ্ধিত করে এরূপ সাহিত্যকে আমরা কখনই সাহিত্য মনে ক'রব না ; সেই সাহিত্যকেই আমরা সাহিত্য মনে ক'রব যাতে আমাদের যুবকদিগের নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মপ্রাণ উভয়লোকসাধনী চাতুরীসম্বলিত চরিত্র গঠিত হতে পারবে। যাতে আমাদের যুবকেরা স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হবে কিন্তু স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হলেও অন্য দেশের প্রতি বিদ্বেষ করবে না যাতে আমাদের যুবকেরা দেশের জন্য পরের জন্য, তাদের দরিদ্র ভ্রাতৃবর্গের উন্নতির জন্য, তাদের দুঃখ কথঞ্চিৎরূপেও দূর করবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকবে। জাতীয় সাহিত্য আমাদিগকে এমন প্রেরণা দিবে যেমন তার চালনায় আমরা পরার্থেই জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হ'তে পারি। যে প্রেরণার বলে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এই হ'বে যেন আমরা জগৎকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, কিয়ৎপরিমাণেও উন্নততর, পবিত্রতর সুন্দরতর ক'রে যেতে পারি। আমাদের প্রাচীন আর্য্য আদর্শ ও নবীন প্রতীচ্য আদর্শ এই দুই দিকে

এমন সব গ্রন্থ রচনা ক'রতে ও করাতে হ'বে যে সেই সব গ্রন্থ পাঠ ক'রে আমাদের যুবকেরা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রতীচ্য জাতির সভ্যতার মূল মন্ত্রগুলি গ্রহণ কর্‌তে পারবে। অবশ্য এ কথা জানাই আছে যে তা কর্‌তে গিয়ে যেন আমাদের নিজের নিজস্বগুলি হারিয়ে না ফেলে। আমি অনেক সময় একটা কথা মনে করি। হার্‌কিউলিনিয়ে আর পম্পিয়াইতে যে পাহারাওয়ালারা অগ্ন্যুৎপাতের সময় কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ দিয়েছিল তারা অবশ্য খুব ভাল কাজই করেছিল; কিন্তু আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, আমাদের মহাকাব্যে পুরাণে, ইতিবৃত্তে কি এমন জিনিষ নাই যে তার উদাহরণ আমরা আমাদের যুবকদের সমক্ষে ধর্‌তে পারি! লক্ষণের মত ভ্রাতৃ চরিত্র আর কোনও কালে কোনও কবি চিত্রিত ক'রে গেছেন কি না আমার সন্দেহ। কই সে সম্বন্ধে ত কোন পাঠ্যগ্রন্থে আমরা বিশেষ উল্লেখ দেখতে পাই না। ভরতের চরিত্রের মত চরিত্র জগতে দুর্ল্লভ কিন্তু তার উল্লেখও আমাদের বালকদের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে আমাদের চোখে বড় একটা পড়ে না। সীতার চরিত্র জগতে অতুলনীয়। যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠার ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ আদর্শ চরিত্রের অবলম্বনে আমাদের বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক তৈয়ারী হওয়া উচিত। দানবীরের অনেক উপাখ্যান জগতের ইতিবৃত্তে আছে, তবে জীমূতবাহনের মত দধিচির মত দাতাকর্ণের মত দানবীর পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। দাতাকর্ণের উপাখ্যানে খালি দানবীরতার উদাহরণটা আছে এমন নহে। তার মধ্যে অতি গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বও নিহিত আছে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করে আমাদের দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হউক। আর তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যুবকবৃন্দের ও শিষ্যমণ্ডলীর সংযম, গুরুভক্তি, শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক তপশ্চর্য্যা ও তদ্রূপ নিয়মাবলী সম্বলিত যে সকল অনুশাসন আছে সেইগুলি বিধিবদ্ধ করে আমাদের পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করা হ'ক। আমাদের মাতৃভাষায় যাতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয় তার বিশেষ চেষ্টা সাহিত্য পরিষদকে কর্‌তে হবে। এই কাজে সাহিত্য পরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত, পাঠ্য নির্ব্বাচন সমিতির সহিত, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে সমিতি শীঘ্র গঠিত হইবে তার সহিত ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের সহিত

একযোগে চেষ্টাবান হবেন আমি এরূপ অভিপ্রায় পোষণ করি। পরিষদের পক্ষ হইতে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য অর্থাৎ Fellow নির্ব্বাচন করা যেতে পারবে। পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সভাতেও পরিষদের সভ্যগণের মতামত যা'তে গ্রহণ করা যায় তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। আর ব্যবস্থাপক সভাতেও পরিষদের পক্ষ হ'তে যা'তে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'তে পারে তার উপায় করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষাবিভাগ এখন আমাদের মন্ত্রীবর্গের অধীন। পরিষদ হইতে এমন একটী শাখাসভা নির্ব্বাচিত হউক যে সভা মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জাতীয় শিক্ষা কি ভাবে পরিচালিত হইলে শুভ ফল প্রদান কর্‌বে তার আলোচনা কর্‌বেন। অবশ্য একদিন বা এক বৎসরে এ কাজ হবে না কিন্তু এই দিকে এই কাজে আমাদিগকে চেষ্টিত থাকৃতে হবে। আর দেশের কল্যাণ যখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তখন এবিষয়ে সংযোগীতার দ্বারা অনেক পরিমাণে সে উদ্দেশ্য লাভ করতে পারব এরূপ আমরা বিশ্বাস করতে পারি। একটা সামান্য কথা ধরা যাক্। আমাদের এই প্রধান প্রধান দেশে মধ্যাহ্নকালে স্কুল কলেজের অধিবেশন বোধ হয় ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। কলিকাতার কথা অবশ্য বিশেষ জটীল কিন্তু মফস্বলে, অনেকের বিশ্বাস, প্রাতে কিম্বা প্রাতে ও অপরাহ্নে উভয় সময়েই স্কুলের অধিবেশন সম্ভব হইতে পারে। শীতকালে দুই তিন মাস না হয় অন্য ব্যবস্থা হউক। আর দৈনিক শিক্ষার কালও অনতিদীর্ঘ হওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষার উপর এত তীব্র দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নাই। পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যাও কমান উচিত। "পরীক্ষা" "পরীক্ষা" ক'রে আমরা আমাদের যুবকদের মাথা খেতে ব'সেছি। আমার আজীবন বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর দশ বৎসর কাল জীবন নষ্ট হয়। যাঁতার পেষণের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যুবকদের স্বাস্থ্য পেষণ করে দিতেছে। আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমাদের যুবকেরা কিরূপ ক্ষীণ ও শোচনীয় স্বাস্থ্য লইয়া স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নে নিযুক্ত। চোখের দোষ, কাণের দোষ, দাঁতের দোষ, যকৃতের দোষ, প্লীহার দোষ, ছাতির দোষ, মাথার দোষ, পেটের দোষ এরূপ একটা না একটা দোষ না আছে এমন ছাত্র প্রায় দেখিতে পাই না। এই সকল গুরুতর দোষের সংশোধন কর্ত্তে হ'বে তা না হ'লে ছাত্র সমাজ হিন্দু সমাজ ধ্বংশ হয়ে যা'বে! আর আমার মতে এ সকল দেখ্‌বার ভার সাহিত্য পরিষদ অসঙ্কোচে ও

আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন।

সাহিত্য পরিষদ বঙ্গভাষার বঙ্গবর্ণাবলীর সম্বন্ধে যে সব গবেষণা করেছেন, প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ; প্রাচীন পদাবলীর সংরক্ষণ; বঙ্গের ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনের উপাদান সংগ্রহ; শিলালিপি তাম্রশাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কাজ করেছেন তা অতি প্রয়োজনীয়—এ সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্য হ'তে পারে না, কিন্তু আমি যে সকল কাজের কথা বল্লেম সে সকল কাজও পরিষদ অসঙ্কোচে কর্ত্তে অগ্রসর হ'তে পারেন ও পরিষদের অগ্রসর হওয়া উচিত। পরিষদ সাহিত্যের উন্নতি ক'রে আমাদের জাতীয় জীবনে নব বল দিবেন এ আমার বিশ্বাস। এ কথা কি কেউ বল্‌তে পারেন যে মহাত্মা স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্র—সাহিত্যের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনে নব বল দিয়ে যান নাই? তিনি কি বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যকে বহুলপরিমাণে অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে আদরণীয় ক'রে যান নাই? আর এ কথাই বা কে বল্‌তে ইচ্ছা করবেন যে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মণীষি অঘোর চন্দ্র সরকার, কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রভৃতি লেখক ও কবিগণ নিজ নিজ অমর গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ উন্নতি বিধান করেন নাই? আর তদ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয় নাই? আমি অন্য অন্য অনেক মহাকবি ও উৎকৃষ্ট লেখকগণের সময়াভাবে নাম ক'র্‌তে পারলাম না তার জন্যে যেন কেউ আমাকে দোষ না দেন, আর অবশেষে এ কথাই বা কে অস্বীকার করবেন যে কাব্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর গ্রন্থাবলী রচনাদ্বারা আমাদের জাতীয় সমাজের মুখোজ্জ্বল করেন নাই এবং আমাদের যুবকদের সামনে নূতন নূতন আদর্শ ধরে তাদের বিবিধ প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর করান নাই। তবে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে সাহিত্য কি অদ্ভুত শক্তি ধারণা করে, আর সেই সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করা স্বতঃপরতঃ সাহিত্য পরিষদের কাজ। আর সেই সাহিত্য পুষ্ট কর্ত্তে গিয়ে যাতে জাতীয় চরিত্র নব আদর্শে গঠিত হয়, সমাজ নব বলে বলীয়ান হয়, নবীন উৎসাহে উৎসাহান্বিত হয়, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয় তার উপায় বিধান সাহিত্য পরিষদকে কর্ত্তে হ'বে। আমরা দেখেছি যে সুযোগ পেলে বাঙ্গালীযুবক বাঙ্গালী জাতি কোন বিষয়েই, বিদ্যা, বা জ্ঞান, বা বুদ্ধি বা বল, বা শৌর্য্য বা উদারতায় কাহারও অপেক্ষা

কম নয়—সুযোগ না পেলে সে কি ক'রবে। সেই সুযোগ যাতে সে পেতে পারে আর সে সম্বন্ধে যে সকল অন্তরায় বা বাধা আছে যাতে সেগুলি দূর হয় তার চেষ্টা আমাদের পরিষদকে কর্ত্তেই হবে। আর এ কথা আমাদের সকল সময়েই মনে রাখতে হ'বে যে বিজাতীয় ভাবগুলি বর্জ্জন করে বিদেশীয় যা কিছু ভাল তাই আমরা গ্রহণ ক'রব আর যা কিছু দোষের তা পরিত্যাগ ক'রব।

পরিষদের সভ্যগণ, আপনারা এক মহান ব্রতে ব্রতী হয়েছেন—এক মহান দেশহিতকর যজ্ঞের পৌরহিত্য পদে বরিত হয়েছেন। বাগদেবীর মন্দিরে উপাসনা কত্তে এসে আপনারা সাহিত্যের হাত দিয়ে আমাদের সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করনের পথে অগ্রসর হবেন এই আমার অভিপ্রায়, এই আমার ভরসা ও এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই পুণ্য পবিত্র বরেণ্য ব্রতে ব্রতী হয়ে আপনারা আপনাদের জীবন ধন্য করবেন ও জাতীয় জীবনকে উন্নতির সোপানে প্লাবিত করবেন। সিদ্ধিদাতা সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে ও সমবেত চেষ্টার বলে বলীয়ান হ'য়ে আপনারা একার্য্যে অগ্রসর হ'বেন এই আমার বিশেষ অনুনয়।

উপসংহারে আমি আর একটী কথা না ব'লে থাক্‌তে পারি না। আশা করি আপনারা কেহ অসন্তুষ্ট হবেন না। আমাদের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নাগরিক জানপদ ধনী নির্ধন সকলের মধ্যেই দ্বেষভাব, দলাদলি, হিংসা, নিন্দাপরায়ণতা বড় বেশী। আমরা ঐক্যতা অবলম্বনে কাজ করতে এখনও শিখি নাই। এক হ'য়ে কাজ কর্ত্তে গেলে পরস্পরের দোষ পরিত্যাগ করতে হয়। অনেক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। তা আমাদের নাই। এটী আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান দোষ। এ দোষটী যা'তে আমরা পরিহার করতে পারি তার বিশেষরূপ চেষ্টা করা আমাদের অতিশয় উচিত। আমি মনে করি যদি কেহ আমাকে নিন্দা করে করুক না, তার জন্য আমার এত মাথাব্যথা কেন? যদি আমি বাস্তবিকই নিন্দার কাজ করে থাকি তা হ'লে যে আমার নিন্দা করে সে ঠিক কাজই করেছে; আমি আমার দোষ দেখিয়ে দিলে সাবধান হ'ব; আর যদি আমি নিন্দার কাজ না করে থাকি তা হ'লেও আমার বিশেষ চঞ্চল হ'বার দরকার নাই। এ বিষয়ে আমাদের উদারভাবে পোষন করা দরকার। নিন্দাবাদ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারেরা দুইটী অতি উপাদের শ্লোক রেখে গেছেন। একটী শ্লোক

এই—

"দদতু দদতু সন্তো গালি মন্তো ভবন্তঃ
"বয়মপি তদ্ভাবাৎ গালিদানে চ সমর্থাঃ।
"জগতি বিদিতমেতৎ দীয়তে বিদ্যমানং
"নহি শশকেবিষাণং কোঽপি কস্মৈ দদাতি॥"

মহাশয়গণ আপনাদের গালি আছে আপনারা গালি দেন; আমাদের গালি নাই, সুতরাং আমরা গালি দিতে পারি নাই পারবও না। সংসারে এই প্রবাদ চিরকাল প্রচলিত আছে যে থাকলেই লোকে দিয়ে থাকে, খরগোষের শিং কেউ কাকেও দিতে পারে না। এটা গেল বিদ্রূপের ব্যঙ্গের দিকে উক্তি। আর একটী শ্লোক এই—

"মন্নিন্দয়া যদি জনঃপরিতোষমেতি
"নন্বপ্রযত্নসুলভোঽয়মনুগ্রাহকম।
"শ্রেয়োর্থিনোহি পুরুষাঃ পরতুষ্টি হেতোঃ
"কষ্টার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥"

আমাকে গাল দিয়ে বা আমার নিন্দা ক'রে যদি কেউ পরিতুষ্ট হন, খুসি হন, তা হ'লে আমি ব'লব যে তিনি আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ করছেন। কেননা আমি কোন চেষ্টাই করছি না তার পরিতোষ উৎপাদনের জন্য, বলতে গেলে আমি ঘরে চুপ ক'রে বসে আছি, আর তিনি আমাকে গালি দিয়ে আমার নিন্দা ক'রে আনন্দ উপভোগ করছেন। এ যদি আমার উপর অনুগ্রহ না হয় তবে অনুগ্রহ আর কাকে বলে? লোকে কত কষ্ট করে কত অর্থব্যয় করে, অপরের আনন্দ বিধান করবার চেষ্টা করে, আর এ ক্ষেত্রে আমি কিছুই কচ্ছি না, আর আমার নিন্দুক আমাকে গাল দিয়ে আনন্দ উপভোগ কচ্ছেন। এই হ'ল মহানুভবের প্রতিশোধ লওয়া যাকে ইংরাজীতে noble revenge ব'লে; বিদ্বেষকে ভালবাসা দিয়া শান্ত করা। আমি মনে করি আমাদের এই পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদিগকে বিরক্ত করলাম, কোন ত্রুটী হয়ে থাকে মাফ করবেন। এখন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি কৃপা বিতরণ করে আমাদের এই অনুষ্ঠান সফল করুন। আমরা মহিলাদের কার্য্যে ব্রতী হই। ওম্ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীসূর্য্য কুমার অগস্তি।
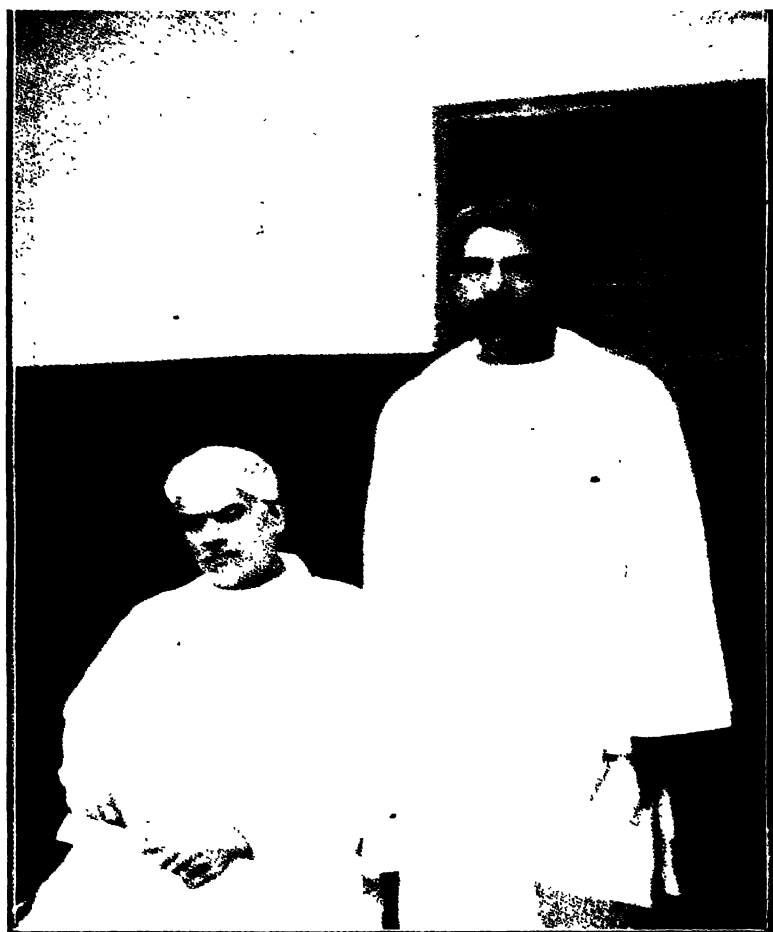
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের প্রধান সভাপতি— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী (বসিয়া) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদক— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (দণ্ডায়মান)।

সভাপতির অভিভাষণ।

মাতৃ-ভাষা ভক্ত সমবেত ভদ্রমহোদয়-গণ!

অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং মেদিনীপুর-বাসী একজন ভদ্র মহোদয় যখন একদিন আমাকে বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসেন, তখন আমি সর্ব্বপ্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। এমন কি, মনে হইতেছিল যে, তাঁহারা হয়ত ভ্রমবশতঃ অন্যের বাটী মনে করিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ প্রকার ভাবিবার বড় অবকাশ ছিল না। চকিতের মত ঐ ভাবটা আমার মনে উদিত হইয়াই লীন হইয়াছিল। কারণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমার বহু-দিনের পরিচিত বন্ধু; তিনি যখন উপস্থিত, তখন আমার সম্বন্ধে কোনও ভ্রম ঘটিতে পারে না। ইহাতে বুঝিলাম, আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমাকে ত্যাগ করিয়া যথার্থ যোগ্যতম ব্যক্তিকে সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহার জন্য অনেক অনুনয় এবং অশেষ চেষ্টাতেও যখন বিফল হইলাম, এমন কি, তাঁহাদের নিকটে বিবেচনা করার জন্য অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার অবকাশ প্রার্থনা করিয়াও যখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমাকে অগত্যা সভাপতির পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। তাই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে সভাপতি-রূপে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছি। এই প্রকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সভাপতিত্ব-রূপ গুরুভার গ্রহণ করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই কথাটা আপনারা মামুলী বিনয় ও দৈন্য প্রকাশ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কারণ, আমার অক্ষমতা আমি যতটা জানি, ততটা অন্যের জানা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থাতেও আমি যে কেন এখানে এই ভাবে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ নিম্নে লিখিলাম, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে কৃতার্থ হইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অন্ত

যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এই সভার ব্যাপার নির্ব্বাহ-পক্ষে আমার যে সকল ভ্রম-প্রমাদাদি ত্রুটি ঘটিবে, তাহা আপনারা করুণার চক্ষে দর্শন করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার এই ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অন্য একটী বিশিষ্ট অধিকারও আছে। কারণ, আপনারা আমাকে যখন সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তখন আমার কাজের দোষ-গুণ গৌণভাবেও অন্ততঃ আপনাদিগের উপর বর্ত্তিবে; সুতরাং আমি সে বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত আছি। আপনাদের সমবেত প্রেরণাই আমাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে চালিত করিবে, সেই ভরসা প্রভূত-প্রকারে আমাকে বল-সঞ্চার করিয়াছে ও করিবে।

আমি অতি ক্ষুদ্র, ইহা জানিয়াও কেন এই প্রকার গুরুভার গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে একটী কৈফিয়ৎ দিব, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ঐ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। অদ্য যে আসন আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে দিয়াছেন, সেই আসন যে যে মহাত্মা ইতঃপূর্ব্বে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মনে হইলে এবং তাঁহাদের অভিভাষণের কথা স্মরণ হইলে, আমার মনে এক প্রকার জড়তা না আসিয়াই পারে না। স্বতঃই মনে চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কি উপহার লইয়া এই শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইব! কবিকুল-চূড়ামণি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে আসনে বসিয়া তাঁহার বীণা-বিনিন্দী কণ্ঠস্বরে যে সকল সারগর্ভ কথা শুনাইয়াছেন; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যেখান হইতে তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনী এবং ভাবময় জগৎ ও জড় জগতের অদ্ভুত সমন্বয় স্বরূপ "এই যেন" এবং "এই সেই" এই দুই বাক্যের দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঋষিকুষ্ঠ তপোবনে উদ্ভাসিত চরম সত্যকে পুনরায় বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া, উদ্‌ভ্রান্ত আমাদিগকে চরম সত্যের পথে আবাহন করিয়াছেন; যেখানে বসিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেশে স্বাধীন চিন্তা এবং মৌলিক গবেষণার অভাব-দর্শনে অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া, যাহাতে ঐ সকল এই দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পথ দেখাইয়া, জ্ঞান-বৃদ্ধির উপায় বলিয়া দিয়াছেন; সে আসনে বসিয়া নূতন কথা বলা সহজ নহে; এমন কি, আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

জগদ-বিশ্রুত-কীর্তি, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, মদীয় গুরু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে আসনে বসিয়া বাঙ্গালী জাতির নানাপ্রকার গৌরবকাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়া, মৃতকল্প বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন; দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখান হইতে নানা উপাদেয় তত্ত্বকথা শুনাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন, যেখান হইতে অশেষ প্রতিভাশালী বিদ্বদ্বরেণ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত অনুরাগ, তাঁহার সুললিত এবং ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ মধুর ভাষায় ঝঙ্কৃত করিয়া দেশমধ্যে আমাদের মাতৃভাষার গৌরব অশেষ প্রকারে বাড়াইয়াছেন, যেখানে স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র এবং স্বর্গগত সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নানা উপদেশ-পূর্ণ বাণী আমাদিগকে শুনাইয়া আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যেখানে সংস্কৃত ও পালিভাষাবিৎ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম দর্শনাদি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, আমাদের সকলের প্রিয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গগত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা-ভাষার ইতিহাস এবং গতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া আমাদিগের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছেন; যে আসনে বসিয়া মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ, বঙ্গ-ভাষাই আমাদের যাবতীয় শিক্ষার "বাহন" হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া, সর্ব্ব-প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় অশেষ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক বঙ্গবাসীকে মাতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সর্ব্বসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, আশ্রয়দাতা সাহিত্য-সেবিকগণের চিরসুহৃৎ, নানা সদ্‌গুণবিভূষিত এবং সুপণ্ডিত মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং গতি বিষয়ে নানা সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়া, আমাদের সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেই আসনে বসিয়া আমি আপনাদের যোগ্য কোনও কথা শুনাইতে পারি, সে আস্পর্দ্ধা আমার নাই। এই সকল কারণে আমি অনেক বিবেচনা-পূর্ব্বক স্থির করিয়াছি যে, আমি এখানে এই সমবেত শিক্ষিতবর্গের নিকটে কোন নূতন অর্ঘ্য উপহার দিতে কোনও চেষ্টা করিব না; কেবল বঙ্গভাষার প্রকৃতপক্ষে বিস্তারকল্পে যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি, তাহারাই প্রসঙ্গ আপনাদের এই দরবারে পেশ করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী মনস্বিগণ বোধ হয়,

তদানীন্তন-কালে সময়োপযোগী নহে বলিয়াই ঐ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বলেন নাই—এখন সময় আসিয়াছে, এখন আর মতভেদ বড় নাই বলিলেও চলে, সুতরাং এখন আর শুধু বঙ্গবাণীর মহিমা-কীর্ত্তনই প্রচুর নহে—যাহাতে আমাদের মাতৃভাষা নিজ অধিকার লাভ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ এবং তাহা কার্য্যতঃ পরিচালন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, আপনারা সকলে আমার প্রস্তাব গ্রহণীয় হইলে, তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাতে বদ্ধ-পরিকর হইবেন। আর যদি আমার প্রস্তাবে কোন ত্রুটী থাকে, তবে আপনারা বিচার করিয়া তাহা সংশোধন করুন এবং উপযুক্ত প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তাহা বাস্তব করা যাইতে পারে, তৎপক্ষে কৃতসঙ্কল্প হউন। এখানে যে বঙ্গভাষার বিস্তার-কল্পে প্রস্তাব করিব বলিতেছি, তাহার একটু হেতু আছে, তৎপতি প্রণিধান করিবেন। বঙ্গভাষার উন্নতি এবং বিস্তৃতি সর্ব্ব-জন-বাঞ্ছনীয় এবং সে সম্বন্ধে মতভেদ কখনও কাহারও ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং উহার প্রকৃত বিস্তার-কল্পে যে যে প্রস্তাব আমি করিব, তাহার অর্থ এই,—যে উপায় বা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মাতৃভাষা তাঁহার প্রকৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার উপায় এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা কি, তাহা নির্ণয় করাই আমার প্রস্তাব গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনারা কৃপা করিয়া আমার প্রস্তাব গুলিকে ঐ অর্থেই গ্রহণ করিলে সুখী হইব। অযোগ্য হইয়াও আমি যে কেন এই সম্মিলনীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, তাহার কারণ এখন আপনারা বুঝিবেন। বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি, এমন কি, সময় সময় স্বপ্নেও দেখিয়াছি যে, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থা থাকিবে না, থাকিতে পারেও না। এমন সময় একদিন নিশ্চিতই আসিবে, যে দিন আমাদের দেশের শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার দ্বারাই দেওয়া হইবে। এই কথাটা আমি নানা স্থানে নানা ভাবে প্রস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-রূপে আমি যখন উহার সেবক ছিলাম, তখন একবার লিখিয়াছিলাম,—

"The Bangiya Sahitya Parisad has one goal in its view. It dreams of a day when it will be possible for the

Bengali speaking of this country to have all higher learning imparted to them through the medium of the Bengali language. That day may be distant, but it is none the less incumbent upon our countrymen to set themselves at once to the supreme task of doing all the preliminaries by way of clearing the ground and removing obstacles and difficulties so as to facilitate the easy and rapid attainment of the final goal which we all have in our view. With the help of our benign Government and the benefactors like the Maharajah of Cossimbazar, the Raja Bahadur of Lalgola, the Maharajadhiraj of Burdwan and several others, the Parishad hopes to rise to a height from which the promised land will be directly in our view. The net result, up to now, of our labours in this direction, has been only to collect bricks and mortar for the building of the splendid national edifice sketched out in the preceding lines. Nothing will be more gratifying to the original founders of the Parishad than to see during their life-time that their idea has taken firm root in the minds of their countrymen and that some beginnings of have been actually made for the realization of their vision. May God vouchsafe the fruition of their hopes—is their humble prayer." এই ভাব পোষণ করি বলিয়া অনেক লোকের নিকটে কত প্রকার বিদ্রূপ যে শুনিতে হইয়াছে, তাহা শুনাইয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। এখন হাওয়া ফিরিয়াছে, এখন শিক্ষার "বাহন" সম্বন্ধে দেশের লোকের মতিগতি বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের একপ্রকার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি আজীবন যাহা কল্পনা-চক্ষে দেখিতাম, তাহা এখন যে শুধু প্রকাশ করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার একান্ত

চেষ্টা করার সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমি ভাবিতেছি যে, আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের ধ্বনি দেশ-মধ্যে তাদৃশ মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে না পারিলেও আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অন্ততঃ পদের খাতিরে দেশের নিকটে কথাটা উপেক্ষিত হইবে না। অতএব আমার প্রস্তাবগুলি যথাযথরূপে আপনারা বিচার করিয়া, গ্রহণীয় হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং প্রস্তাবগুলি (আমার উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত) বর্জ্জনীয় হইলে, তাহার স্থানে নূতন সুষ্ঠুতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ও কাল-সাধানোপযোগী নূতন প্রস্তাব উদ্ভাবন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন এবং আচরে যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাও করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। মূল উদ্দেশ্য সাধিত করাই আমার অভিপ্রায়। আমার প্রস্তাবিত প্রণালীগুলি যে সর্ব্বাংশে গৃহীত হইবে, এ কথা আমি বলি না এবং তাহা সম্ভাবিত নহে। উদ্দেশ্যানুকূল সাধন কি কি হওয়া উচিত, তাহার বিচার আপনারা করিবেন, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে প্রস্তাবগুলি সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব; বিচারক আপনারা, কার্য্য করিবেনও আপনারা। তবে আমার অভিপ্রায় এই যে, মামুলিভাবে প্রস্তাবাদি যেমন গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হয়, আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবগুলি যেন তদ্রূপ না ঘটে। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

মাননীয় সরস্বতী মহাশয়ের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমি বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "রাসিয়ান,—গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ-গণের অন্যতম আলোচনীয় রূপে গৃহীত হইবে।" "একদিন যেমন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্ম-সাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গ-সাহিত্যকে সমগ্র ভারতের সেইরূপ আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে।" এই প্রকার মাতৃভাষার গৌরবের কথা মাননীয় সরস্বতী মহাশয়ের মুখে শুনিলে কোন্ বঙ্গবাসীর মনে না যুগপৎ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়? তিনি স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন—"যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর কোনও শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয় বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।"

আমি বলি বাড়ম্। কিন্তু সরস্বতী মহাশয় শিক্ষার কেন্দ্র যে বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে কি কি পরিবর্ত্তন করিলে যে তাঁহার ঈপ্সিত বিষয়টী বাস্তব হইতে পারে, তাহার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিস্তার করিয়া বলেন নাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে ভাবগত ঐকান্তাপনোদেশ্যে দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যতঃ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আশা করেন,—"ফলে দাঁড়াইবে এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, মতিগতি, সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত ঐক্যের সাড়া পড়িবে।" দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া সরস্বতী মহাশয় যে সমীচীন কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তথাপি আমাকে সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে, আমাদের মাতৃভাষার উপযুক্ত বিস্তার-পক্ষে উহাই প্রচুর নহে আমাদের দেশে বঙ্গবাণীর আসন একমাত্র সম্রাজ্ঞীর আসন; তাহা যতদিন স্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আমরা কিছুতেই সুস্থ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মায়ের আসন একচ্ছত্র হওয়া চাই; অন্য আসনের পার্শ্বে, তাহার বহুমূল্যের আসন হইলেও, তাহাতে বঙ্গবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ভরসা করি, সাহিত্য-সম্মিলনও সন্তুষ্ট হইবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার প্রশ্নাবলীর উত্তরে এই সম্পর্কে আমি যাহা জানাইয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের যে বিধান আছে, তাহা দ্বারা দেশীয় যুবকবৃন্দের উচ্চশিক্ষালাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ঘটিতে পারে না। এই অসুবিধার কারণও সুস্পষ্ট। পরন্তু ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, অদ্যাবধি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট কিংবা জনসাধারণের মনোযোগ এতৎসম্বন্ধে যে ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তদ্রূপ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে সমগ্র উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কেবল ইংরাজী-ভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে, এই বিচিত্র অবস্থাই ভারতে উচ্চ শিক্ষার প্রসারণ এবং পরিপুষ্টি-পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। কোন একটী বৈদেশিক ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাই অতি দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং বিদেশীয় ভাষা ব্যতীত উচ্চ শিক্ষালাভের উপায়ান্তর না থাকায়, প্রকৃতপক্ষে

এ দেশে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার এবং ঐ জ্ঞান-বিস্তার করিবার পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ বলিলেও চলে। দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এই সমস্যাটী অতীব জটিল এবং এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য বিধিবদ্ধভাবে অদ্যাবধি কোনরূপ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে ছাত্রবৃন্দ সেই শিক্ষাকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এ কথা প্রমাণ করিতে কোন প্রয়াস করার প্রয়োজন হইবে না; অধিকন্তু বাল্যকাল হইতে আমাদের বালকবৃন্দকে ভাষা হিসাবে শিক্ষা ব্যতীত প্রায়শঃ সর্ব্ববিধ শিক্ষাই ইংরাজী ভাষায় লাভ করিতে হয়। এইরূপ অসমীচীন ভিত্তির উপরেই সমগ্র শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আমাদের বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং আমাদের দেশের শিক্ষা-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারগুলিকে দূষিত করিয়াছে। আপাততঃ এই মাত্র সুখের বিষয় যে, আমাদের দেশের উচ্চতম রাজপুরুষের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে।

"প্রাথমিক শিক্ষাই বল, আর উচ্চ শিক্ষাই বল, উভয়ের উদ্দেশ্য এক। কারণ, উভয়বিধ শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে উদারচরিত, সৎ এবং খাঁটি মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে চায়। যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া উঠে, সেই শিক্ষাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া গণ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করা এবং মহান্ ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে কোন না কোন ভাষার সাহায্য ব্যতীত ঐ প্রকার শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হইতেই পারে না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে মাতৃভাষাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সুবিধা-জনক উপায়। একেই ত উচ্চশিক্ষালাভ করা দুরূহ, তাহার উপর কঠিন বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে সর্ব্ববিধ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকায়, উচ্চশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা যে দুরূহতর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এই ভাষা-সঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ নানাবিধ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতের সমক্ষে কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়াছে। ভারতবাসীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য এইভাবে স্বীকৃত হওয়ায় আমি যে ভারতবাসী বলিয়া অন্তরে গৌরব অনুভব না করি এরূপ নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও নিবেদন করিতে চাহি যে, বর্ত্ত-

মান ভাষাসঙ্কট বজায় রাখিয়া যেন আমাদের এই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-সম্পৎকে অকারণ অকালগ্রস্ত করিয়া না ফেলা হয়; বরং, যাহাতে আমাদের ছাত্রবৃন্দের বুদ্ধি এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তিকে ভাষা-সঙ্কট হইতে, অর্থাৎ কঠিন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার পাষাণ-চাপ হইতে, মুক্তি দিয়া স্বাভাবিক-ভাবে উহারা যাহাতে বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা করিলে তবে আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপযুক্ত সদ্-ব্যবহার করা হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাতে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ নিজ মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিতেছি। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, আমার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা এখন অতি দুরূহ বলিয়াই গণ্য হইবে। ইহাও আমি জানি যে বর্ত্তমানে ভারতীয় কথিত ভাষা সকল যে পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল ভাষাকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার,—বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার, উপায়স্বরূপ গ্রহণ করাও সুকঠিন। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি (এবং যাহা স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই) যে, ছাত্রবৃন্দকে নিজ নিজ মাতৃভাষায়, অর্থাৎ তাহাদের কথোপকথন এবং চিন্তা করিবার ভাষায়, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কোন্ ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন পৃথক বিচারের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এ স্থলে আমরা নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে যেন কোন ক্রমেই বিস্মৃত না হই :—

(১) বর্ত্তমান ভারতের বিশিষ্ট অবস্থা।

(২) আমাদের দেশীয় ভাষার অপরিপুষ্ট অবস্থা (কারণ, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ কেহই ভাষা-সমস্যার প্রতি আজি পর্য্যন্ত তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই)।

"ইহা দ্বারা এই লাভ হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে দেশীয় ভাষার সাহায্যেই কেবল সর্ব্ববিধ শিক্ষার, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। সুতরাং সমস্যাটী তিন ভাগে বিভক্ত হইতেছে :—

(১) দেশীয় ভাষাগুলিকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার 'বাহন'-স্বরূপ করিতে হইলে, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কি?

(২) দেশীয় ভাষাগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় (যাহাকে আমি অতঃপর

মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিব) আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কি প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, যাহার দ্বারা একদিন আমাদের চরম লক্ষ্যস্থল যে মাতৃভাষার সাহায্যেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রদান করা, তাহা সংঘটিত হইতে পারিবে ?

(৩) দেশীয় ভাষাগুলি পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়া যাহাতে উচ্চ শিক্ষার বাহন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশ্ব বিদ্যালয়ের কি ব্যবস্থা করা আবশ্যক ?

"এই সকল অবস্থার প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি প্রস্তাব করি, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে যে নূতন আইন হইবে, তাহার মধ্যে ইহা যেন স্পষ্টরূপে বিহিত হয় যে, অতঃপর বিশ কিংবা পঁচিশ বৎসরের পর হইতে কি উচ্চ, কি প্রাথমিক, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যেই প্রদান করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষারাজ্যে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইবে এবং আমাদের দেশে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিচিত্র অবস্থার জন্য যে সকল জটিল ও দুরূহ সমস্যা ঘটিয়াছে, সেগুলির সমাধান সহজেই হইয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর প্রভূত আনন্দ ও উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।"

যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য হইবে যে যাহাতে এই আবান্তর কাল বৃথা নষ্ট না হয় এবং ঐ কালের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ যাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যানুকূল হইয়া উঠে, তাহা সর্ব্বতোভাবে করা। যাহা যাহা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমি পূর্ব্বোক্ত কমিশনারগণের নিকটে বলিয়াছি—সেইগুলি সংপ্রতি আপনাদের নিকটে নিবেদন করিতেছি :—

(ক) ইউরোপীয় অথবা ভারতীয় সুপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে যোগ্য শিক্ষক গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ে শিক্ষকতা করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে যাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় এবং যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের লব্ধজ্ঞান বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যের জন্য ইউনিভার্সিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথোচিত সাহায্য লইয়া গ্রাজুয়েট গণকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর সুযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন। এই প্রকারে যে সকল গ্রাজুয়েট ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে এই কথা ইউনিভারসিটি বুঝাইয়া দিন যে, তাঁহারা যে যে বিষয়ে এইভাবে অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই বিষয়ে বঙ্গ-

ভাষায় বক্তৃতাদান এবং পুস্তক রচনা করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের বঙ্গভাষায় শিক্ষোপযোগী নানাবিধ উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। এই প্রকার সৎ-সাহিত্য ব্যতীত ছাত্রগণের মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষালাভের আশা অসম্ভব। যে Research প্রফেসরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধুনা অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন ও লিখিতেছেন, সেই প্রকার Research Professor এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া চলিবে।

(খ) বঙ্গভাষায় শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে Extension Lecture প্রদান করিবার বন্দোবস্ত ইউনিভার্সিটি করুন। যে সমস্ত উপযুক্ত গ্রাজুয়েট এখন পাওয়া যায় এবং উপেরাক্ত (ক) বিধানুসারে যাঁহারা সুশিক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গলা-ভাষায় নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করা হউক। বিষয়গুলি এই :—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান (Mental and Moral Science) ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র (Economics) অঙ্কশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান (Material Science) এবং কলাবিদ্যা (Technology)। এই প্রথায় কার্য্য চলিলে উচ্চ শিক্ষা জনপ্রিয় হইবে এবং উচ্চজ্ঞানের পুরিপুষ্টি ও উন্নতির পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিবে, অথচ সেই সঙ্গে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সুন্দর সুন্দর পাঠ্য পুস্তক-রচনা করিবারও সুবিধা ঘটিবে। কোনও ভাষার সাহায্যে কিছুকাল যাবৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান না চলিলে এবং পঠন-পাঠনাদি না ঘটিলে, সেই ভাষায় কোনরূপ উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক রচিত হইতে পারে না। ইহাই ভাষার পরিপুষ্টি-সাধনের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। যে ভাষায় এবং যে বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইবে, কেবল সেই ভাষাবিৎ এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োজিত করিলেই সুন্দর পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতে পারে না।

(গ) বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের কলেজের অধ্যাপকগণকে বাঙ্গলা ভাষায় অধ্যাপনা করিবার জন্য এবং ছাত্রগণকে বাঙ্গলা ভাষায় প্রশ্নোত্তর লিখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হউক। এই ব্যবস্থা আমাদের অধ্যাপকগণের নিকটে নিতান্ত নূতন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, আমি জানি, অনেক যোগ্য অধ্যাপক বর্ত্তমানেও ঐরূপ ভাবে অবিধিপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কতকগুলি বিষয় আছে, যেমন

ইতিহাস, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি, যেগুলির অধ্যাপনা উচ্চ শিক্ষার কোনও ক্ষতি না করিয়া, এখনই বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে চলিতে পারে এবং যাহার বিষয়ে ছাত্রেরা বাঙ্গলাভাষায় উত্তর লিখিতে পারে। যতদিন না ইউরোপীয় ইতিহাস পড়াইবার জন্য যোগ্য বাঙ্গালী অধ্যাপক পাওয়া যাইতেছে, ততদিন ইতিহাস শিক্ষা-কল্পে এ দেশে কিছুকালের জন্য ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ ও ইউরোপীয় অধ্যাপক নিয়োজন করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় কি কি বিষয়ের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা-কার্য্য চলিবে, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা আপাততঃ আমাদের ইউনিভার্সিটির হস্তে থাকা প্রয়োজন। ইহা আমার পক্ষে বলা বাহুল্য যে, ইউনিভার্সিটি উক্ত বিষয়ে ক্ষমতা পরিচালন করিবার সময় নিম্ন-লিখিত দুই মূল উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করেন :—

(১) যেন অকালে বাঙ্গালাভাষায় অধ্যাপনা এবং পরীক্ষার কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা কোনমতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং পক্ষান্তরে—

(২) বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণকে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা করিবার পথ যাহাতে সুগম হয়, তৎপ্রতি সাহায্য প্রদান ব্যতীত যেন কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত না করা হয়। এই কারণে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যবহার করিবার পক্ষে আমাদের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দকে যেন ক্রম-বর্দ্ধনশীল-ভাবে অধিকার প্রদান করা হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে বহু আলোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেইগুলি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এখানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, দেশপূজ্য স্বর্গগত মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্তগুলির খসড়া নিজে লিখিয়াছিলেন; সিদ্ধান্তগুলি এই :—

"(১) শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষাসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন, কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষাই যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা

পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটের আর কোন আশঙ্কা নাই। (Intermediate) পরীক্ষাতে অধিকাংশ বিষয়েই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম এ পরীক্ষার বিষয়ও একদিন বাঙ্গলা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর পাঁচ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ে সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

(৩) আর একটী বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

(৪) এম এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য, বঙ্গভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা যাহাতে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার শ্রদ্ধের সুহৃৎ মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, শুনুন,—"আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিতও কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষাদান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথাও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই।" আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, গত University Commission শিক্ষা সম্বন্ধে এই যে একটী প্রকাণ্ড বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাহার একটা সুমীমাংসা করিবেন। আশা করার বিশিষ্ট হেতুও ছিল। কারণ, আপনারা সকলেই জানেন যে, মাননীয় সরস্বতী মহাশয়

একজন অদ্বিতীয় শক্তিমান্ পুরুষ এবং তিনি প্রাগুক্ত University Commission এর একজন বিশেষভাবে প্রতাপশালী সদস্য ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ঐ Commission যে Report লিখিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাটের কোন মীমাংসাই হয় নাই সুতরাং সাহিত্য-সম্মিলনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি হইবার পূর্ব্বে সমস্ত প্রকার শিক্ষার বাহন যাহাতে অচিরে বঙ্গভাষাই হয়, তাহার জন্য দেশমধ্যে বিশেষভাবে আন্দোলন উপস্থিত করা। এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার অনেক মাতৃভাষানুরাগী কৃতী সন্তান উপস্থিত আছেন; তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাহাতে প্রত্যেক জেলায়—এমন কি, প্রত্যেক মহকুমায় এই আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন, ইহা তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ। এই প্রকার দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র আন্দোলন উপস্থিত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং আমাদের গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে সাহসী হইবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। চাই কেবল সকলকে বুঝান এবং সকলের মন্তব্য কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। শুনিতে পাই, দেশের শিক্ষাবিভাগ এখন নাকি আমাদের দেশস্থ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আরও আপনারা সকলে সেদিন আমাদের নূতন লাট বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছেন যে Transferred Department সম্পর্কে দেশীয় প্রজাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ কৌন্সিলই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ঐ সকল বিষয়ে Parliament কিংবা Government of India, ইঁহাদের কোনও আধিপত্য নাই। শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কর্তৃত্বই কৌন্সিলের উপর বিন্যস্ত হইয়াছে এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় কৌন্সিলের নিকটই সর্ব্বপ্রকারে দায়ী। এইবার দেখা যাইবে, এই কথাগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে কি না? বঙ্গবাণীকে অচিরে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বাহন করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বাহন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইনে স্পষ্টরূপে বিঘোষিত হওয়া উচিত যে, অতঃপর বিশ কিংবা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কি উচ্চ, কি প্রাথমিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যেই প্রদান করা হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় এই ঘোষণার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষারাজ্যে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইবে। আমাদের এবং আপনাদের সকলেরই ঈপ্সিত

এবং প্রার্থিত এই কল্পনা বাস্তব করিতে হইলে কর্তৃপক্ষগণের যাহা কর্তব্য, তাহার কতক ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি; কিন্তু এতৎসম্পর্কে আমাদের অর্থাৎ বঙ্গবাসী মাত্রেরই কিছু কিছু কর্তব্য আছে। তাহা একটু বিস্তৃত ভাবে বলিব, ইচ্ছা করিতেছি। উহা বলিবার পূর্ব্বে এতদিন যে যে বিষয়ে আমাদের স্বদেশবাসীরা সম্পূর্ণ মনোযোগ করেন নাই, তৎপ্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, তারপর বর্তমান কর্তব্য কি কি, তাহার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাইয়া আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিব।

দেশীয় ভাষা, এমন কি, দেশীয় বিদ্যার প্রতি এই দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি প্রকার যত্ন ছিল, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে না বলিয়াই পারিতেছি না। আপনারা জানেন, লর্ড রোণাল্ডসে বলিয়াছেন :—
"It is Western Philosphy only that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree who receive at the hands of their Univeesity draught those springs of profound philosophic thoughts which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly." "That an Indion student should pass through a course of philosophy at an Indian ;University without hearing some mention of, shall I say, Sankara, the thinker who perhaps has carried idealism farther then any other thinker of the Nyaya System which has been handed down through immemorial ages and is to-day the pride and glory of the Tols of Navadwipa, does appear to me to be a profound anomaly."

কিন্তু লর্ড রোণাল্ডসে বোধ হয় জানিতেন না যে M. A. পরীক্ষায় বর্ত্তমান কালে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র যে অধীত হইতেছে, তাহাও অতি অল্প দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। আমি যখন সেনেটে প্রথম প্রবেশ করি তখন দেখি যে, সেই সময় পর্য্যন্ত কোনও পরীক্ষায় ভারতীয় দর্শনের ছিটা ফোঁটাও ছিল না। বহু চেষ্টা এবং বহু বাদ প্রতিবাদের পর যখন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের

কোন কোন অংশ M. A. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইল, তখন যেন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি সমন্বয় করিয়া জাতিতে উঠিল। কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রকার অবস্থা সত্ত্বেও শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ, জাপান অঞ্চলে দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা করার জন্য সুধী প্রেরণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নিজেদের কৃতিত্বের কথা সাহঙ্কারে প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রকার প্রমাদ কেবল এই দেশেই সম্ভব-পর। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদিন ভারতীয় দর্শনাদি এবং ন্যায়শাস্ত্রাদিকে উপেক্ষার চক্ষে না দেখিতেন, তাহা হইলে কি এত দিনের মধ্যে উহার রীতিমত পঠন পাঠন হইয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক একখানিও রচিত হইত না? দেশে কিছুই নাই, দেশের সমস্তই খারাপ—এমন কি, জীবনচরিত পড়িতে হইলেও ডুবাল চরিত, তামস ইক্লচরিত পড়িতে হইবে, দেশীয় কোন মহাপুরুষের জীবন-চরিত পাঠ করা নিষ্ফল, এই প্রকার যে একটী প্রকাণ্ড ধারণা এই দেশের লোকের মনে দৃঢ়রূপে ছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল আমাদের মানসিক সম্যক্ অবনতি, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় বলা চলে—slavish and degraded mentality. শ্রীভগবানের কৃপায় দেশের এই তমসাচ্ছন্ন ভাব দূর হইতেছে। এত দিন এই প্রকার পুস্তকাদি রচিত হয় নাই, ইহা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার "বাহন" করিতে হইলে উহাকে সর্ব্বাগ্রে ভাব-সম্পদে এবং জ্ঞান-সম্পদে মহীয়সী করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার ঘটিবে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভাষা জ্ঞান-প্রচার সাধনমাত্র, সাধ্য হইতেছে—প্রকৃত জ্ঞান-অর্জ্জন ও তাহার বিস্তার। যে ভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করিব, সেই ভাষা যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্যের অভাবে এবং ভাব-সম্পদে দরিদ্র হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ভাষার ভাণ্ডার জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা সেই ভাষাভাষীদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। শিক্ষিত বঙ্গবাসী যদি সেই চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার নিকটে এবং স্বদেশের নিকটে তিনি গুরুতর অপরাধী। যাহারা ঐ প্রকার চেষ্টা আদৌ না করেন, তাহাদিগকে আমি

নিম্ন-লিখিত ব্যক্তির সহিত সমান দোষী বলিয়া মনে করি। মনে করুন, আমাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যাবলে কিম্বা বুদ্ধিবলে বিদেশে গিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন এবং সেই অর্থ কেবল বিদেশেই ব্যয় করিতে থাকেন তাহা হইলে তাহাতে দেশের কোনও লোকেরই উপকারে আইসে না। এই প্রকার লোকের দ্বারা আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের যদি কোন উপকার সাধিত না হয়, তবে তিনি যে আমাদের একজন, এ কথা ভাবিবার আমাদের কি থাকে এবং মনুষ্যত্ব হিসাবে তিনি স্বদেশবাসীদের নিকট কর্ত্তব্য পালন না করার হেতু অবশ্য নিন্দনীয় হয়েন। সেই প্রকার, যে বঙ্গবাসী ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা, এমন কি, সংস্কৃত ও আরবী, পার্শী ভাষাতে বুৎপন্ন হইয়া যদি তাঁহার অধীত বিদ্যাপ্রচার ও প্রকাশকল্পে কেবল ইংরাজী প্রভৃতি ভাষারই আশ্রয় লয়েন, মাতৃভাষার দিক্ দিয়াও না চলেন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্যায় আমার দেশের লোকের কি কাজ হইল? তাঁহার নাম নানা স্থানে বিঘোষিত হইয়া তাঁহার অহঙ্কার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের লোকের তিনি বড় একটা কোন কাজেই আসেন না। যে শিক্ষিত লোক এই ভাবে চলেন, তিনি অবশ্যই নিন্দনীয়—মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃ-ভাষার ভাব-সম্পদে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রতার দিনে তাঁহার ঐ প্রকার অপরাধের মাত্রা কিছু অধিকই হইয়া থাকে, ইহা সুধীগণ অবশ্যই বুঝিবেন। তাই আমি অনুরোধ করি এবং শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন অতঃপর মাতৃভাষার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, মাতৃ-ভাষার অভাব পূরণ করেন এবং দরিদ্রতা মোচন করেন। মাতৃভাষার ভাবসম্পৎ বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহা যাহা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহা নিম্নে ধারাবাহিক-রূপে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি,—

(১) **বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার নানা বিষয়-সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করান।** এই অনুবাদ-কার্য্যটী যেমন কঠিন, তেমনই প্রয়োজনীয়। যিনি যে গ্রন্থের অনুবাদ করিবেন, তাঁহাকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে এবং গ্রন্থের ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইবে—নচেৎ অনুবাদ ব্যর্থ হইবেই। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশেষ বুৎপন্ন ব্যতীত অন্য লোকের

কৃত অনুবাদ যে কি প্রকার ভয়াবহ এবং স্থানে স্থানে হাস্যজনক, এ দেশে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং গ্রন্থের ভাষায় সম্যক অধিকার থাকিলেও যে সর্ব্বত্র অনুবাদের কাজ সুষ্ঠুরূপে ঘটে, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, যিনি অনুবাদ করিবেন, তাঁহারও ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা এবং সৌকর্য্য থাকা আবশ্যক। আপনারা অনেকে জানেন যে, বর্ত্তমানে অনেক অনূদিত গ্রন্থ অনুবাদ-পাঠে নিতান্ত দুর্বোধ বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই সেই গ্রন্থের মূল আলোচনা না করিলে প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা সহজ হয় না। ইহাই যদি হইল, তবে অনুবাদ করিয়া লাভ কি? উহাতে ত প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাষার ভাবসম্পৎ বৃদ্ধি হইল না। আমি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি, যাহা পাঠে বোধ হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকেরা কেবল বিভক্তিগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া মূল গ্রন্থের অবলম্বিত পদরাশিই অনুবাদে নিবিষ্ট করেন। ইহা একটা কিম্ভূত-কিমাকার দুর্বোধার্থক বাক্যাবলীর সমাবেশ মাত্র। অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা, ভাব প্রকাশের সৌকর্য্যের অভাববশতঃ এমন একটা অনুবাদ খাড়া করেন, যাহার অর্থ যে মাথা-মুণ্ড কি—তাহা অনুবাদক ব্যতীত অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সচরাচর অনুবাদ দুর্বোধ হইয়া যে ব্যর্থ হয়, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

সার্থক অনুবাদ করিবার ক্ষমতা বহু সাধনা-সাপেক্ষ। এই প্রকার সাধনার ব্যবস্থা এবং সার্থক অনুবাদ করাইবার কোনও অনুষ্ঠান নাই—উহার জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। ভাষান্তরে লিখিত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে করিতে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও ভাষার ভাবসম্পদ্-রহিত অবস্থায় উহার উৎকর্ষ-বিধানের জন্য অনুবাদ করান একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়। অনুবাদ করিতে করিতে কেমন করিয়া নিজেদের ভাষাতেও ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে সৌকর্য্য ঘটে, তৎসম্বন্ধে একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন, শ্রবণ করুন,—

By rendering ourselves the faithful interpreters of the thoughts and feelings of others, we are rewarded with the acquisition of greater readiness and facility in correctly expressing our own; as he, who has best learnt to execute

the orders of a commander, becomes himself best qualified to command."

এই প্রকার অনুবাদ-কার্য্যের দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার যে কত প্রকারে ভাব-সম্পৎ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। এক দিকে যেমন ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের দুই সর্ব্বপ্রধান জাতির, অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমান জাতির, প্রাচীন সাহিত্য-গর্ভে নিহিত নানা প্রকার তত্ত্বকথা আমাদের বঙ্গভাষাভাষী সর্ব্বসাধারণের গোচরে আসিবে, অন্য দিকে তেমনই বর্ত্তমান ইউরোপীয়দিগের উদ্ভাবিত নূতন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের নানা রহস্য আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে। ভাব-সম্পৎ এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার এই উপায়েই অনেক পরিমাণে পুষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রকারে প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ হইলে পরস্পরের জাতীয় মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পরস্পরের মনোমালিন্য অধিক পরিমাণে দূর হইবে। হিন্দুমুসলমান-বিদ্বেষ উপলক্ষে কোন কথা উঠিলেই আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বলিয়া থাকি যে, এই বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপন করার চেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহারাও কম উদাসীন নহেন। Racial antipathy অর্থাৎ জাতিগত বিদ্বেষ কতকটা অজ্ঞ মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক; কিন্তু যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মহত্ত্ব পরস্পরের নিকট অপ্রকাশ না থাকিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিদ্বেষভাব থাকিবার অবকাশ একেবারেই হয় না। এতৎসম্বন্ধে আমি একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব। আমি একজন হিন্দু-সমাজভুক্ত ব্যক্তি এবং নিজেকে আনুষ্ঠানিক হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতে কুণ্ঠিত নহি। প্রাচীন আর্য্যদের আদর্শের আমি একজন একান্ত ভক্ত; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও মূল সূত্র এবং মুসলমান ভক্তগণের জীবন-চরিত যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অনেক সময়ে মনে মনে অনুভব করিয়াছি যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ-ভাব হওয়া ত দূরে থাকুক,—যদি নিজে প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিতাম, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ বোধ করিতাম। বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ আর প্রায় নাই বলিলেও হয়; শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই ভাব চিরস্থায়ী করেন। কিন্তু কেবল প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ যে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের সকলেরই, বিশেষতঃ এ দেশবাসী শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল

অমূল্য উপদেশ আছে এবং তাঁহাদের মহাপুরুষদের জীবনে যে সকল ঈশ্বর-বিশ্বাসের এবং ভগবদ্ভক্তির কথা মূর্ত্তিমদ্-রূপে বিরাজিত আছে, তাহা তাঁহারা বঙ্গভাষায় প্রচারিত করিয়া দেশব্যাপী কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করুন। অচিরে দেখিবেন যে, আমাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য সাধন অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

(২) উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করান। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গভাষায় উচ্চ উচ্চ বিষয়ে কোনও গ্রন্থ নাই—এ অবস্থায় বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষার বিধানকল্পে চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। হইতে পারে সর্ব্ববিষয়ে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ বর্ত্তমানে নাই; কিন্তু সেটা কাহার দোষে ঘটিতেছে? বঙ্গভাষা, ভাষার মধ্যেই নহে, উহা কখনও উচ্চশিক্ষার—এমন কি, মাধ্যমিক শিক্ষারও উপযুক্ত নহে বা হইতে পারে না—এই প্রকার কুসংস্কারের ফলস্বরূপ জড়তা-নিবন্ধন কি উহা ঘটে নাই? নিশ্চয়ই ঐ জড়ভাবশতঃই আজও পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষার ঐ প্রকার অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বরং আমাদের লজ্জিত হইয়া, উহার নিরাকরণ উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গ্রন্থাদি রচিত না হইলে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার "বাহন" করিব না—এই ভাবে যদি আমরা মুগ্ধ থাকি, তাহা হইলে বঙ্গভাষার দরিদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতা কখনই দূর হইবে না। জলে না নামিলে যেমন সাঁতার শিক্ষা করা যায় না, তেমনই বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প না হইলে, কখনই বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় পঠন-পাঠন আরম্ভ হইবে—বিঘোষিত হউক, তৎক্ষণাৎ দেখিবেন যে, উপযুক্ত গ্রন্থ লেখার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঝোঁক অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে এবং অবান্তর কালে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহা আরম্ভ হইলে দেখিবেন যে, সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হইবে এবং দিন দিন বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রকার ভাব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিপাদ্য বিষয়ই প্রকাশের অনুকূল হইয়া বঙ্গবাণী সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। নূতন নূতন বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনাকালে অনেক পরিভাষা এবং অনেক নূতন শব্দ সৃষ্টি করা

অত্যাবশ্যক। আপাততঃ ঐ সকল কার্য্য যে ভাবে হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোনও শৃঙ্খলা দেখা যায় না। যিনি যেমন মনে করিতেছেন, তেমনই একটা না একটা শব্দ সৃষ্টি করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। শাস্ত্রবিশেষের পরিভাষা সৃষ্টি, শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহু আলোচনা এবং পঠন-পাঠন আদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভাব-বিনিময়ের উপরে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরিভাষা সৃষ্টি আজ্ঞাসিদ্ধ নহে। এই সম্বন্ধে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বহু চেষ্টা করিয়াছেন—সর্ব্বদা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না; ইহা পরিষদের চেষ্টার অভাবে ঘটে নাই; দেশ মধ্যে ঐ ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে বঙ্গভাষায় আলোচনার একান্তাভাব না হইলেও অত্যন্তাভাব এবং ঐ ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়ে বঙ্গভাষায় পঠন-পাঠন প্রচলিত না থাকাতেই পরিষদের চেষ্টা সর্ব্বথা সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষবর্গের উদাসীনতাই এ স্থলে প্রধান কারণ। অতঃপর তাহা যাহাতে আর না থাকিতে পারে, আপনারা সকলে সমবেত চেষ্টার দ্বারা তাহা করুন। পরিভাষা সৃষ্টি এবং নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের কথা শেষ করিব। মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ কি বলিতেছেন, তাহা আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—"যত দিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন-পাঠন সাধিত হইবে ততদিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শন-চর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিকিয়া যাইবে।" হীরেন্দ্র বাবু দার্শনিক পরিভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন—তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আর একটি কথা আমি না বলিয়াই পারিতেছি না। বর্ত্তমানে দেখিতে পাই যে, কোন পরিভাষা সঙ্কলনের আবশ্যকতা ঘটিলে এবং নূতন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন হইলে, বিনা অনুসন্ধানেই একটা না একটা আপাততঃ কার্য্যোপযোগী অর্থবোধক শব্দ আমরা অনেকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি। অনেক সময়ে ঐ ঐ বিষয়ে কোন শব্দ বা কোন পরিভাষা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, তাহা জানিবার ধৈর্য্যটুকুও আমাদের থাকে না। এই বিষয়ে আমাদের কতকটা সংযম অভ্যাস করা

এবং নিপুণতা সহকারে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণা অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। যে দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাক্তার ডফ্ সাহেবকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, "ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে এমন কিছু নূতন কথা নাই, যাহা ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা জানেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে ইউরোপীয় দর্শন প্রচারের চেষ্টা করা বৃথা।" শুনিয়াছি, একদিন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকের মুখে Kant, Hegel প্রভৃতি দার্শনিকগণের অজস্র প্রশংসাবাদ শুনিয়া বারাণসীধামে Dr. Venis, মহামহোপাধ্যায় ৺ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের শরীর দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "রাখ তোমার Kant, Hegel.—ঐ যে প্রাচীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, উঁহার একখানি ক্ষীণ পঞ্জরের মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার শতাংশের একাংশও সমগ্র ইউরোপের দার্শনিকগণের মধ্যে নাই।" এই অবস্থায় দার্শনিক প্রতিশব্দ এবং পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে এ দেশে যে কোনও চিন্তার কারণ আছে, তাহা নাই; উহা অতি সহজেই সঙ্কলিত হইতে পারিবে। চাই কেবল আমাদের প্রেরণা আর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ দার্শনিকবর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত এবং পালিভাষায় লিখিত ও ব্যবহৃত দার্শনিক শব্দের সূচী প্রস্তুত করা। উহা কম আয়াস ও ব্যয়সাধ্য নহে; সুতরাং উহারও ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যিনি যখন কোনও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার প্রতি আমার নিবেদন এই—তিনি যেন হঠকারিতার সহিত একটী শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সাহিত্যমধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত না করেন। তাঁহাকে বিশেষ নিপুণভাবে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কি ভাবে শব্দ সৃষ্টি করিলে বঙ্গভাষার সহিত উহা ঠিক খাপ খাইবে এবং অকারণ বৃথা শব্দ সৃষ্টি করিয়া ভাষা বোঝা বৃদ্ধি করা না হয়। এই সম্বন্ধে একজন প্রধান গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আপনাদিগকে শুনাইতেছি :—

"Some modern writers, however, have indulged in a habit of arbitrarily fabricating new words and a new-fangled phraseology without any necessity and with manifest injury to the purity of language. This vicious practice, the offspring of indolence or conceit, implies an ignorance or neglect of the riches in which the English language already

abounds and which would have supplied them words of recognised legitimacy, conveying precisely the same meaning as those they so recklessly coin in the illegal mint of their own fancy."

এখানে গ্রন্থকার ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, আমাদের বঙ্গ-ভাষা সম্বন্ধেও তাহা অধিকতর প্রযোজ্য; কারণ, তাহার পশ্চাতে সংস্কৃত, পালী ও প্রাকৃত ভাষার বিরাট সাহিত্য রহিয়াছে। উপযুক্ত ভাবে অনুবাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত ও সুব্যবস্থিতরূপে চলিলে, ভাষার অসম্পূর্ণতা আর থাকিবে না এবং গবেষণা করিয়া যাঁহারা মানবীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে নূতন রত্নাদি উপহার দিবেন, তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত বিষয়ের এবং নবাবিষ্কৃত তথ্যের কথা বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইবে না।

বর্ত্তমানকালে আমাদের মাতৃভাষায় যাঁহারা উপন্যাস লিখিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ভরসা করি, এখানে তাহা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহারা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, প্রায়শঃ সেইগুলি তজ্জাতীয় ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে রচিত হয়। উহাতে যে সকল প্রণয়কাহিনী দেখা যায়, তাহা বিদেশের আমদানি—আমাদের দেশের রীতি-প্রকৃতির সহিত যে উহা খাপ খায় না, এ কথা বোধ হয়, আমাদের উপন্যাস লেখকগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বদেশের রীতি ও প্রকৃতি এবং মানসিক প্রবৃত্তিগুলি সম্যক্‌ভাবে অনুশীলিত না হওয়ায় এবং দেশের প্রাচীন বিবরণাদির প্রতি যথোচিত আস্থা এবং আসক্তি না থাকায়, এই প্রকার কতকটা খাপ ছাড়া ভাবে যে দেশে উপন্যাসগ্রন্থ লিখিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার এবং প্রাচীন বিবরণাদি সংগ্রহকল্পে নিম্নে যাহা বলিলাম, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশা করি। সংপ্রতি উপন্যাস-লেখক মহোদয়দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যদি স্বদেশী এবং পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া, ঠিক ঠিক তদানীন্তন কালের উচিতমত ঘটনার সমাবেশ এবং মানবপ্রকৃতির ও সমাজের অবস্থাদি চিত্রিত করিয়া উপন্যাসাকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহারা এক

উপন্যাস পড়িয়াই দেশ এবং বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের মানব-চরিত ও সমাজ চরিত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রস-সাহিত্য-পাঠের আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইবেন না। আপনারা অনেকে জানেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপে কিছুকাল হইতে এই ধারায় উপন্যাসগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ হওয়ায়, ঐ দেশের লোকদের মধ্যে যাঁহারা নিজে বিশেষ কোন গবেষণা করেন নাই, তাঁহারাও প্রত্ন-তত্ত্বসংক্রান্ত অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং ঐ প্রকার মিসর ও গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাকালীন মানব-চরিত ও সামাজিক অবস্থা বিষয়ে জীবন্তভাবে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে পথ দেখাইছেন। আশা করি, ঐ পথ অনুসৃত হইয়া উপন্যাসগ্রন্থ লিখিত হইবে। আমাদের দেশে অশেষ প্রতিভাশালী উপন্যাস-লেখকের অভাব নাই। তাঁহারা মনে করিলে বঙ্গভাষাতে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ অথচ মানব-প্রকৃতির রহস্য-ব্যঞ্জক সুন্দর সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষার প্রভূত উপকার এবং পাঠকপাঠিকার জ্ঞান-সঞ্চয়ের পথ সুগম করিতে পারেন। আমি উপন্যাস খুব বেশী যে পড়িয়াছি, তাহা মনে হয় না; সুতরাং এক হিসাবে উপন্যাস গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে আমার কোন কথা বলিতে যাওয়া একপ্রকার অনধিকার-চর্চ্চা। তথাপি কর্ত্তব্য-বোধে এখনে উপন্যাস একটা প্রধান দিক্ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহার বিচার আপনারা করিবেন।

(৩) **বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ-সকলের রীতিমত উদ্ধার এবং তাহার সদ্ব্যবহার** কিছু দিন হইল, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত লেখেন, তখন যে যে প্রাচীন গ্রন্থ জানা ছিল, তাহা অপেক্ষা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রযত্নে অনেক অজানিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পর প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব, মৌলবী আব্দুল করিম প্রভৃতি মহাত্মাগণের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অশেষ চেষ্টায়, বর্ত্তমানে অনেক প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। রীতিমতভাবে এই অনুসন্ধানের কাজ চলিলে, আরও অনেক লুপ্ত গ্রন্থরাশি যে আমাদের গোচরে

আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আলমারি বোঝাই করিয়া রাখিলে চলিবে না। উহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। বলিতে দুঃখ হয়, আমরা অদ্যাপি কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গভাষার মধ্যমণিস্বরূপ গ্রন্থের সুসংস্করণ বাহির করিতে পারি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, দেশমধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণের উপর ঐ ঐ গ্রন্থের সম্পাদনভার অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর আশা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই এবং ঐ সকল গ্রন্থকারের পূত নামের এবং তাঁহাদের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির প্রতি আমাদের যে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা আমরা প্রতিপালন করিতে পারি নাই। বঙ্গবাসীর এই কর্ত্তব্যের ত্রুটি আর কত দিন থাকিবে? আপনারা সকলে মনোযোগী হউন; যাহাতে অচিরে প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ পাঠসহ বাহির হয়, এবং বঙ্গবাসী পাঠক-পাঠিকার গোচরে আইসে, তাহা করুন। এই সকল গ্রন্থ রীতিমত আলোচিত হইলে, উহার দ্বারা আমাদের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য ঐ সকল গ্রন্থ সুসম্পাদিত এবং রীতিমত আলোচিত হইলে, উহা দ্বারা যে যে ফললাভ অবশ্য ঘটিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আপনাদের হয় ত জানা কথা পুনরাবৃত্তি করিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদি মনোনিবেশ সহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে তদ্দ্বারা তদানীন্তন কালের লোক-চরিত্র, সমাজ-বিন্যাস, ধর্ম্মবিশ্বাস, আহার বিহারাদি দৈনন্দিন সামাজিক জীবন যাপনের বিধি-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি কত বিষয় যে আমাদের আয়ত্ত হইবে, তাহা অগ্রসূচি হইয়া বলা অসম্ভব। আমি যে যে বিষয়ের কথা বলিলাম, ঐ ঐ বিষয়ে আমাদের যে অশেষ প্রকারে জ্ঞান-বৃদ্ধি হইবে, তাহার পক্ষে ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আমি আশা করি যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অনেক নূতন নূতন তথ্য আমাদের মনে উদ্ভাসিত হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের দেশে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সমাজের ভিতরে যে একটী বিদেশী ভাবের চমক আছে, তাহা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত দেশের মর্ম্মস্থান কোথায়, তাহা আমাদের ভাল করিয়া বোধগম্য হইবে। দেশের

ভাবপ্রবাহ কোন্-খাতে প্রবাহিত ছিল, এবং কি সূত্রে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কি কারণে অন্য খাতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে, এতৎসম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবে। ইহাতে যে কি লাভ, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য হইলেও সুধীবর্গের অনুভূতির অতীত নহে। দেশের অবস্থা সম্যক্ অবধারণ না করাতে, সহসা বিদেশী ভাবের এক প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের অনেকাংশে যে মন্দ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়াছেন। সুতরাং সেই বন্যার কথঞ্চিৎ গতিরোধ করিতে হইলে দেশকে খুব ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। দেশকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, দেশের প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। তারপর আর এক প্রধান কথা প্রাচীন সাহিত্যাদি আলোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে, ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা। এই ব্যাপারটী সংসাধিত করিতে হইলে আনুষঙ্গিকরূপেই এই দেশের অনেক পুরাতত্ত্ব এবং অনেক প্রকার সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংঘর্ষের কথা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। আমি এখানে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমাদের সকলের পূজনীয় মাননীয় স্যর সরস্বতী মহাশয়ের মাতৃভাষানুরাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষার অনেক তত্ত্ববিষয়ে কতকটা গবেষণা হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারাই উদ্যোগে এই বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে, এবং কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে প্রবীণ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এখনও কাজ অনেক বাকি—এখনও সমগ্র উপকরণের সংগ্রহ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থাদি পড়িবার পক্ষে এক প্রকাণ্ড বাধা এখনও পর্য্যন্ত আছে এ সকল গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্ত্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং উহাতে বর্ণিত স্থানাদির সংস্থান সম্যকরূপে অবগত হইবার উপায় না থাকায়, ঐ গ্রন্থগুলি যে অনেক স্থলে কি প্রকার দুষ্পাঠ্য, তাহা অনেকে বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন। ঐগুলির অর্থ পরিষ্কার করা এবং প্রাচীন সাহিত্য-বর্ণিত ভাবরাশি বুঝিবার পক্ষে অনেক অনুসন্ধান করা আবশ্যক; বাড়ী বসিয়া অবসরক্রমে এবং আবশ্যকমত সংস্কৃত কোষাদির সাহায্যে উহার অর্থ নিষ্কাশন কিংবা ভাবরাশির সম্যক্ জ্ঞান-লাভ

ঘটিতে পারে না। এই সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদি সামান্যাকারে গ্রন্থের সম্পাদন করা হয়, তবে তাহা অন্ধকারে ঢিল মারার ন্যায় তদ্দারা উপকারের অপেক্ষা অপকারেরই সম্ভাবনা বেশী। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রকার সম্পাদিত একখানি প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিয়া, সম্পাদনের রীতি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সম্পাদক মহাশয় ঐ গ্রন্থের টীকায় প্রায়শ: জানিত শব্দেরই অর্থ দিয়াছেন, তাহাও আবার অনেক স্থলে গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা অপ্রচলিত, এমন কি, দুরূহ শব্দের দ্বারা। কিন্তু যে সকল শব্দ বা ভাব বর্ত্তমান কালে আমাদের দুর্ব্বোধ্য, তাহার সম্বন্ধে তিনি কৃপা করিয়া কোন অর্থই প্রকাশ করেন নাই, এমন কি, বোধ হয়, সেই দিকে মাথা ঘামান তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনাও করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন অভিধান সঙ্কলন করা অতীব আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়া, তাহাতে নিবদ্ধ আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি এবং শব্দপ্রয়োগের প্রণালী যাহাতে সুন্দররূপে উপযুক্ত লোকের দ্বারা আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে এই প্রকার সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে ঐ ঐ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি আলোচিত হইয়া, উপযুক্ত বিচারকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার পর, প্রবন্ধ-লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য পদকাদি পুরস্কার দেওয়াও কর্ত্তব্য।

(৮) দেশের প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রভৃতির সম্যক্ আলোচনা করিয়া, দেশের পুরা-কাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করা, তাহা যাহাতে রীতিমত প্রকাশিত হয়, দেশমধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যে, তত্তৎদেশবাসীর বৃত্তান্ত, তথাকার প্রাচীন বংশ এবং তত্তৎদেশের বিবরণ ঠিক সাহিত্যে (কি প্রাচীন, কি সাহিত্যে (কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান) এখনও স্থান পায় নাই। তাহার যদি রীতিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কত যে তথ্য প্রকাশিত হইয়া দেশের তমসাচ্ছন্ন যুগের কত গৌরবের কাহিনী সাধারণের গোচরে আসিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি নিজ নিজ দেশ বা পল্লীর প্রাচীন কাহিনী এবং তত্তৎস্থানের প্রচলিত শব্দাদির

সংগ্রহ করা তাঁহাদের জীবনের পণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, অচিরে আমাদের ঐতিহাসিক সাহিত্য কেমন সুন্দর ভাবে পুষ্ট হইবে। এই প্রকার অনুসন্ধানাদি আরম্ভ হইলে, ইহার ফলে বঙ্গদেশের সম্পূর্ণাবয়ব একখানি সামাজিক ইতিহাস রচিত হইবার পথ বিশেষ সুগম হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এ দেশে প্রায় এমন গ্রাম বা পল্লী নাই, যাহার প্রাচীন বিবরণে দেশের ইতিহাসের মাল-মস্‌লা পাওয়া যাইবে না। আবশ্যক কেবল দেশের লোকের মনোযোগ এবং দেশ-সেবার প্রতি উৎসাহ। এই সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব। আমাদের দেশের দিকে যাইতে রেল-পথে বসুরহাটের নিকট একটী ষ্টেশনের নাম বেড়াচাঁপা। ঐ গ্রামের ঐ নামের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাইলাম, ঐ প্রদেশে একজন মুসলমান বুজরুক ছিলেন। তাঁহারই অমানুষিক ক্ষমতায় তিনি নাকি সামান্য কাষ্ঠের বেড়াতে চাঁপা ফুল ফুটাইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি গ্রামের নাম হইয়াছে বেড়াচাঁপা। তারপর ঐ প্রসঙ্গে জনৈক গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বাঙ্গালার নবাবের নিকট স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগাদি, নবাবের সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি নানা কথা আছে। আমার স্মরণ হইতেছে, যেন ঐ বিবরণটী "পল্লীবাণী"র এক সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। উক্ত গ্রামেরই সন্নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার নাম চাঁপাপুকুরিয়া। গ্রামের নাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই প্রকার :— বহু পূর্ব্বে, যখন এ দেশে রেল-লাইন হয় নাই, তখন চাঁপানাম্নী একটী পতিতা রমণী বৃন্দাবন যাওয়া উপলক্ষে ঐ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বড় গ্রীষ্মের সময়; বোধ হয় চৈত্রের শেষ—বৈশাখ, কি জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। ঐ গ্রামে অবস্থিতিকালে চাঁপা দেখিতে পাইল যে, গ্রামে জল অভাবে মানুষের অশেষ কষ্ট, এমন কি, মাঠের গরু প্রভৃতি পশুরাও দ্বিপ্রহরে মাঠের মধ্যে জলপান উদ্দেশ্যে খানা-ডোবা প্রভৃতির দিকে যাইয়া পানীয় জল না পাওয়াতে হাম্বা রব করিতে করিতে ভূমিশায়ী হইতেছে এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া চাঁপার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। সে বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইবে বলিয়া যে অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইতেছিল, তাহার দ্বারা তীর্থ গমন না করিয়া, ঐ গ্রামের জল-কষ্ট নিবারণের জন্য একটী পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করিল এবং বলিল যে, এই গ্রামে জল-কষ্ট নিবারণ করিতে পারিলে তাহার বৃন্দাবন যাওয়ার অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য সঞ্চয়

হইবে। তদবধি ঐ পুষ্করিণীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইল। এতদ্বারা আপনারা অনুভব করিবেন যে, এই ভাবে যদি বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানের, এমন কি, অধিকাংশ স্থানের গ্রাম ও পল্লী এবং তৎস্থানের প্রাচীন বংশাদি স্মরণীয় বিষয়ের ইতিকথা সাধারণের গোচরে আইসে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কত কথা, কত পুরাতন কাহিনী এবং কত চমৎকার উপদেশ-পূর্ণ গল্প আমাদের গোচরে আসিয়া অশেষ প্রকারে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবে। এই সকল কাজের সহিত যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহাদের দেশের প্রচলিত শব্দ ও ছড়া সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্বের আলোচনাও কত সুগম হইবে এবং ভাষার শব্দ-সম্পৎ কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনারা অনুমান করিবেন। এই সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রায়-বাঘিন" নামক পুস্তকের মুখবন্ধে একটী বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইতিহাসের মাল-মস্‌লা সব গ্রামেই আছে, কিন্তু সব গ্রামে বিধু বাবু নাই—এই-ই দুঃখ।" ভরসা করি, মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের এই লেখা ব্যর্থ হইবে না।

আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি যে কাজের ভার দেওয়া উচিত বলিয়া ইতিপূর্ব্বে লিখিলাম এবং যাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহাতে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটী ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা অনেকেই জানেন এবং আমার বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকবৃন্দও জানেন যে, সুবিখ্যাত Dr. James A. H. Murray কর্ত্তৃক সম্পাদিত নূতন যে বৃহৎ একখানি ইংরাজী অভিধান Oxford University হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার নাম হইয়াছে A New English Dictionary, ঐ বৃহৎ অভিধানে শব্দাদি সংগ্রহ হইয়া যখন অভিধানের পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হয়, তখন তদুপলক্ষে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ঐ ভোজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ইংলণ্ড দেশে যুবকবৃন্দের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া মনে যে কি এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। যুবক-বৃন্দের মধ্যে যদি এমন কেহ থাকেন, যাঁহারা ঐ বৃত্তান্ত পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অচিরে

উহা পাঠ করেন এবং বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি কল্পে আমাদের সাহায্য করিয়া মাতৃভূমির প্রতি তাঁহাদের অন্যতম বিশিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে তৎপর হয়েন। বর্ত্তমানে যুবকবৃন্দের ঐ প্রকার কার্য্যে আসক্তি থাকা এবং সাধারণের সেবা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও তৎপরতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, সে জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এই অবস্থায় কি আমরা আশা করিতে পারি না যে, এই সকল অনুসন্ধান-ঘটিত ব্যাপারে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না?

(৫) **বাঙ্গলা ভাষায় রচনা-বিষয়ক কয়েকটী কথা।** আমাদের দেশে লেখকদের মধ্যে রচনার প্রণালী লইয়া বর্ত্তমানে কিছু মতভেদ দেখা যাইতেছে। তাহা ভাল, কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে করিব না করিবার প্রয়োজনও নাই। তবে যাঁহারা লেখন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদের নিকট গোটাকতক গোড়ার কথা আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতে চাই। কারণ, এই বিষয়ে লেখক অপেক্ষা বোধ হয়, পাঠকের কথা কহিবার অধিকার অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক! যাঁহারা লেখক, তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে বিভোর হইয়া নিজ নিজ ভাব সাহিত্যাকারে প্রকাশ করিতেই অনেক সময়ে ব্যস্ত থাকেন বলিয়াই বোধ হয়। অনেক সময়ে আবার নিজেদের চিন্তা-প্রণালী এবং শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নির্ভর করে। অর্থাৎ আমি যদি সর্ব্বদা মনোযোগ সহকারে কেবল ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থই পাঠ করি এবং আবশ্যক হইলে যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহা কেবল ঐ ভাষাতেই লিখি, এমন কি, সাংসারিক ও বিষয়-কর্ম্ম-সংক্রান্ত পত্র-ব্যবহারাদি পর্য্যন্ত ইংরাজীতে ভিন্ন মাতৃ-ভাষায় না করি, তাহা হইলে ইহা অস্বাভাবিক নহে যে, বাঙ্গলা ভাষায় লেখা আবশ্যক হইলে এমনই একটা উদ্ভট ভাষার প্রয়োগ হইয়া পড়িবে। ইহার নমুনা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু আপনাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে শুনাইয়াছেন; আমি তাঁহার অভিভাষণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কিছু করিলাম,—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিং স্প্রেড করিয়া সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে হুইসল্ দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" আবার এই শ্রেণীর লেখক, যাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থাদি কেবল আকণ্ঠ পান করিয়াছেন

এবং ইংরাজী ভাবে ও ইংরাজী চিন্তাপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত হইয়া প্রায় স্বদেশী ভাব ও চিন্তা-প্রণালীর দিক্ দিয়াও যাইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এমন ভাষায় বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, গ্রন্থ বিশুদ্ধ বঙ্গ-বাণীর সাহায্য লিখিত হইলেও তাহার লিখন-ভঙ্গী, ভাব-সম্পৎ, সমস্তই নিছক ইংরাজী! এই সকল গ্রন্থ সাধারণ বঙ্গ-ভাষা-ভাষীর পক্ষে দুর্বোধ্য হইবার কারণ হইতেছে, ঐ ঐ গ্রন্থে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী গ্রন্থের ভাবরাশি ইংরাজী গ্রন্থে যে প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই আক্ষরিক অনুবাদ করেন মাত্র। উহা বুঝিতে হইলে সেই সেই ভাব প্রকাশক ইংরাজি বাক্যগুলি স্মরণ না করিলে তাহার অর্থ বুঝা একপ্রকার অসম্ভব। আরও এক কারণ এই যে মনের যে ভাব আমারা প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা অনেক স্থলে দেশভেদে ও ভাষাভেদে স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আমি যদি আমাদের দেশের লোকের মানসিক ভাব প্রকাশ করিবার সময়; এই দেশে সেই ভাব যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিদেশীয় মূর্ত্তিটি গ্রহণ করি, এবং তাহার বিদেশীয় পরিচ্ছদাদির অনুবাদ মাত্র করি, তাহা হইলে, এদেশের লোকের অনেক সময়ে যে ঐ ভাবের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহা বিচিত্র নহে। এইপ্রকার লিখনপ্রণালীর প্রধান দোষ এই ঘটে যে অনেক স্থলে শব্দার্থ এবং বাক্যার্থ মোট মুটি বুঝিতে পারিলেও উহার তাৎপর্য্য যে কি, তাহা প্রায়শঃ অজানিত থাকিয়া যায়। সমস্ত বাক্যের ব্যঞ্জনা যদি অজ্ঞাতই রহিল, তাহা হইলে বাক্যার্থ যে সম্পূর্ণ বুঝিলাম, ইহা কি প্রকারে বলিব? এই ভাবের লিখন-প্রণালীর বিশেষ কোনও উদাহরণ সঙ্কলন করিব না; কারণ, অধুনা উহা এক প্রকার সর্ব্বজন বিদিত। এই দুইটী দোষই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন "বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের একটী প্রাণ-পদার্থ আছে, সেইটী বাঙ্গালির মত হইলে তবে উহা বাঙ্গলা ভাষা হইবে।" কথাটা সকলেরই বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ভাষায় প্রাণ-পদার্থটা জানিতে হইলে, দেশের লোকের প্রাণটা কি, তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য; দেশের লোকের প্রাণটা জানিতে হইলে দেশকে চেনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা নিঃসংশয়িতরূপে কি বলিতে পারি যে, আমরা আমা-

দের লোককে ঠিক চিনি? যদি ঠিক চিনিতাম, তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দশা থাকিত কি? তারপর, কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা লইয়াও বর্ত্তমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার কোনও প্রভেদ থাকা উচিত নহে। আবার অনেকের মত যে, কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী এবং সর্ব্বকালে এ প্রভেদ আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে ও করিবে। আমার বোধ হয়, এই দুই আপাততঃ বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করা বিশেষ দুরূহ নহে। যে ভাষা যত অধিক লোক বুঝে, সেই ভাষাই ভাল, এই বিষয়ে মতভেদ নাই; কিন্তু যদি এই মতটী বিনা সঙ্কোচে সর্ব্বত্র চালাইবার প্রথা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বিপদ বড় কম নহে। সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার লোকেরা বলিবেন যে, আমাদের সহরের কথোপকথনের ভাষাই সাহিত্যে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। উত্তরে ঢাকার লোকেরাও বলিবেন যে, আমাদের সহরের কথোপকথনের ভাষা তাহা হইলে কি দোষে দুষ্ট যে, আমাদের সহরের ভাষা সাহিত্যে তদ্রূপ স্থান পাইবে না? এইরূপ আত্ম-বিরোধ মিটাইবার উপায় কি। পক্ষান্তরে; যদি আবার লিখিত ভাষা হইতে কথিত ভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে যাই, তাহা হইলে ভাষার গৌরব ওজস্বিতার অভাব বা অল্পতা ঘটিয়া, ভাষা দিন দিন প্রাণহীন হইতে বসিবে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় সাধন এবং তৎপ্রতি সহায়তা করা। লৌকিক ভাষার আদিম অবস্থায় এবং উৎপত্তি-কালে, আমরা বর্ত্তমানে যাহাকে সাহিত্যের ভাষা বলি, তাহার অনুরূপ কোনও ভাষা থাকে না, থাকিবার বিশেষ কোনও কারণ থাকে না। ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটী যুগ আসে, যখন ভাষা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়া উঠে; তখন হইতে ভাষা লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের ভাষা সৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন,—
"রস মিতাইলে তাহাতে দানা বাঁধিয়া যেমন মিছরী হয়, লিপিবদ্ধ হইয়া ভাষাও যেন দানা বাঁধা গোছের হয়।" আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান সাহিত্যে এই প্রকার দানা বাঁধিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি; সুতরাং এই অবস্থায় এই দানা ভাঙ্গিয়া, পুনরায় নূতন করিয়া দানা বাঁধাইবার চেষ্টা করা কতটা সঙ্গত, তাহা বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে কি?

এতদ্ব্যতীত একই ভাষায় লিখিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-ভেদে ভাষার নানা-মূর্ত্তি হয়; তাহার প্রতি সর্ব্বাংশে উপেক্ষা প্রদর্শন চলে না। একটু পূর্ব্বে যে সমন্বয়-বিধানের কথা বলিয়াছি, ঐ সমন্বয় একস্থানে বসিয়া কমিটী করিয়া কোন প্রকার প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা সম্ভব নহে। প্রত্যেক চলিত ভাষা একটী জীবন্ত প্রবাহ-স্বরূপ। উহা নিজেই নিজের খাত প্রস্তুত করিয়া লয়। গিরিস্থিত জলপ্রপাত হইতে যেমন নদী-সকল উৎপন্ন হইয়া, উহারই সঞ্চারিত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়া নদীসমূহ বেগবান এবং গতিশীল হয় এবং একটী খাতেই প্রবাহিত হয় তদ্রূপ দেশ-ভেদে একই ভাষার নানা আকার থাকিলেও, উহারা সকলে যখন এক খাতে পতিত হয়, তখন সেই খাতে প্রবাহিত ভাষা-প্রবাহ, সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা হইয়া উঠে। উহাকেই বোধ হয়, ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার 'দানা-বাঁধা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রকার ভাষার দানা-বাঁধা একদিন ইংলণ্ডেও ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার জননী Anglo Saxon ভাষাও এককালে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। কিন্তু বিখ্যাত Alfred the Great নামক রাজার আমলে, নানা কারণে তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত মূর্ত্তিটী প্রাধান্য লাভ করিয়া Anglo Saxon নামক সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই প্রকার গঠন যে কি কি কারণে ঘটে, তাহার প্রসঙ্গ এখানে তুলিয়া আপনাদের বিরক্তি-ভাজন হইব না। উহা যে ঘটে, তাহা সত্য; সুতরাং ভাষার 'দানা-বাঁধা'র কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই আর 'দানা-বাঁধা' যদি স্বীকার করিতেই হইল, তাহা হইলে দানা ভাঙ্গার কার্য্যটাকে ভাল বলিব কি প্রকারে? সুতরাং এই বিষয়ে স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত আমার অনেকটা একমত। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,—"প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি। নিম্ন স্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিত প্রাণ আছে—তাহাদের ভাষা অসাধু বা অকুলীন বলিয়া অবহেলা না করিয়া, সংস্কৃতসম-বা-সংস্কৃতোদ্ভব ভাষায় সহিত ভূয়ঃপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ থাকিবে বা হইবে।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কি বলিয়াছেন, প্রণিধান করুন; তিনি বলেন,—"দেশের লোক যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সভ্য সভ্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের আছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই

না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আমরা যদি দেশকে ঠিক চিনিতে চেষ্টা করি, দেশের ভাবপ্রবাহ ধরিয়া দেশের মর্ম্মস্থান খুঁজিয়া পাই, প্রাচীন সাহিত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, এবং দেশের প্রাচীন বিবরণ ও কাহিনী প্রভৃতি জানিতে আমাদের প্রকৃত আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য যে আকারে গঠিত হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদের ব্যস্ততার আবশ্যকতা ঘটিবে না; ভাষা আপনা আপনিই তখন আপনার যথার্থ আকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহারা আমাদের ভাষার 'দানা-বাঁধা'র কথা স্বীকার করেন না বা যাঁহারা উহাতে কেবল কোমলশ্রদ্ধমাত্র, তাঁহাদের এই কথা ভাবিয়া বর্ত্তমান কালে টানাটানির ভাবটা কতক সংযত করিলে মন্দ হয় না।

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতে হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারিবে না, আর যদি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা কখন আত্ম-গৌরবসম্পন্ন হইবে না।" এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, বাঙ্গালা ভাষাকে ৺ইন্দ্রনাথ বাবু যে ভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ করিতে চাহেন, তাহা আদৌ সম্ভব কি না? ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, খাঁটি বাঙ্গালায় নাকি সন্ধি-সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ প্রভৃতি প্রত্যয় আদৌ নাই। ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিক সম্পূর্ণরূপে এই মত পোষণ করিতেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে তিনি যে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় "যে সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত, সেগুলি বাদ দিলে অন্য কোন অংশে সন্ধি চলে না।" এই কথা দেখিয়া আমি যে ভয় পাই নাই, বুকে হাত দিয়া শপথ করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি বোধ হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয় সংক্রান্ত নিয়মের অধীন বঙ্গ-ভাষা নহে, ইহাই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এমন শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, যাঁহাদের ধারণা যে, খাঁটি বাঙ্গালাভাষায় সন্ধি এবং সমাসের কার্য্য হয় না। এই মতটা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, প্রতি পদেই সন্ধির কার্য্য এবং সমাসের প্রয়োগ দেখিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ স্বীকার না করেন যে, বাঙ্গালায় সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত ও কৃতপ্রত্যয় আছে, তবে

তাঁহাদের সহিত তর্ক করার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। আমরা যে ভাষায় কথা কহি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিবেন যে, পাঁজন, যদ্দিন, চচ্চড়, ছোড়দা, জুতাজুতি, ছোয়াছুরি, কিলোকিলি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তাহাদের মধ্যে কি সন্ধি ও সমাসের কার্য্য স্পষ্ট নহে? দুইটী পৃথক্ ধ্বনি একত্র পাশাপাশি আসিলেই দ্রুত উচ্চারণের চেষ্টায় অনেক স্থলে নিশ্চয় উভয় ধ্বনি মিশ্রিত হইবেই; মিশ্রিত হইলেই কি ভাবে যে তাহারা মিশ্রিত হইবে, তাহা প্রধানতঃ ধ্বনি দুইটীর প্রতি আপেক্ষিক জোর (accent) দেওয়া এবং উভয় ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানের সংস্থানের উপর নির্ভর করিবে। এইটী হইল সন্ধি-সংক্রান্ত সাধারণ ও ব্যাপক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার বড় একটা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু তথাপি একটী ভাবিবার কথা আছে। ৺ ইন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বর্ণমালার অনেক অক্ষর একাকৃতি হইলেও উহার উচ্চারণ উভয় ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যেখানে ঠিক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানে ঐ ঐ শব্দের অক্ষর যদি সন্নিকৃষ্ট হয় এবং উহার উচ্চারণ উভয় ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ হয়, তখন সন্ধি প্রভৃতির কার্য্য কোন্ নিয়মানুসারে হইবে? অর্থাৎ উহা কি সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদির অনুরূপ হইবে, না, খাঁটি বাঙ্গালার সন্ধি-সূত্রানুসারে, না উভয় নিয়মের মিশ্রিত কোন নিয়মানুসারে হইবে? অন্য কথায় বলিতে গেলে প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়—ঐ প্রকার স্থলে সন্নিকৃষ্ট অক্ষরের সন্ধিক্রিয়া কি স্বাভাবিক নিয়ম মানিয়া চলিবে, না স্পষ্ট ধ্বনির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সাঙ্কেতিক ধ্বনিমাত্র কল্পনা করিয়া সন্ধিক্রিয়া সাধিত হইবে? এই কথাটা অদ্যাবধি কোনও সুধী বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এই কথাটা ভাল করিয়া জানাও বোধ হয় অনেকের ছিল না। যাহা হউক, এই বিষয়ে আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, সুতরাং ইহার সম্পর্কে কোনও মত প্রকাশ করা সম্ভব নহে—আমার পক্ষে ত স্পষ্ট ধৃষ্টতা। ইহার আলোচনা ও বিচার সুধীবর্গ করেন, ইহাই প্রার্থনা। সন্ধির পক্ষে যাহা বলিলাম, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহা খাটে। কেহ কেহ বলেন—সংস্কৃত ভাষা হইতে সন্ধি-ক্রিয়া-বিশিষ্ট এবং সমাস নিবদ্ধ শব্দই যখন গ্রহণ করিব, তখন খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল আপদ বালাই ঢুকানের দরকার কি? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথার অসারতা বুঝিতে বড় বিলম্ব

হওয়া উচিত নহে। এই সংসর্গের দিনে ভাষায় নূতন নূতন শব্দ-সৃষ্টি করা অনিবার্য্য; শব্দ সৃষ্টি করিতে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহা যদি হইল, তবে আমাদের যে সমস্ত নূতন শব্দের প্রয়োজন হইবে, তাহাই যে আমরা সংস্কৃত কোষাদি হইতে সন্ধি ও সমাস-নিষ্পন্নভাবে পাইব, ইহার নিশ্চয়তা কি? সে নিশ্চয়তার বোধ হয়, অত্যন্তাভাব ঘটিবে। আমাদিগকে সংস্কৃত শব্দটাকে মূল করিয়া অনেক সময়ে গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে। গড়া-পেটার কাজটা যেন কতকাংশে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে হইতে পারে; কিন্তু অনেক স্থলে এমন অনেক কথা রচনা করিতে হইবে, যাহার জন্য সংস্কৃত ভাষার নিয়মাবলী জানা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ফলে, খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী একেবারে বিসর্জ্জন দিলে, কিম্বা উভয় ব্যাকরণের মধ্যে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর উঠাইলে, লেখকগণের যে কি মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া ত আমি আকুল হইয়া পড়ি। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান মতটা সত্যের বিশেষ প্রকারে অতিশয় অতিরঞ্জন (exaggeration) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ হইতে খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ পৃথক্ আছে ও থাকিবে, এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য উহা পৃথক্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহা বলিয়া যে খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই প্রকার মত কখনই প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধু ভাষা এবং গ্রাম্যভাষা, এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে কোন্ ভাষা চলা উচিত, এই প্রসঙ্গে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে মধ্য পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তাহাই বোধ হয়, শ্রেয়ঃ পথ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্ব্বাসন ঘটাইলে, বাঙ্গালা ভাষার লেখক-দিগের কত যে সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিতে হইবে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয় এবং এত মুখস্থ করা সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। যখন দেখিতেছি যে, গোটাকতক (অন্ততঃ ব্যবহর্ত্তব্য শব্দসমূহের তুলনায় নিতান্ত অল্প) সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র জানা থাকিলে ঐ কার্য্য সহজে সুসাধিত হইতে পারে, তখন এতটা মুখস্থ করার চাপ কেন বহন করিতে যাইব?

আর এক কথা বলিয়াই এই অভিভাষণের উপসংহার করিব। আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করার উদ্দেশ্যে আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলিয়া, আমাদের দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি, তাহা বোধ হয় একটু বিস্তারিতরূপেই বলিয়াছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য সাধন সম্পর্কে কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় এবং আশু কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। ভাষার ভাব-সম্পৎ এবং জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে এবং যাহার দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ নানা বিদ্যা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা; দেশীয় প্রাচীন কাহিনী ও প্রাচীন সাহিত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা ও প্রচার করা ইত্যাদি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ, উপযুক্ত লোকের প্রতি বিষয়-ভেদে ভার দিবার ব্যবস্থা আপনারা করুন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎই আপনাদের একপ্রকার কার্য্যকরী (Executive) সমিতি ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে; তাহার উপর কাজের ভার দিন, এবং কতদূর কার্য্য পরিষৎ করে, তাহার হিসাব নিকাশ বর্ষে বর্ষে বুঝিয়া লউন। শুধু মুখে মুখে ভার দিলে এই প্রকার কার্য্য হইবার নহে—ইহার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন; ইহার জন্য শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অনেক সময়ে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন; ইহার জন্য দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগের প্রেরণা আমাদের মধ্যে উৎপন্ন না হইলে এবং প্রবৃত্তি ঐ দিকে জাগিয়া না উঠিলে কিছুই হইবে না। ইহার জন্য আপনারা সকলে সমবেত চেষ্টা করুন। আমার বলা বাহুল্য, আপনারা সকলেই জানেন যে, জাতীয় ভাষা—আমাদের মাতৃভাষা—সমৃদ্ধ না হইলে জাতীয় উন্নতি বা আমাদের উন্নতি হইতেই পারে না: যাঁহারা করিতে যান, তাঁহারা মোহান্ধ। তাঁহাদের কার্য্য ব্যর্থ হইবেই। অতএব সকলে আসুন, একমত ও একপ্রাণ হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করি। অনেক সময় আপনাদের নষ্ট করিয়াছি,—আমার কর্কশ বাক্যে আপনাদের সকলকেই বিরক্তি করিয়াছি,—ভরসা করি, আমার তজ্জনিত ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

আমার এই সকল বাক্যে আপনারা যদি আকৃষ্ট না হয়েন, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আপনাদিগকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই। সর্ব্বোপরি আছে,—আমাদের সেই পূত মন্ত্র "বন্দে মাতরম্।"

আসুন, সকলে একবাক্যে পূর্ণ ভক্তি সহকার বলি "জয় বঙ্গবাণীর জয়।"

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
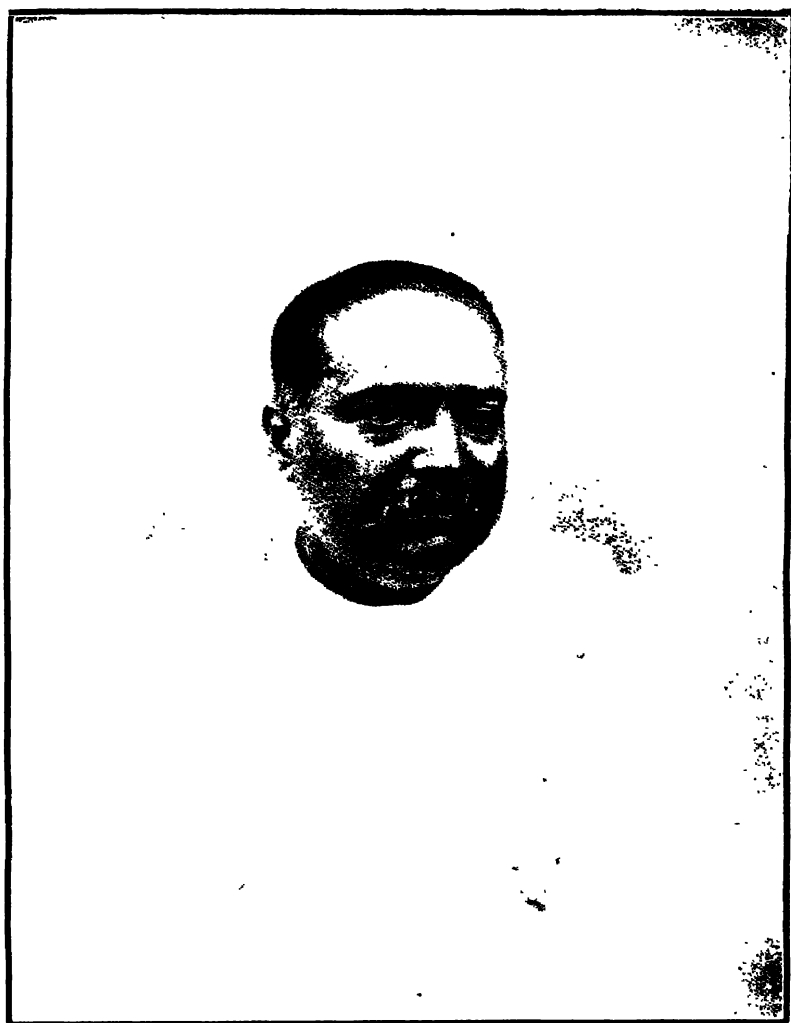
সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন।

সাহিত্য শাখার

সভাপতির অভিভাষণ

"যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা!
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভি র্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্ পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

সর্ব্বাগ্রে এই সম্মিলন-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে শরণ লইয়া কার্য্যারম্ভ করি। তাহার পর, আপনারা এই অভাজনকে বর্ত্তমান ত্রয়োদশ সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির উচ্চ আসন প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, আমার যৎসামান্য সাহিত্যচর্চ্চার আশাতিরিক্ত পুরস্কার বিধান করিয়াছেন, এই অযাচিত অচিন্তিত সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পত্রে যখন নির্ব্বাচন সংবাদ পাইয়াছিলাম, তখন এই সম্মান লাভে একটা আত্মতৃপ্তি, একটা গৌরব অনুভব করি নাই, একথা বলিলে সাধারণ মানবমনের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা গোপন করা হয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অযোগ্যতা-স্মরণে—বিশেষতঃ পূর্ব্বগামী বিরাট পুরুষগণের সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া, লজ্জাভয়জনিত অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, একথা না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহা মামুলি বিনয়ের বাঁধা বুলি নহে,—হৃদয়ের অন্তস্তলে যাহা অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাই অকপটচিত্তে প্রকাশ করিতেছি।

পরন্তু; নানা কারণে বিষাদ-কালিমা আমার সমগ্র হৃদয় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। যে উৎসাহে, যে উদ্যমে, যে স্ফূর্ত্তিতে, যে আনন্দে, বহরমপুর, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে 'গবেষণার নিমন্ত্রণ' গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সভাসমক্ষে চটুল রচনা উপস্থাপিত করিয়া বাচালতার পরিচয় দিয়াছিলাম, সে উৎসাহ, সে উদ্যম,

সে স্ফূর্ত্তি সে আনন্দ নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক জগতে যে মহাশোকে নিমজ্জিত হইয়াছি, সাধারণের সমক্ষে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণ-যবনিকা উত্তোলন করিবার অধিকার আমার নাই; কিন্তু সাহিত্য-জগতেও এই কয়েক বৎসরে যে সব বিয়োগদুঃখ অনুভব করিয়াছি, সে সকলের জন্যও হৃদয় ভারাক্রান্ত। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রসঙ্গ উঠিলেই ঋষিকল্প মনীষী, ধীর অথচ উৎসাহশীল, কোমলহৃদয় অথচ দৃঢ়প্রকৃতি, প্রিয়ভাষী অথচ সত্যসন্ধ, সাহিত্য-পরিষদের তথা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ-স্বরূপ, রামেন্দ্রসুন্দরের অকালমৃত্যুজনিত শোক নবীভূত হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী অক্লান্তকর্ম্মা পরিষদ্‌গতপ্রাণ ব্যোমকেশের স্মৃতিও উজ্জীবিত হয়। এই কর্ম্মিযুগল সাহিত্য-পরিষদ তথা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে কিরূপ তদ্গতচিত্তে সময় ও শক্তিনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলীর কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং তাহার বাহুল্য-বর্ণনা করিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গসুখলাভ করিয়া কি উৎসাহে, কি স্ফূর্ত্তিতে, কি আনন্দে সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে দূরদেশে যাত্রা করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধুর সংসর্গে কি ভাবে পথের কষ্ট ও প্রবাসের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে, আজকার দিনে সেই কথাই কেবল মনে পড়িতেছে।

সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে শুধু যে এই দুই জনের অভাবই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি তাহা নহে; গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সব সাহিত্য-সেবকের তিরোধান হইয়াছে, তাঁহাদিগের অভাবও এই আনন্দময় সম্মিলনের উপর বিষাদের ছায়াপাত করিতেছে। ভাগলপুরে তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি এবং সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বিদ্যাপতি-পদাবলীর প্রথম বাঙ্গালা সঙ্কলয়িতা ও সম্পাদক, সুধী ও সুবিচারক ৺সারদাচরণ মিত্র; চট্টগ্রামে ষষ্ঠ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার; যশোহরে নবম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি বিদ্বৎপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ; বিদ্যাব্রহ্মণ্যবিভূষিত ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর; 'জ্ঞান ও কর্ম্মে'র ব্যখাতা পূতচরিত্র স্যর ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ধর্ম্মসাধনা ও সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধকাম পণ্ডিত

৺শিবনাথ শাস্ত্রী; 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও তাঁহার অকালে জীবন-বৃন্তচ্যুত পুত্র ৺প্রভাতকুসুম; 'সুরভী ও পতাকা' এবং 'নবপ্রভা'র সম্পাদক ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়; 'সাহিত্য'-সম্পাদক, সুলেখক ও সদ্‌বক্তা ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি; 'ইংরাজের জয়,' 'শকুন্তলারহস্য,' ও 'বিদ্যাসাগরচরিত'-প্রণেতা গীত-রচয়িতা 'বঙ্গবাসী'র ৺বিহারীলাল সরকার রায় সাহেব; সূক্ষ্মদর্শী নবীন সমালোচক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; 'নব্যভারত' ও 'ভারতবর্ষে'র লেখক, আমার পুরাতন ছাত্র ও অধুনাতন মিত্র ৺রসিকলাল রায়; 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-প্রণেতা ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ; গীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-প্রণেতা ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু; 'অনাথ বালকে'র স্রষ্টা ৺চন্দ্রশেখর কর; 'ভূপ্রদক্ষিণ'-কারী ৺চন্দ্রশেখর সেন; প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর; সুকবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতির স্মৃতি এই উপলক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। ইঁহারা সকলেই যে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া সভামণ্ডলীর উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তথাপি এমন দিনে তাঁহাদিগকে ভোলা যায় না। তাঁহাদিগের অভাবে যে 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্রা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শূন্য স্থান যে শীঘ্র ও সহজে পূর্ণ হইবার নহে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আবার আজ এক মাস হইল 'তপোবনে'র যুবক-কবি ৺জীবেন্দ্রকুমার দত্তের অকালে জীবনান্ত হইয়াছে। এ সংবাদে সভাস্থ সকলেই কাতর হইয়াছেন সন্দেহ নাই। জীবেন্দ্রকুমারের বীণার ঝঙ্কার এখনও অনেকের কর্ণে বাজিতেছে; বিশেষতঃ সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে তাঁহার 'আমন্ত্রণ', 'বাণী প্রশস্তি', 'মাঙ্গলিক', 'শ্রদ্ধাহোম' প্রভৃতি আবেগ-পূর্ণ কবিতা আমাদিগের মধ্যে অনেকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে!

ইহা ছাড়া, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হৃদয় আরও গভীর অবসাদে মুহ্যমান। সাহিত্যের আসরে জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। এইরূপ নানাকারণ-জনিত ঘনঘোর বিষাদ-অবসাদের অন্ধতমসায় সভাপতির কর্ত্তব্যসাধনে আহূত হইয়া কবির কথায় না বলিয়া থাকিতে পারি না,—

"এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা?
* * * * *
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
এ যে বুককাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।

এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙ্গালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি?
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা?"

তথাপি দেশের এই দুর্দ্দিনে, এতগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন, প্রাণের বাঁধন ও প্রাণের বেদনের টানে মায়ের ডাকে সকলে একত্র মিলিত হইয়াছেন, অনেক দিন পরে আমরা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার, সৌহার্দ্দ সূত্রে সংবদ্ধ হইবার, শুভসুযোগ পাইয়াছি, ইহাতে কৃতার্থতাবোধ না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু বিষাদভারাক্রান্ত মন লইয়া এরূপ বিদ্বজ্জন-সমাগমে তাঁহাদিগের শ্রবণযোগ্য প্রবন্ধ প্রকটন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। পূর্ব্বগামী প্রথিতযশাঃ সভাপতিগণের, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এই সুপণ্ডিত-গণের গভীর জ্ঞান-গবেষণা, দেশজননী ও ভাষাজননীর সাত্ত্বিক সাধক সন্তান, 'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি, দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের অপূর্ব্ব ভাব ও ভাষা-সম্পৎ, কোথায় পাইব? যাঁহার উৎসাহ-বাক্য ও বুদ্ধি পরামর্শে সাহিত্য সাধনায় প্রণোদিত হইতাম, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে যাঁহাকে না শুনাইলে ভরসা পাইতাম না, যাঁহার পরিতোষ না হইলে আত্মপ্রত্যয় জন্মিত না, আমার সেই 'guide, philosopher and friend' রামেন্দ্রসুন্দরও নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বাপর একটা রীতি আছে যে সভাপতিকে 'অভিভাষণ' পাঠ করিতে হয়, সেই রীতির অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। বিশেষ কোনও

নূতন কথা বলিতে পারিব না, যাহা বলিব তাহাও সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া বলিতে পারিব না। একে ত শক্তির অভাব, তাহাতে আবার অনন্তকর্ম্মা হইয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় ও সুবিধা পাই নাই। শারীরিক অপটুতাও সুষ্ঠুভাবে কার্য্য-নিষ্পাদনের অন্তরায় হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা পারি, তাহাই গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। সুধীবর্গ আমার বক্তব্য বিষয়ের অনুমোদন করিবেন কিনা জানি না। তথাপি যে কথাটি বহুদিন হইতে হৃদয়-মন আলোড়িত করিতেছে, প্রাণের ভিতর অহরহ অনুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিব। যোল বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাতে যে কথা ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলাম, এখন আবার দেশের পূর্ণ-জাগরণের দিনে সেই কথা নূতন করিয়া নাড়া পাইয়া সাড়া দিতেছে; এই শুভ অবসরে তাহা সাহিত্য-সম্মিলনের সমক্ষে প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বক্তব্য দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বহু সুলেখক সম্মিলনে পাঠের জন্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি শ্রবণ করিবার সুখ হইতে আপনাদিগকে অনেক ক্ষণের জন্য বঞ্চিত করিতেছি। এ জন্য প্রবন্ধ-রচয়িতা ও শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। তবে আপনারা মনে রাখিবেন যে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনের জন্য আপনারাই দায়ী। এখন আপনাদের কৃত কার্য্যের ফলভোগরূপ বিড়ম্বনা অনিবার্য্য।

সমস্ত কর্ম্মজীবন—সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল—শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, যতদিন কর্ম্মক্ষম থাকিব ততদিন এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; সুতরাং যদি এই আসরেও শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় বিস্মিত বা বিরক্ত হইবেন না। এরূপ 'talking shop' অর্থাৎ জাতব্যবসার কথা জাহির করা এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্য্যন্ত আপনারা যদি কথাগুলি ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করেন, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মিলনে শিক্ষার কথা উত্থাপন করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের এই নবজাগরণের দিনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন এবং বিদেশী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদেশী

বিদ্যার বিস্তারের জন্য স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র হইতে পারে না একথা স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালী জাতীয় জীবন-গঠনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, প্রত্যুত ঘোরতর অনঙ্গল সাধন করিয়াছে, এইজন্য ইহার ও ইহার সংসৃষ্ট স্কুল-কলেজের বিলোপ-সাধন অবিলম্বে কর্ত্তব্য—এরূপ অভিমতও প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে এই 'চরম' অভিমতটির কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া পরে মূল কথার আলোচনা করিব।

বিদেশী শিক্ষার গুণ।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনে আমাদের অন্ততঃ তিনটি উপকার হইয়াছে। প্রথমতঃ, আজ যে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে, শুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ঐক্য-বন্ধন ও দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, ইহা ইংরেজী সাহিত্য ও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-পাঠের ফল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি, নব্যন্যায় প্রভৃতির চর্চ্চা করিলে স্বজাতীয় জ্ঞানানুশীলন অব্যাহতভাবে চলিত বটে; কিন্তু সেক্স্‌পীয়ার, মিল্টন, বার্ক, শেরিডান, স্কট, বায়রন, মিল, মেকলের রচনাপাঠে যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও দেশহিতৈষণা জাগিয়াছে তাহার উদ্ভব হইত কিনা সন্দেহ। জানি, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। কিন্তু বার্ক বায়রন প্রভৃতির ওজস্বিনী বাণীই এই শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই কি? বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আমরা নিজের অনেক অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছি বটে (সে কথা পরে বলিব), কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই বিদেশীয় জ্ঞানের প্রবল ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়া নিজের জিনিশ খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি, নিজের অভাব-ত্রুটী, নিজের অবনতি-অবমাননা তীব্রভাবে অনুভব করিতে শিখিয়াছি, ইহা অস্বীকার করিলে ঘোরতর কৃতঘ্নতা হয়। এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষা যেমন একদিকে মনের গোলামি (slave-mentality) আনয়ন করিয়াছে, তেমনি অপর দিকে জাতীয়ভাবোধ (national selfconsciousness) উৎপাদন করিয়াছে মনে রাখিবেন 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র এই শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। মহাত্মা

৺রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তান না হইলেও এই বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষার সুপক্ক ফল।

সেইজন্যই যখন গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল কলেজ ধ্বংস করিবার চেষ্টা প্রকট হইয়াছিল, তখন তাহাতে সায় দিতে পারি নাই—রুটি মারা যাইবার আশঙ্কায় নহে, মনের গোলামির প্রভাবেও নহে, অন্ধ বিদেশী সাহিত্যপ্রীতির খাতিরেও নহে। যত দিন জাতীয় শিক্ষার একটা প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা (scheme) খাড়া না হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় মাল মসলা সংগৃহীত ও সুসজ্জিত না হইতেছে (সে কথা পরে বলিব) ততদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রণালীর সংহার করিলে বিষম ভ্রম হইবে। ততদিন এই ইংরেজী সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই দেশাত্ম-বোধ উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় ইংরেজী রাজাসনচ্যুত হইলেও একবারে বর্জ্জনীয় নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, জড়বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রসাদাৎ সে সমস্ত একপ্রকার বিনাআয়াসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। নিজেদের প্রযত্নে এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে আমাদের কত শতাব্দী লাগিত কে জানে? এটা আমাদের কম লাভ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বুঝাইয়াছেন,—'ইংরেজ বাহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।' (৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহার ফলে আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শুধু কৃতী ও বিচক্ষণ ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পাইয়াছি তাহা নহে, ইউরোপীয় জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া সেই ভিত্তির উপর নব নব মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে ইউরোপীয় জাতিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র—প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এমন বৈজ্ঞানিকও পাইয়াছি! অতএব এই বিদেশজাত বিজ্ঞান বর্জ্জনীয় নহে, সাদরে গ্রহণীয়।

তৃতীয়তঃ, এই শিক্ষার ফলে ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশভাষায় একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী এবং তাহার মারফত ফরাসী

জার্ম্মান ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের স্বাদ পাইয়া, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা অভিনব ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আমাদের সাহিত্যের Renaissance অর্থাৎ নব-জীবন-লাভ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যগণও আদর করিয়া আমাদের এই নূতন সাহিত্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, ইহার রস গ্রহণ করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইউরোপ-জয়বার্ত্তা আর আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে এই সাহিত্যের কোনও কোনও অংশ বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এই সাহিত্য যে পরম উপাদেয় বস্তু এবং ইহাতে যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও নূতনত্ব আছে, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব আছে, তদ্বিষয়ে অন্য মত থাকা উচিত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি যে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্কিম-ভূদেব-চন্দ্রনাথ-পূর্ণচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনা, 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'নীলদর্পণ' 'জিজ্ঞাসা,' প্রভৃতি যে নকলনবিশী সাহিত্য, বা বিকৃত বিজাতীয় বিদেশীয় আদর্শে রচিত, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। দেশে জ্ঞানপ্রচারের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য, যে সকল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলিও এই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সুফল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশীয় প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, পারসী,) ও প্রচলিত মাতৃভাষা একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুতরাং বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ষোল আনা অমঙ্গল সংসাধিত হয় নাই। অল্পমাত্রায়ও দেশীয় ভাষার প্রচলন থাকাতে মেকলে যে 'a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect' বানাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই। এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও মাতৃভাষার কতকটা জ্ঞান লাভ করার জন্যই এরূপ একটা নূতন সাহিত্য গঠন সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিদেশী শিক্ষার দোষ।

তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিব, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আমলে বি এ পরীক্ষার পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কয়েক বৎসর পরেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্থানচ্যুত করে। অনেকদিন হইতে সর্ব্বনিম্ন পরীক্ষায় ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গলা রচনার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার (সাহিত্যের নহে) সামান্য একটু স্থান হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের অনেক চেষ্টায় উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় রচনার স্থান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপরি পাশ-ফেল নির্ভর করিত না। তাহার পর, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হইল, তখন শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় নহে, আই এ, আই এস সি ও বি এ পরীক্ষায়ও ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গালায় রচনার পরীক্ষার প্রচলন হইল, ইহাতে পাশ না হইলে সমগ্র পরীক্ষায় পাশ হইবার যো নাই; নিম্নতম পরীক্ষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের, পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে, মাতৃভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থাও হইল। (পরে ভূগোল ও স্বাস্থ্যরক্ষা এই দুইটা বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে।) মনে রাখিতে হইবে, এই সকল পরীক্ষায় বাঙ্গলায় শুধু অনুবাদ ও রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য পরীক্ষার বিষয় হয় নাই; এবং রাজভাষায় (এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ পরীক্ষায়) কোনও পরীক্ষায় দুইখানি, কোনও পরীক্ষায় তিনখানি প্রশ্নপত্র, আর মাতৃভাষায় শুধু একখানি! ইহাতেই বুঝা যায় মাতৃভাষার স্থান কত সঙ্কীর্ণ; আবার সকল বিষয়েই ও সকল পরীক্ষাতেই মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই, শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় দুই একটি বিষয়ে ইচ্ছাধীন। সে দুই একটি বিষয় সকল ছাত্রের অবশ্য-গ্রহণীয়ও নহে। সম্প্রতি এম্ এ পরীক্ষায়, ইংরেজী ভাষার ন্যায়, দেশভাষার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্ব আর একটি পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (যদিও শেষোক্তটির বেলায় শিক্ষা ও পরীক্ষা ইংরেজী ভাষায়ই হইবে!)

কিন্তু ইহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? 'রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষার আলোচনার অধিকার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থায় পাইয়াছি, 'শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে'—ইহাই কি যথেষ্ট? চৌষট্টি রকম বিদেশী বিদ্যার ভিড়ের মধ্যে দেশ ভাষা ও সাহিত্যের, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্বের, মাথা গুঁজিবার মত একটু একটু স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিদায়ক্ষণে—অন্তিমকালে হরিনামের ন্যায়—মুষ্টিমেয় ছাত্রকে ভারতের বাণী শুনান হইবে, এই ব্যবস্থায় জাতীয় গৌরবে উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। পত্রের পশ্চাতে 'পুনশ্চ'র ন্যায় উইলের পশ্চাতে কডিসিলের ন্যায়, বিদেশীয় বিদ্যার লম্বা ফিরিস্তির পশ্চাতে দুই একটা জাতীয় বিদ্যা গুঁজিয়া দিলেই কি বিশ্ববিদ্যালয় 'জাতীয়' হইয়া দাঁড়াইল? জানি, অনেক ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ' অংশে বা 'কডিসিল' অংশে দরকারী কথা থাকে। কিন্তু তথাপি তাহাকে মূল দলিল বলা যায় না। বিদেশী বিদ্যার চূড়ায় উপর স্বদেশী বিদ্যার একটু ময়ূরপাখা চড়াইলেই মোহিত হইবার, ভক্তিরসে আপ্লুত হইবার, বিশেষ কিছুই নাই। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বড় আক্ষেপেই বলিয়াছেন, 'সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটি কোণায় তাহাকে একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র'। বাস্তবিক, ইহা মুষ্টিভিক্ষা-মাত্র, ন্যায্য প্রাপ্যের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। এইটুকু রফায় কৃতার্থ হইলে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বসিত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতার উল্লসিত হইলে, জাতীয়তার, দেশাত্মবোধের, জননী বঙ্গভাষা ও জননী জন্মভূমির অবমাননা করা হয়।

কেহ কেহ আবার ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত যুক্তির অবতারণা করেন—যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আমাদেরই দেশীয় একজন রাজপুরুষ, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার দপ্তর আমাদেরই দেশীয় শিক্ষা-সচিবের হস্তে ন্যস্ত, অতএব এই বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এরূপ স্তোকবাক্যে আসল কথা ভুলিয়ে চলিবে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে একটা জাতি অপর একটা জাতির অধীন হইলে তাহাকে পরাধীন জাতি বলে। কিন্তু যদি একটা জাতির স্ত্রী-পুরুষে শিক্ষার নামে বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য, বিদেশীয় ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিদেশীয়

অর্থনীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র (law) বিদেশীয় রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব, বিদেশীয় ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র, বিদেশীয় গণিত ও বিজ্ঞান, বিদেশীয় ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও কৃষিবিজ্ঞান, বিদেশীয় শিল্প ও কলা, বিদেশীয় ভাষার অনুপান-সাহায্যে গলাধঃকরণ করিতে থাকে, এবং নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনটা পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া যায় না কি? এরূপ শিক্ষার যে বনিয়াদেই গলদ, মনের গোলামি (Slave-mentality) যে এরূপ শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় পরিণাম, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? শেক্স্পীয়ারের একখানি নাটকে দ্বিতীয় রিচার্ডের রাণী শত্রুকর্তৃক ধর্ষিত স্বামীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন—

"What ! is my Richard both in shape and mind
Transform'd and weakened ? Hath Bolingbroke
Depos'd thine intellect ? Hath he been in thy heart ?"

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও কি ঠিক সেই দশা নহে? এই যে উদাহরণ দিতেও বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইল, এ মাঝে মাঝে আভাঙ্গা বিদেশীয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা slave mentalityর কুৎসিততর নিদর্শন আর কি আছে?

৭ম (কলিকাতা) সাহিত্য সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী একটি আত্ম-বিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্বগৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।" এই আত্মবিস্মৃতির জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দায়ী। আমরা নিজের জাতির অতীতসম্বন্ধে বিরাট অজ্ঞতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রজীবনে নবপ্রচারিত 'বঙ্গবাসী'তে আমার তখনকার শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা শিক্ষক ও লেখক ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম,—"ভারতবাসী, তুমি কামস্কট্কার ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিতে পার, কিন্তু কৌশাম্বী বা রাজগৃহ কোথায় ছিল তাহা তুমি বলিতে পার না।" কথা কয়টি আজও ভুলিতে পারি নাই। আমার মত বোধ হয় আরও অনেকের জ্ঞান এইরূপ 'একপেশে'। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস

আমাদের নখদর্পণে, কিন্তু ভারতবর্ষে কখনও 'মাৎস্যন্যায়' প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি দূরে থাকুক, প্রশ্নটা বুঝিবার শক্তিও অধিকাংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর নাই। এইখানেই আসল গলদ।

প্রচলিত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া আমরা নিম্নশ্রেণীতে মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সময়েও বিদেশীয় সাহিত্য-পুস্তকের অনুবাদ বা অনুকরণে রচিত পাঠ্য পুস্তক পড়িতে বাধ্য হই, সেগুলি বিদেশীয় দৃষ্টান্তে ও বিলাতী ভাবে পরিপূর্ণ। চরিত্রের আদর্শ, সদ্‌গুণাবলীর নিদর্শন, সবই বিদেশীয় ইতিহাস হইতে, সংগৃহীত। অবশ্য, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্বদেশ বিদেশ যেখানেই পাইব সেখান হইতেই সঙ্কলন করা উচিত বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় স্বদেশের দৃষ্টান্তের সংবাদ না লইয়া বিদেশের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়। প্রভুভক্তি শিখিতে আমরা বীরবরের উপাখ্যান বা ধাত্রী পান্নার কার্য্য উপেক্ষা করিয়া কার্পেথিয়ান পর্ব্বতে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাই। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ' যে দেশের শাস্ত্রবাক্য, সে দেশে অতিথি-সৎকারের দৃষ্টান্ত না খুঁজিয়া আফ্রিকায় ভ্রমণকালে কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংগ্রহ করি,মা স্নেহ বুঝিতে 'আগমনী' ও বিজয়া'র গান এবং বৈষ্ণব কবিদিগের বাৎসল্যরসের পদাবলি ফেলিয়া কূপারের কবিতায় শরণ লই ইত্যাদি! ইহার ফলে আমরা স্বদেশীয় আদর্শ চরিত্রের পরিচয় পাই না এবং শৈশব হইতেই বিদেশীয় উপর ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে। রামায়ণ মহাভারতের পরিবর্ত্তে গ্রীস ও রোমের পুরাণ-কথা (Legends of Greece and Rome) ও বাইবেলের দৃষ্টান্ত আমাদিগের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের পরিবর্ত্তে, অন্ততঃ তৎপাঠের পূর্ব্বে ইশপের কথামালা ইংরেজিতে বা বাঙ্গালায় আমাদের পরিজ্ঞাত হয়। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা cultural conquest, বিদেশীয় সভ্যতা কর্ত্তৃক দেশীয় সভ্যতার পরাভব; রাজনীতিক পরাধীনতা অপেক্ষাও ইহা বিষম।

তাহার পর একটু উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বিদেশীয় সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ভাষাতত্ত্ব, কাব্যকলা, নাট্যকলা প্রভৃতি শিখিতে হয়। এবং বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া বিদেশীয় গণিত ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি অর্থশাস্ত্র

দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হয়। বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করা যে কতদূর কঠিন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা আর নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি? আশা করি, সকলেই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের,' 'শিক্ষার বাহন', প্রভৃতি সুচিন্তিত সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। এমন কি প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কঠিন বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া হয় কিনা তদ্বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। অধিকাংশ স্থলেই ইহা মুখস্থ বিদ্যায় দাঁড়ায়। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র স্বাভাবিক প্রতিভা প্রভাবে বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে, ফলতঃ তাহারা সাধারণ বিধির অন্তর্ভুক্ত নহে, বর্জ্জিত বিধির অন্তর্ভুক্ত।

তাহার পর অশেষবিধ বিদেশী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে করিতে আমাদের ধারণা জন্মিয়া যায় যে সকল বিষয়েরই উচ্চজ্ঞান বিদেশীয় একচেটিয়া, আমাদের নিজের জাতির ভাণ্ডারে এ সকল কিছুই নাই প্রধানতঃ যাঁহার কলমের জোরে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই মেকলে সাহেব দারুণ অবজ্ঞাভরে বলিয়াছেন, "A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India & Arabia"! আমাদের বিদেশী গুরুগোষ্ঠি আমাদের কর্ণে এই মন্ত্র দিয়াছেন যে, উচ্চ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষ কিছুই ছিল না, আর সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা অপর প্রাচীন জাতি সকলের নিকট হইতে ধার করা। হিন্দুর জ্যোতিষ নাট্যকলা স্থাপত্য গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত, হিন্দুর অক্ষর-লিখন ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত ইত্যাদি। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, ইত্যাদি অনেক কথাই শুনা যায়। বিদেশীয় ও (বিদেশীয় চেলা কোনও কোনও স্বদেশীয়) মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমরা নিজের জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি, আমাদের হৃদয়ে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে আমাদের গৌরব করিবার মত নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই ছিল না— থাকিবার মধ্যে ছিল রাশীকৃত আদিরসের কবিতা, পুতুলপূজার মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজকে নাগপাশে বন্ধনের জন্য অশেষ বিশেষ বিধিব্যবস্থা, নব্যন্যায়ের কচকচি আর জাতীয় জড়তার আকর মায়াবাদ!! মেকলে সাহেব রায় দিয়াছেন, I doubt whether the Sanscrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors!"

অথচ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবাসী শূন্য খরিদদার একথা কোন ভীল সাঁওতালদিগের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ইহা কখনই সত্য নহে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে যে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, ইহা ত অবিসংবাদী সত্য; কিন্তু আমাদের নিজস্ব সেই জ্ঞান-সম্পৎ কি ইন্‌টারমিডিয়েট বা সাধারণ বি এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়? জ্ঞানের এই বিভাগে যে ভারতবর্ষের একটা অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আছে, একথা কি উল্লিখিত ছাত্রবর্গ কখনও জানিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের উক্ত ('stupendous anomaly') উৎকট অব্যবস্থার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয় রাজপুরুষ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্‌টার, লর্ড রোনাল্ডসে, চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তথাপি ছাত্রবর্গ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিয়া গেল। এ অবস্থায়ও কি বলিতে হইবে ইহাই প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়?

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনাদিগকে কোনও নূতন কথা শুনাইতেছি না। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর এই গোড়ায় গলদের কথা, শুধু আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেন, বিদেশীয় মনস্বী স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্, স্যর জন্ উড্‌রফ্ প্রভৃতি অনেকে অনেকবার বলিয়াছেন। আমি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি; তবে শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল অনবরত বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনা করিয়া কর্ম্মজীবনের ব্যর্থতা-অনুভবে একটা আত্মধিক্কার জন্মিয়াছে, সেই কারণে আমার মন্তব্যগুলিতে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্রতা ও তিক্ততা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। যে সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল, অর্থকরী বিদ্যা বলিয়াও বটে, রাজার জাতির জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধার জন্যও বটে, এবং জ্ঞানতৃষ্ণা-নিবারণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃও বটে, দেশের লোকের এ দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইয়াছিল। ইহার ফলে আমরা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রভৃতি অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে পাইয়াছি। (যাঁহারা খাস বিলাতে

শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নামের এখানে উল্লেখ করিলাম না।) সুতরাং এই শিক্ষা যে একেবারে নিষ্ফল (failure) হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু, ইঁহারা যে জাতির বংশধর, জ্ঞানচর্চা সেই জাতির মজ্জাগত ছিল বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে। ইহা উর্ব্বর ক্ষেত্রের গুণে, বীজের গুণে নহে; মাটির গুণে, আঁঠীর গুণে নহে। 'চৌয়াক বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ। ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তু র্গুণমপেক্ষতে॥'

যাহা হউক, এক্ষণে এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার স্থানে দেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশময় একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু উন্নতি করিয়াছে, বিস্তর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে; সে সমস্ত এখন আর তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, সমস্ত জগতের সম্পত্তি। তাহা আত্মসাৎ করিবার শক্তি ও অধিকার সকল জাতির আছে। সুতরাং আমাদিগকেও সে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই সে দিকে ঝুঁকিলে চলিবে না। আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে, জাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করিতে হইবে, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহা শিক্ষার্থীদিগকে জানাইতে হইবে, আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উজ্জীবিত করিতে হইবে, আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় 'মাকে চিনিতে হইবে,' তাহার পর সেই বনিয়াদের উপর বিদেশীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া শিক্ষাসৌধের উচ্চতা ও পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞানের জাতিবিচার করিতে নাই। যে জাতির, যে দেশের কাছ হইতেই আসুক না কেন, জ্ঞানমাত্রই অর্জ্জনের, শ্রদ্ধার সহিত বরণের যোগ্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যবন অর্থাৎ গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সঙ্কীর্ণতা জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়। কথাটা খুব উদার, খুব সমদর্শিতাপূর্ণ, খুব শ্রুতি-সুখদ। কিন্তু উদারচিত্তে বিশ্বভারতী কর্ণগোচর ও হৃদ্‌গত করিবার পূর্ব্বে ভারতের নিজস্ব ভারতী কর্ণগোচর ও হৃদ্‌গত করিবার প্রয়োজন।

'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুল্‌তে হ'বে,' আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবির এই 'অন্তরের কামনা'য় আমরাও সায় দিই। কিন্তু তাঁহারই কথায় বলি, 'পরস্পরের ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়।' আমরা যে নিজের জাতির বিশিষ্টতা হারাইয়া ভিন্ন জাতির শিক্ষাদীক্ষার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অশোভন নহে ? আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর জন্ উড্‌রফের ভাষায় বলিব,—"To assimilate, one must first be a strong free personality.....When the Indian Spirit has regained cultural freedom, by study and apprecia-tion of its own inherited ancient and grand culture, and by the casting away of all unassimilated foreign borrowings, it may go where it will." অথবা বিদেশীর দোহাই-ই বা দিব কেন ? আমাদের চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন—'পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।...বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

বড় আশার কথা, চিত্তরঞ্জনের এই মহতী বাণী আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধারের কর্ণে পশিয়াছে। এই সেদিন কনভোকেশান-উপলক্ষে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—'India was, and is civilised. Western civilisation, however valuable as factor in the progress of mankind, should not supersede, much less be permitted to destroy, the vital elements of our civilisation." বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের (ঢাকায়) একাদশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক খ্যাতনামা ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথের কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—"Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the Univer-sity traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself

to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish *a real University in India.*" আমাদের দেশে এরূপ শক্তিধর পুরুষ সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গোড়ায় গলদ বুঝিয়াছেন, তখন কি আশা করিতে পারি না যে তিনি ইহার আমূল সংস্কার করিয়া প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন? তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে করিলে হেলায় এ কার্য্যসাধন করিতে পারেন। জানি না, কবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে! আমরা প্রথম জীবনে বিদেশী ধাত্রীর স্তন্যপানে সম্বর্দ্ধিত হইয়াও প্রৌঢ়াবস্থায় প্রকৃত জননীর দর্শন পাইয়া জীবন সার্থক করিব।

দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের জন্য বহু অর্থব্যয়ে দুই দুইবার কমিশন বসিল, দ্বিতীয়বারের কমিশনে বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানি করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফল মোটা মোটা কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু এই গোড়ায় গলদ কিছুতেই ঘুচিল না। নানাভাবে কতক কতক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া জাতীয় শিক্ষার কোনও কোনও অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ আজও পশ্চিমদ্বারীই আছে, কেবল পূর্ব্বমুখো দুই চারিটা জানালা ফুটান হইয়াছে, সদর দরজা আজও পশ্চিমমুখো। এই সদর দরজাকে জানালায় পরিণত করিয়া পূর্ব্বমুখো সদর দরজা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তবে প্রকৃত গলদ ঘুচিবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখাইতেছি, যে নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে নিম্নতম পরীক্ষায় শুধু দুই একটি বিষয়ে ছাত্রবর্গ ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, এরূপ অনুমতি যথেষ্ট নহে; এমন কি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্কল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অনুরূপ, নিম্নতম পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া আর সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষায় হইবে; এরূপ বিধিও যথেষ্ট নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ নীচ সকল পরীক্ষায় সকল বিষয়েই (ইংরাজী ভাষা ওসাহিত্যের বেলায়ও এই ব্যবস্থার ব্যাতক্রম হইবার সঙ্গত কারণ দেখি না) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, দেশভাষা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার-কার্য্যের উপযোগী নহে, এই কথাটা মেকলে সাহেবের আমলে সত্য ছিল বটে; কিন্তু এই দীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এ কথাটা আর এখনকার বাঙ্গালাভাষা-সম্বন্ধে বলা চলে না। আজকাল ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব, সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বহু সুলিখিত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে উৎসাহ ও সহকারিতা পাইলে আরও দ্রুততর উন্নতি হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা হউক, যত দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত না হইতেছে, ততদিন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। কেননা আমাদের অতীত গৌরব-সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যাবিষ্কার কার্য্যে পরিষদ ব্যাপৃত, এবং এই সকল তথ্যই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উপাদান। কথায় বলে, যত মত তত পথ। জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) একভাবে আমাদের জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতেছেন, পরাধীনতাপাশবদ্ধ অবসন্ন হৃদয়ে উন্মাদনা উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া উজ্জীবিত করিতেছেন; সাহিত্য পরিষদও অন্যভাবে, আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উন্মেষিত করিয়া, এই কার্য্য করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির পথ অনেক সময়ে কঠোর, বিপৎসঙ্কুল, বিঘ্নবহুল; সাহিত্য-পরিষদের পথ সুগম, সরল ও নিরাপদ্। এ পথে কোন প্রবল প্রতিকূল শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা বিদেশীয় মুখে ক্রমাগত শুনিয়াছি যে আমাদের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। সুখের বিষয়, এখন সুর কতকটা ফিরিয়াছে। বিদেশীয় মুখে কিছুদিন হইতে এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে আমাদের গৌরব করিবার মত জিনিষের অভাব নাই। ভারতের জ্ঞান, ভারতের সভ্যতা যে 'তিব্বত চীনে ব্রহ্মাতাতারে' এমন কি আরও সুদূরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা আর এখন প্রাচ্যজাতিসুলভ কল্পনাপ্রসূত কবিকাহিনী নহে, Sylvan Levi প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখন এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছেন। এজন্য আমরা বিদেশী পণ্ডিতদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই সকল তথ্য আবিষ্কার করা আমাদেরই কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার নাই। এক্ষেত্রেও যদি আমরা পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা। যতক্ষণ বিদেশী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃতিত্বের কথা আমাদিগকে দয়া করিয়া শুনাইবে, ততক্ষণ আমরা তাহা জানিব, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে?

সুখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় শিক্ষিত লোক কিছু দিন হইতে আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের এসিয়াটিক সোসাইটী ইহার সূত্রপাত করেন, কিন্তু উক্ত সোসাইটিতে বিদেশীর সংখ্যাই খুব বেশী ছিল, আমাদের দেশের ২।১ জন মাত্র এই পথ লইয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য দেশীয় লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হইয়া অবধি এই গবেষণা কার্য্যে দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা হইয়াছে। উত্তর বঙ্গে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এই শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। আশা করি, অচিরেই এই ভিত্তির উপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অতীত গৌরবের উদ্ধার করিয়া জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিতে পারিলেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার আরম্ভ হয়। সাহিত্য-সম্মিলন যখন পঞ্চম বৎসরের শিশু, তখনই তৎকালীন সভাপতি, 'বাঙ্গলার বিক্রমাদিত্য,' সাহিত্য ও সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের উৎসাহদাতা, সাহিত্য পরিষদের শ্রেষ্ঠ বান্ধব, মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বলিয়াছিলেন, "সাহিত্য-সম্মিলন জাতীয় জীবন; স্ফুরণের একমাত্র উপায়। ...সাম্মলনের সদুদ্দেশ্য এই যে,... সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধ আলোচনা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনকল্পে উপায় নির্দ্ধারণ।" সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ সমবেত বঙ্গ সাহিত্য সেবকগণের সমক্ষে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আমার এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার এমন প্রতিপত্তি (authority) নাই যে তাহার জোরে আমার অনুরোধ রক্ষিত হইবে; তবে আপনাদেরই প্রদত্ত পদের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে এই অনুরোধ করিতে সাহসী

হইয়াছি। সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আপনরা অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, আমার এই ভরসা।

প্রস্তাব।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায় আমাদিগের প্রাচীন কালের যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত ও প্রকটিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই কতকগুলি গবেষণাত্মক গ্রন্থে ও নানা বিদ্বৎসমিতির (Learned Society) প্রকাশিত জর্ণ্যাল প্রভৃতিতে বিক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত আছে, জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে (যথা দর্শন, গণিত, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি) বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক সেগুলির একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রহ (systematized compilation) প্রস্তুত হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের, তথা বাঙ্গলা দেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর দেশীয় সভ্যগণের, এবং বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের বিদ্বদবর্গের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হউক। সংস্কৃত, পালি, তথা আরবী পারসী, এমন কি চীনা তিব্বতীয় প্রভৃতি সাধারণের দুরধিগম্য ভাষায় যে ভারতীয় জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহার সম্যক্ প্রয়োজন। তখন বিদ্যার্থিগণ প্রথমে স্বজাতির সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষার পত্তন করিবে; তাহার পর, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষা করিবে ও এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

উভয় শ্রেণীর পুস্তকই দেশভাষায় লিখিত হইবে। এক্ষণে দেশভাষার যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এ কার্য্য অসম্ভব বা দুরূহ নহে। এবং শিক্ষা ও পরীক্ষাও মাতৃভাষায় হইবে, সে কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। সকল শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য রীতিমত শিক্ষা করিতে হইবে এবং হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্য, মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পারসী ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইবে।

স্বজাতীয় প্রাচীন গৌরবের আলোচনা করিলেই বিদ্যার্থিগণ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিবে না। শুধু অতীত আঁকড়াইয়া থাকিলে কোনও জাতি

উন্নতিলাভ করিতে পারে না, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। সুতরাং পাশ্চাত্যজগতে যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভূত-পরিমাণে প্রসূত হইয়াছে, তাহা বিদ্যার্থিগণকে অর্জন করিতে হইবে। আবার এই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হইতে হইবে, মৌলিক গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উভয়বিধ জ্ঞানে ব্যবহারিক (applied) প্রয়োগে দেশের শিল্প কলা বাণিজ্য কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিবে। (আশার কথা জগদীশচন্দ্রের বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।) তবেই আমরা জগতের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠের জাতি হইতে পারিব।

অবশ্য, যে সকল বিশেষজ্ঞ নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে এখনও অনেকদিন নিজ নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা সেগুলি জগতের বিশেষজ্ঞগণের গোচর হইবে না, এবং তাহা না হইলে সেগুলির প্রকৃত মূল্য যাচাই করা যাইবে না। এক দিন পাশ্চাত্য-জগতেও বিশেষজ্ঞগণকে এই একই কারণে ল্যাটিন ভাষায় নিজ নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচারিত করিতে হইত। সকলেই জানেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন, তাঁহার 'প্রিন্সিপিয়া' ল্যাটিন ভাষায় লিখিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষায় নহে। তেমনই এখনও কিছুদিন আমাদিগের জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিকে ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে, যখন আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, যতদিন এই নিয়মে চলিতে হইবে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সে সকল তত্ত্বের স্থূলভাবে পরিচয় দিবার জন্য মাতৃভাষায় সেগুলির প্রচারও অবশ্য-কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা দেশের, শুধু বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষেরও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তাঁহার 'অব্যক্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই পথে অগ্রণী হইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্যও তিনি ধন্যবাদ-ভাজন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও এ বিষয়ে তাঁহায় সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদভাজন। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়া বাঙ্গালা

সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর 'জিজ্ঞাসা,' 'কর্ম্মকথা,' 'যজ্ঞকথা,' 'বিচিত্র জগৎ, 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি উপাদেয় পুস্তকে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ত্রিধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রকে অপূর্ব্ব সজীবতা ও উর্ব্বরতা প্রদান করিয়াছে। মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত University Extension Lectures এর ধরণের ব্যবস্থা শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান বিতরণের উৎকৃষ্ট উপায়, এই প্রসঙ্গে এ কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী নহেন, অথচ জ্ঞানতৃষ্ণা যাঁহাদিগের বলবতী, তাঁহারা এই উপায়ে প্রৌঢ়াবস্থায়ও নিজেদের যৌবনে অর্জ্জিত বিদ্যার অপূর্ণতার সংশোধন করিতে পারেন।

শুধু যে পত্নতত্ত্ব ও গবেষণার নীরস ক্ষেত্রে এই কার্য্য সীমাবদ্ধ তাহা নহে। যেমন গণিত ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব কার্য্যে লাগাইয়া (Applied অর্থাৎ ব্যবহারিক-রূপে) জগতের বহু উপকার সাধিত হয়, সেইরূপ গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলিকে খাঁটি সাহিত্যের কার্য্যে লাগাইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করা যায়। কেননা খাঁটি সাহিত্যই ভাবসঞ্চার ও প্রচার-দ্বারা জাতি উদ্ধারের, পুনরুত্থানের সাহায্য করে। দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় এক নূতন আদর্শের সাহিত্য সৃষ্ট হইবে আবার সেই সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয়তার ভাব নব বল পাইবে। এইরূপে উভয় উভয়ের সহায় হইবে। সকল দেশেই সাহিত্য জাতীয় জাগরণের মূলে আছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস-ক্ষেত্রে গবেষণা দ্বারা যে সব জাতীয় গৌরবের বৃত্তান্ত লব্ধ হইবে, সেই সব বৃত্তান্তের উপাদান লইয়া নূতন আদর্শের কাব্য-নাটক রচনা করিতে হইবে, তৎপাঠে জাতীয়তার ভাব, দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস-অবলম্বনে লিখিত সেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকাবলি দেশভক্তির ভাবে কিরূপ অনুপ্রাণিত, তৎপাঠে ইংরেজের হৃদয়ে দেশপ্রীতি কিরূপে সঞ্চারিত হয়, তাহা ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীরা জানেন। আমাদের কাব্য-নাটকেও সেই দেশপ্রীতির ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। বিলাতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কার স্যর ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র তাঁহাদের সময়ে দেশের ইতিহাস যতটা পরিজ্ঞাত ছিল সেই উপাদানের কাঠামোর উপর কল্পনার তুলিকা বুলাইয়া কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা লিখিয়া গিয়াছেন।

এখনকার নূতন অনুসন্ধানের ফলে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি-সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে, হয়ত তাহার আলোকে দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রগুলির দোষত্রুটি লক্ষিত হয়, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের কষ্টিপাথরে কষিলে সেগুলির কোনও কোনও অংশে খাদ ধরা পড়ে। তথাপি তাঁহারা দেশাত্ম-বোধ জাগরিত করিবার অমোঘ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। শেক্স্‌পীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ও স্যর ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাগুলিতেও এখনকার ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ গলদ বাহির করিয়াছেন। তথাপি শেক্সপীয়ার ও স্কট অতীতের উজ্জ্বল চিত্র সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছেন, এজন্য ইংরেজ জাতি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতায় অবনত-মস্তক। দোষত্রুটি-সত্ত্বেও শেক্স্‌পীয়ারের নাটক ও স্কটের আখ্যায়িকা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকাগুলিও সেইরূপ আমাদের আদরের সামগ্রী আমাদের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ,' এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকখানি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের তিরোধানের পর আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার কার্য্যে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও কয়েকজন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রভৃতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নবগঠিত গবেষণা-বিভাগের চেষ্টায় আশা করা যায় আরও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল নূতন তথ্যের কাঁচা মালকেও বঙ্কিম চন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রভৃতির প্রণালীতে ঐতিহাসিক কাব্য নাটকের উপাদানে পরিণত করিতে হইবে। যাঁহারা কল্পনাকুশল, তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সুখের বিষয়, খ্যাতনামা ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তির উপর কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বহস্তে কল্পনার তুলিকা গ্রহণ করিয়া 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'করুণা', 'ধর্ম্মপাল', প্রভৃতি গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া সাধারণ

পাঠকদিগকে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছেন। আবার প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেণের মেয়ে' আখ্যায়িকায় প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা করা যায়, উভয়েই আমাদিগকে আরও মুক্ত-হস্তে সাহিত্যরস পরিবেষণ করিবেন এবং তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা বা নাটক রচনা করিয়া সমাজের ও সাহিত্যের উপকার করিবেন। এই শ্রেণীর কাব্য-নাটক পাঠ করিলে পাঠক সমাজের কাব্য পাঠ জনিত আনন্দ লাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানলাভে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাও হইবে।

শুধু যে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের প্রধান পুরুষগণের শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা ক্ষমাগুণ প্রভৃতির চিত্র প্রদর্শনের জন্যই এই শ্রেণীর কাব্য-নাটকের প্রয়োজন তাহা নহে। সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের চিত্রও কাব্য-নাটকে অঙ্কিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে সেই শ্রেণীর চিত্রেও আদর্শচরিত্রাঙ্কনে সমাজের মঙ্গল হয়। আজকালকার আখ্যায়িকাকারগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে বা অনুসরণে, Realism, Romanticism, humanitarianism, sex-problem, criminology, medical jurisprudence প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক সামাজিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দোহাই দিয়া যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় থাকিলেও তাহা দ্বারা সমাজের প্রকৃত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্য সামাজিক প্রথার মোহাবিষ্ট বাঙ্গালীর নয়ন-সমক্ষে আমাদের প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ধরিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে', তথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'য় অঙ্কিত সম্পন্ন গৃহস্থঘরের আদর্শ 'কর্ত্তা' ও গৃহিণী, ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর,' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্টচক্র' ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তে অঙ্কিত পূতচরিত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ', শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু', ৺চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালক', ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ', ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুল', ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'কনেবৌ' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' ও 'অনুপমা', শ্রীযুক্ত

অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' প্রভৃতিতে অঙ্কিত আদর্শ যুবতী ও প্রৌঢ় বিধবা— এই শ্রেণীর চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজের উপর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে। পল্লীজীবনের সুখ দুঃখ প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন করিয়া পল্লীপ্রীতি সঞ্চারিত করারও এখন প্রয়োজন হইয়াছে। পল্লীসংস্কার, কুটিরশিল্প-প্রচলন, কৃষক ও শিল্পীদিগের মধ্যে প্রাথমিক-শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাদি প্রচার-কার্য্য (propaganda work) কাব্য নাটকের মারফত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। জড়জগতে যেমন তাড়িত-শক্তি মানবের নানাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে সাহিত্যজগতেও সেইরূপ কল্পনার চপলালোক সমাজের নানা মঙ্গল-বিধানে, নানা আদর্শস্থাপনে, নানা প্রশ্নবিচারে, নানা সমস্যা-সমাধানে, বিনিয়োজিত হইতেছে। অতএব নাটক ও আখ্যায়িকা-রচনা করিয়া সমাজে সুন্দর আদর্শ প্রচার করা ক্ষমতাশালী লেখকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

ফরমায়েশে সাহিত্য গড়িয়া উঠে না, ফরমায়েশী সাহিত্যও উচ্চদরের হয় না, বিশেষতঃ কবিদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাস্রোতকে হুকুমে অন্য খাতে প্রবাহিত করা যায় না, মানসসরোবরগামী হংসকে অন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র, এ সব কথাই জানি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির অনুরোধের যে বিশেষ গুরুত্ব (weight) নাই, ইহাও বুঝি। তথাপি এই শ্রেণীর গুণী লেখকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে সমগ্র জাতির হৃদয়ে উদ্দীপনা আনিতে তাঁহাদিগের মত আর কে পারে? তাঁহাদিগের একটি মোহন চিত্রে, একটি অগ্নিময় ছত্রে, যাহা হয়, তাহা শত শত প্রত্নতত্ত্বাত্মক গুরুগম্ভীর গ্রন্থে হয় না। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বলিতেছি, দেশমাতার দিব্য দিয়া তাঁহাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা গদ্যে, পদ্যে, গানে গল্পে, বক্তৃতায় প্রবন্ধে, একটা বিরাট সাহিত্য প্রস্তুত করুন তাহাতে দেশভক্তির পূর্ণ উদ্দীপনা হউক। তাঁহাদিগের প্রসাদে জাতীয় মহাভাব আমাদের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করুক। আমরা ধন্য হই।

শুনিয়াছি, ফরাসী দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে বিদ্যালয়ে দেশভক্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদেরও জাতীয় শিক্ষায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল কবিতা ও কাহিনীর প্রভাবে দেশভক্তির সঞ্চার হয়, সেই সকল কবিতা চয়ন করিয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার শেষ কথা,—যে সুর প্রথমে মধুসূদনের কণ্ঠে 'রেখো মা দাসেরে মনে' 'আমা জন্মে' এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে, রঙ্গলাল বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ কান্তকবি কাব্য-বিশারদ গোবিন্দচন্দ্র রায় ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের মিলিত কণ্ঠে যে সুর আরও উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, নরেন্দ্র দেব, হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি নব্যদিগের কণ্ঠে যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই সুর আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া 'সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে' ভারত-ভূমির আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হউক। যেমন 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা,' তেমনি কবির কথায়ই কবিকে আহ্বান করি,*

জাগো কবি! জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হ'তে
হের এ ধূলার ছবি।

দীর্ঘ তমস আঁধার-অন্তে,
উষা হাসিতেছে পূরব প্রান্তে,
পশ্চাতে তা'র কিরণ-কান্ত
ওই ধ্বান্তারি রবি।

ময়ুখ মেখলা ছড়ায়ে গিয়েছে
চির আঁধারের ভূমে;
অন্ধকারের বন্দীরা আজি
জেগেছে আলোর চুমে।

কনক বিজলী ছেয়েছে গগন,
ঘুমভাঙা দল মেলেছে নয়ন
এ নব প্রভাতে রাঙা ও ভুবন
নব সুর কুঙ্কুমে।

বিশ্বভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা;
নিঃস্ব রিক্ত ভাইরা তোমার
জননী তোমার ক্ষীণা।

পেটে নাই ভাত, মুখে নাই কথা
বুকপোরা শুধু নিরাশার ব্যথা
চির লুণ্ঠিতা বঞ্চিতা মাতা
মহারাণী আছে দীনা।

আনন্দ পূত নন্দন হ'তে
আনো গান—আনো গান
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিণী
শক্ত সফল প্রাণ।

ভিখারীর দল গেয়েছে বাউল
মুক্তির লাগ পাতিয়াছে শিব
হে চারণ! ফের হাসছে মাভৈ
ভোল তোল বাণী খান।

শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

* নারায়ণ—ফাল্গুন ১৩২৮, 'কবির প্রতি' (দিরবেশ রচিত)।

দর্শন-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

দর্শন-শাখার

সভাপতির অভিভাষণ।

ভ্রাতৃগণ !

জানিনা কতদিন হইতে দুঃখপীড়িত মনুষ্য সুখের অন্বেষণে অসীম কারাগারের মধ্যে দর্শনের আশ্বাসবাক্যে বাঞ্ছিত সুখ শীতল করিতে সমর্থ হইয়াছে। দর্শনের সৃষ্টি যখনই হউক ও যেমন করিয়াই হউক, এই পবিত্র ভারতভূমিতে দর্শন ও আগমের নিদর্শন যে আর্য্য ইতিহাসের প্রথম হইতেই আছে।

চার্ব্বাক দর্শন বেদবিহিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ মাত্র; বৃহস্পতির বচন হইতে একথা স্পষ্টভাবে অনুমান করিতে পারা যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাণী-দিগের বিহিত জুগুপ্সিত কার্য্য এবং সাধারণতঃ পশুবধ-রূপ হিংস্র কর্ম্ম উল্লেখ করিয়াই তিনি বলিয়াছেন—'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।'

বৃহস্পতি-মতানুযায়ী চার্ব্বাক দর্শন বৈদিক কার্য্যের প্রথম প্রতিবাদে। এই প্রতিবাদে বৃহস্পতি বলিতে পারিয়াছিলেন—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' কিন্তু সাধারণতঃ ভারতের আর্য্য জাতি স্বাধীন চিন্তার সম্পূর্ণ আবেশেও এ কথার অনুমোদন করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। লোকায়তিক স্বভাববাদে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। এইজন্য আগম হইতে পুনর্জন্ম মাত্র গ্রহণ করিয়া, অন্যথা স্বাধীন ভাবে চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া তাঁহারা নানাবিধ দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে গৌতম বুদ্ধের অবির্ভাব কালে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে দ্বিসপ্তি প্রকার 'দৃষ্টি' বা দর্শন প্রচলিত ছিল। 'ব্রহ্মজালসুত্তে' সেই সকল দৃষ্টির উল্লেখ আছে।

শ্রুতি-বিরোধী দর্শন সকলের মধ্যে আর্হত বা জৈন দর্শন অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক কর্ম্মমূলক হিংসার প্রতিবাদ হইতেই জৈন দর্শনে সম্পূর্ণ অহিংসা ব্রত। জৈন দর্শনের সম্যক চারিত্র এক কঠোর উগ্র তপস্যা। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের উপর জয়লাভ করা এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে করিতে

আলোক নামক অতীন্দ্রিয় স্থানে গমন করাই জৈন ধর্ম্মের লক্ষ্য। মন, বাক্য ও শরীরের সংযম দ্বারা স্থূল শরীরকে আয়ত্তাধীন করিয়া যাঁহারা প্রতিকূল পুদ্গলসমূহকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই 'জিন' বা জয়ী শব্দে অভিহিত হন।

আমার মনে হয় যেন জৈন দর্শন হইতেই দর্শনের ক্রম বিকাশ আরম্ভ হয়।

'পুদ্গলবাদের' সহিত পরমাণুবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তবে পুদ্গলের সম্পূর্ণ ভাব আমাদের দর্শনকারগণ গ্রহণ করেন নাই। যদি দ্রব্যের অণু, বাসনার অণু, এবং চিত্তের অণু এইরূপ ত্রিবিধ ভাগ সমন্বিত অণুর কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে জৈন 'পুদ্গলের' অন্তর্গত যথার্থ কল্পনা বুঝিতে পারা যায়। সপ্ত-ভঙ্গিন্যায় সম্বলিত স্যাদ্বাদ হইতেই যেন দর্শনের সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অন্যথা খ্যাতি ও অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির উৎপত্তি। দ্রব্য, গুণ পর্য্যায় ও জীবাদি ছয়, সাত কিম্বা নয় পদার্থ যেন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্মত পদার্থের আদি চিন্তন। জীব ও অজীব যেন প্রকৃতি ও পুরুষে পর্য্যবসিত। জৈন দর্শনের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেন রজোগুণ ও তমোগুণের অসংস্কৃত ভাব। সম্বর ও নির্জ্জরা যেন সত্বগুণের অন্বেষণা। জৈন দর্শনের প্রমাণ ও তর্ক হইতেই যেন অন্য দর্শনে প্রমাণ ও তর্কের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র যেন সাংখ্য ও যোগ পদ্ধতির প্রাথমিক ভাবা।

যদিও প্রাচীন দর্শন সমূহের মধ্যে জৈন দর্শন এক অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করে, তথাপি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট জৈন ধর্ম্মের আদর নাই। স্মৃতিকারগণ জৈন ধর্ম্মের এত বিরোধী যে তাঁহাদের শাসন—'ন গচ্ছেৎ জৈনমন্দিরম্'।

এই বিরোধের কারণ কি? যে সকল দর্শন শ্রুতি-সম্মত ও শ্রুতিগ্রাহী তাহাই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রকৃত দর্শন। যে সকল দর্শন শ্রুতির নিন্দা করে, তাহা হিন্দুর নিকটে দর্শন বলিয়াই অগ্রাহ্য।

এইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া দর্শনকে দেখিতে হইল যে, সে শ্রুতি সম্মত কি শ্রুতি-বিরুদ্ধ। যে দর্শন শ্রুতির প্রমাণ দিতে না পারিল বা শ্রুতির প্রমাণ অগ্রাহ্য করিল, সে দর্শন সনাতন ধর্ম্মের সিংহাসনে স্থান পাইল না।

কিন্তু দেখিতে হইবে, শ্রুতির ভিত্তি কি মনুষ্যের স্বাধীনতাবোধক-পরমশত্রু কিম্বা প্রকৃত স্বাধীনতার পরম সাধন এবং মনুষ্যের পরম মিত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন—"প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মনুষ্য যে সকল ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় জানিতে পারে না, বেদ কেবল সেই সকল উপায় মনুষ্যকে বলিয়া দেয়। ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারই মনুষ্যের স্বাভাবিক চেষ্টা। দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে তাহার উপায় জানিবার জন্য কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্পূর্ণ উপযোগী। সে বিষয়ে আগম অন্বেষণের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মনুষ্য জন্মান্তরের সহিত নিজের সম্বন্ধ এবং মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে না। আর যদি তাহাই না জানিতে পারে তাহা হইলে জন্মান্তরের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে তাহার কোন ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। স্বভাববাদী দর্শন ত আছেই সেস্পষ্ট বলে জন্মান্তর নাই। এইজন্যই বৈদিক শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহারা বৈনাশিক, তাহারা 'অহং' এইরূপ প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করিলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যেও এরূপ অনেক বিলক্ষণতা আছে। এবং এইরূপ বিলক্ষণতা থাকার জন্য প্রত্যক্ষ দ্বারা দেহব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। সেইরূপ অনুমান দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

যখন আগম দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানা যায় এবং কতকগুলি বেদ প্রদর্শিত লিঙ্গ বা অনুমান সেই জ্ঞানের অনুকূল হয়, তখন মীমাংসক ও তার্কিকগণ সেই সকল লিঙ্গ ও অনুমানকে আপনার বুদ্ধি প্রসূত কল্পনা করিয়া 'আত্মা প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়' এইকথা বলেন।" ('বৃহদারণ্যকের শাঙ্কর ভাষ্যের উপক্রমণিকা।)

বুদ্ধি অনন্তের অন্বেষণে অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হইলে, যেমন সমুদ্রপোত যাত্রী নাবিকের পক্ষে ধ্রুবতারা বা ধ্রুবতারা নির্দ্দেশক যন্ত্র অত্যাবশ্যক হয়, বুদ্ধির পক্ষে সেইরূপ বেদও অত্যাবশ্যক হয়।

এই বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের দর্শন বলিয়া কিছু থাকে না।

বেদ বলিয়া কোন সঙ্কীর্ণ, জাতিগত, দেশগত বা সম্প্রদায়গত বাক্য নাই।

আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার যে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ণ ও ভ্রমরহিত ইহা সহজে

অনুমান করা যায়। কিন্তু যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা না মানি, তাহা হইলে সে অনুমান অসম্ভব। এইজন্য বেদের দোহাই না দিয়া, কেবল মাত্র তর্ক ও যুক্তিদ্বারা ন্যায়দর্শন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে প্রথমে চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ। ৪-১-১৯। সেই তর্ক ও সেই যুক্তি পুনঃ পুনঃ জৈন দর্শন ও সৌগত দর্শনের বিরুদ্ধে প্রয়োজিত হইয়াছে বলিয়া, আমাদের দর্শনের মধ্যে তর্ক ও যুক্তির এত ছড়াছড়ি। এবং এক সময়ে যে ইহার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট ছিল ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি

ব্রহ্মার যে অখণ্ডিত সম্পূর্ণ জ্ঞান তাহাই প্রকৃত বেদ। সেই জ্ঞান হইতে ঋষিরা তপস্যার দ্বারা যাহা উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আমাদের বেদ।

বৈদিক ঋষিরা বহু জন্মের সংস্কার দ্বারা আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক উন্নত। কোন নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ সকল ঋষিরা ঈশ্বরের নিয়মাধীনে জন্মগ্রহণ করিয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা বেদ বা ব্রহ্মার জ্ঞানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পরবর্ত্তী মনুষ্যগণের জন্য রাখিয়া যান, একথাও অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ তথা।
তপসা ঋষয়াহ পশ্যান্ যতোধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

পুরাণের এইকথা না মানিলে, বেদ ও ঋষি না মানিলে, ভারতবর্ষীয় দর্শনের বিশেষত্ব থাকেনা।

বুদ্ধিবলে মনুষ্য অনেকটা অগ্রসর হয়। সেই বুদ্ধিবলেই মনুষ্য-আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়।

এই সন্দেহের সময়েই বেদ বা আগমের উপযোগিতা। বেদ মনুষ্যের সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারিলে মনুষ্য আবার নিজ বুদ্ধি বলে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। দর্শন ও আগমের এই পরস্পর সম্বন্ধ। আগম স্বাধীন চিন্তার বিরোধক নহে। কিন্তু যখন স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া মনুষ্য পথভ্রান্ত হয়, তখন আগম আসিয়া সেই ভ্রান্তির অবসান করে। মনুষ্য আবার নিজের বুদ্ধিবলে চলিতে থাকে।

যখন নচিকেতা পিতৃশাপ বশতঃ মৃত্যুমুখে আপতিত, তখন মৃত্যুর রহস্য জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত উদ্বেগ হইল। মৃত্যুর পর মনুষ্যের কিরূপ

গত হয়, এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া তাঁহার বিষম সন্দেহ হইল—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে'। এই সন্দেহের নিরাকরণ কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা হয় না বলিয়াই, নচিকেতা বারংবার প্রত্যাখাত হইয়াও উপনিষদের শরণ লইলেন।

উপনিষদ্ অভ্রান্ত ভাবে তাঁহাকে উত্তর দিলেন—

হন্তত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্মসনাতনম্।
যথাচ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণুমন্যে হনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম॥

উপনিষদ্ এই বাক্যে জন্মান্তর রহস্য ও কর্ম্ম রহস্য অবতারণা করিয়া বলিলেন, কেবল ইহাই জানিলে চলিবে না; সনাতন ব্রহ্মের কথা বলিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। ইহার পূর্ব্বেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু র্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।

আমরা যাহাকে অহং বা আমি বলি—সে একটি রাজ্যের কথা। এই রাজ্যমধ্যে যিনি যথার্থ আমি, তিনিই রাজা তিনি রথী, শরীর তাঁহার রথ। এই রথ চালনার জন্য বুদ্ধি তাঁহার সারথি; মন লাগাম ও ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব। বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণের বিচরণ ভূমি। রাজা ও রাজসারথি বুদ্ধি আমাদের উচ্চতর চালক অংশ,—মন, ইন্দ্রিয়, ও শরীর আমাদের নিম্নতর চালিত অংশ।

সাধারণ মনুষ্য মন দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু শ্রুতির মতে রাজা ও রাজসারথি দ্বারা চালিত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই আমরা দর্শনের কথা বুঝিতে পারিব।

এই চালক অংশই আমাদের প্রকৃত জীবতত্ব। এই চালক অংশই ব্রহ্মের ইচ্ছার সহকারী হইয়া তদনুকুল জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই জীবতত্ব, জগৎতত্ব ও ব্রহ্মতত্ব।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই দর্শন সকল কোন না কোন তত্বের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং অবশেষে উত্তর মীমাংসা সকল তত্বেরই সমন্বয় করে।

ন্যায়-দর্শন দ্বারা আমরা যে উপকার পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ন্যায়দর্শনের ঈশ্বরবাদ বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মবাদ হইতে বিভিন্ন হইলেও সাধারণ সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান ও ঈশ্বরের উপাসনা ন্যায়দর্শন কর্ত্তৃকই প্রচারিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে। যুক্তির বলে ন্যায়দর্শন আত্মার অস্তিত্ব, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলাদি প্রভৃতিসঙ্গত তত্ত্ব নিরাকরণ ও নির্দ্ধারণ করিয়া মনুষ্যের মানসিক শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে এবং মনুষ্যকে স্বাধীন চিন্তায় অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক জগতের উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া মহর্ষি কপিল যে মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা জগতের এক দুর্লভ রত্ন।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ মধ্যে মৌলিক-উপাদান-তত্ত্ব বা কারণতত্ত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়া কপিলদেব চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের নির্ণয় করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত আমরা সেই মহা-কল্পনার অভ্যন্তরে সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহা আমাদের কম গ্লানির কথা নহে। জ্ঞান বা চৈতন্যের মাত্রার সহিত এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, আমরা তাহার ঠিক আলোচনা করিয়াছি কিনা, বলিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে Matter বলে তাহার স্বরূপ ও উৎপত্তি লইয়া কত আন্দোলন চলিতেছে এবং কত বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণান্বিত হইয়া প্রকৃতি যে সকল বিকার উৎপাদন করে, সাংখ্য দর্শনের আলোক লইয়া ভারতীয় দার্শনিক সেই রহস্য ভেদের উদ্যমে এখনও পর্য্যন্ত ব্রতী হন নাই। প্রকৃতির বিকার ও পুরুষের ইচ্ছা নিত্য বিরুদ্ধ। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা এখনও উপলব্ধি করি নাই। 'পঙ্গ্বন্ধবৎ' ন্যায় আমাদের কাছে কথার কথা। বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণজনিত প্রাকৃতিক ক্রিয়া এবং এই প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পুরুষের ইচ্ছার সম্বন্ধ এক পরম রহস্যের কথা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভারতীয় দর্শন; এই দুয়ের ভাষা এবং এই দুয়ের চিন্তার সামঞ্জস্য করিয়া এই রহস্য সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থ লেখা চলে। আমরা কি কেহ সেজন্য যত্নবান হইব না?

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত বেদান্ত দর্শনের অত্যাবশ্যক সোপান। এই সিদ্ধান্ত চিরকাল জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

কিন্তু দর্শনের সিদ্ধান্ত কেবল তর্কের সামগ্রী নহে, কেবল বিচারের বিষয় নহে। দর্শনের সিদ্ধান্ত মনুষ্য জীবনের নিয়ামক, এবং চির উন্নতি ও পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শক। কেবল মাত্র জানিলে চলিবে না, যে পুরুষ সত্ব বা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। কিন্তু যাহাতে সেই জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া মনুষ্য তমোগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্বগুণের বিকাশ দ্বারা পুরুষ-জ্ঞানের কেবলতা অনুভব করিতে পারে, তাহাই সাংখ্যজ্ঞানের সফলতা।

পতঞ্জলি বলেন কেবলমাত্র বিচার দ্বারা পুরুষের কেবলতা উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ আমাদের চিত্তবৃত্তি অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশদ্বারা সর্ব্বদা অভিরঞ্জিত, কলুষিত এবং ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত। বৈরাগ্য অভ্যাস বা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে সংযত ও বিশুদ্ধ করিয়া পুরুষে সমাধিস্থ করিতে না পারিলে, কেবল বিচার দ্বারা পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বা অন্যতা জ্ঞানের নিরবলম্ব প্রবাহ হইতে পারে না।

কিন্তু যদিও কৈবল্য জ্ঞান বা স্বরূপে অবস্থান পতঞ্জলির লক্ষ্য, তথাপি তাঁহার দর্শন মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের এক অমোঘ উপায়।

আমরা কঠ-শ্রুতিতে মন দ্বারা চালিত মনুষ্য এবং আত্মা ও আত্মসারথি বিজ্ঞান দ্বারা চালিত মনুষ্যের কথা দেখিয়াছি। যত দিন মন আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করে, তত দিন আমরা দার্শনিক ও ঔপনিষদ মার্গে পঁহুছিতে পারি না; যখন আত্মসারথি বিজ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদের মনকে চালিত করে, তখনই আমরা প্রকৃত দার্শনিক হইতে পারি। তাহার পূর্ব্বে দর্শন কেবল নিষ্ফল বাদানুবাদ।

এইজন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ পাতঞ্জলমতে আমাদের প্রধান সাধন।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক রহস্য। পতঞ্জলির সমগ্রসূত্রই এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। যোগসূত্র দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে বিজ্ঞানের যে পদ্ধতি ও প্রণালী আছে তাহা বহিঃসাধন সাপেক্ষ। আমাদের যে সকল সূক্ষ্ম অন্তর্বৃত্তি আছে, তাহা জাগরিত করিতে না পারিলে আমরা অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না এবং মনঃ-প্রধান সত্তা অতিক্রম করিয়া পুরুষ বা আত্ম-প্রধান সত্তা লাভ করিতে পারি না।

এবিষয়ে আমি পতঞ্জলির দুইটি সূত্র এবং সেই দুই সূত্রের উপর ব্যাস-ভাষ্যের উল্লেখ করিব। "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী ১—৩৫।" যদি একাগ্রচিত্তকে নাসিকাগ্রে ধারণা করা যায়, তাহা হইলে পার্থিব গন্ধ অতিক্রম করিয়া এক দিব্যগন্ধের অনুভব হয়। ইহাকে গন্ধ-সংবিৎ বলে, যাহা হইতে গন্ধপ্রবৃত্তি হয়। সেই রূপ জিহ্বাগ্রে চিত্ত ধারণা করিলে রস সংবিৎ, তালুদেশে রূপসংবিৎ হয়, জিহ্বা মধ্যে স্পর্শসংবিৎ হয়, ও জিহ্বা মূলে শব্দ-সংবিৎ হয়। এই সকল প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে কোন এক বিষয়ে স্থিতি বা একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ করে, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করে এবং এই জন্য এই সকল প্রবৃত্তি সমাধি প্রজ্ঞার দ্বারে অবস্থিত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা চন্দ্র, আদিত্য গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রশ্মি প্রভৃতিতেও এইরূপ বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে। যদ্যপি শাস্ত্র, অনুমান এবং আচার্য্য উপদেশ দ্বারা বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, তথাপি মনুষ্য যে পর্য্যন্ত কোন না কোন সূক্ষ্ম বিষয় নিজের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত পরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষতঃ অপ-বর্গাদি সূক্ষ্মবিষয় সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্য উপদেশ দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য অন্ততঃ একটাও সূক্ষ্ম বিষয় প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সহজে শ্রদ্ধা বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি সহযোগে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করা যাইতে পারে। 'বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥১--৩৬'

যদি হৃদয় পুণ্ডরীকে চিত্ত ধারণা করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি সংবিৎ হয়। বুদ্ধি-সত্ত্ব ভাস্বর ও আকাশ কল্প। সেই বুদ্ধি তত্ত্বে মন সম্পূর্ণ রূপে অবস্থিত হইলে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও মণির আলোকের ন্যায় নানারূপ আলোকের প্রকাশ পায়। তখন চিত্ত অস্মিতাতে নিমগ্ন হইয়া নিস্তরঙ্গ মহোদধির ন্যায় শান্ত, অনন্ত, অস্মিতা মাত্র হয়। ইহাকেই পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন—তমণু-মাত্রমাত্মানমনুবিদ্য, অস্মীত্যেবং তাবৎ সংপ্রজানীতে ইতি। 'সেই অণুমাত্র আত্মাকে জানিয়া তখন অস্মি এই প্রকার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে।' এই প্রবৃত্তি বিশোকা বা আনন্দময়ী এবং জ্যোতিষ্মতী বা আলোকময়ী।

যোগিগণ এইরূপে হৃদয় মধ্যে জীবাত্মার আলোক দর্শন করেন এবং সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া জগতের সকল পদার্থই জানিতে পারেন। প্রবৃত্ত্যা-লোক ন্যাসাৎ সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ —৩।২৫

এই হইল মনুষ্যের সত্যসামর্থ্য এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যদিও দর্শন এখন বেদপ্রদর্শিত পথের পথিক, তথাপি নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া দার্শনিক কেবল বিশ্বাস ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহে না। বুদ্ধিসারথি আত্মাই জীবাত্মা। জীবাত্মাই মনুষ্যের যথার্থ সত্তা। মনুষ্য এখন নিজ বলে নিজ সত্তা লাভ করিতে চায় এবং পরে সে সত্তাও দূরে রাখিয়া কেবল অবিকারী পুরুষে অবস্থিত হইতে চায়।

দর্শনের বিকাশের সহিত এক ঐশ্বরিক ইচ্ছার সমন্বয় আছে।

যদি লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া লক্ষ স্থানে রাখা হয়, তাহা হইলে গৃহ নির্ম্মাতার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেই ইষ্টকগুলিকে সংহত করিয়া এবং অন্যান্য সামগ্রীর সহিত মিলিত করিয়া তবে গৃহের রচনা করিতে হয়। এক সাধারণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য বিবিধ পদার্থকে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল জীব আছে, তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ। এই জন্য পরস্পর ভাবনা ও পরস্পর ত্যাগ দ্বারাই সকল জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইতে পারে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ॥
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

যদিচ কর্ম্মকাণ্ডে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের ফল স্বর্গলাভ, তথাপি স্বর্গলাভই যজ্ঞের চরম ফল নহে। যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য ত্যাগের শিক্ষা লাভ করে। এমন কি সর্ব্বমেধ যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া মনুষ্য ত্যাগের চরম সীমায় উপনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিধি নিষেধের নিয়োগ পালন করিয়া মনুষ্য ধর্ম্ম আচরণের শিক্ষা লাভ করে। ক্রমশঃ ধর্ম্ম আচরণ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ত্যাগের শিক্ষা, ধর্ম্মের শিক্ষায় জন্য স্বর্গ এক প্রবল প্ররোচনা ও হৃদয়গ্রাহী উত্তেজনা।

ফল শ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়োরোচনং পরম্।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্।

ভা, পু ১১-২১-২৩

কিন্তু স্বর্গ, দেবতা ও পিতৃগণের সম্বন্ধে কি প্রমাণ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ত এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় না। এই জন্য জৈমিনি শ্রুতি-

প্রমাণই সার করিলেন। বেদ বাক্যই তাঁহার নিকট একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতিই তাঁহার পরম দেবতা, শ্রুতিই তাঁহার পরম গতি। শ্রুতিবাক্য অনুসারে শ্রৌতকর্ম্ম করাই তাঁহার মতে মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ।

শ্রুতি যে অভ্রান্ত ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত প্রয়াস। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আদর পাইবে কি না তাহা জানি না। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেরই অগ্রাহ্য হইবে না।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া স্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদী ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥ ১১-২১-৩৫

বেদে কেবল মাত্র কর্ম্মকাণ্ড নাই। কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড এই তিন কাণ্ড আছে। এই জন্য যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, সেই সংসারী জীবকে আত্মা বলা কর্ম্মকাণ্ড বেদের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। ব্রহ্মই আত্মা। ইহাই বেদের তাৎপর্য্য। তবে কর্ম্মকাণ্ডে পরোক্ষভাবেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে অরুন্ধতী-ন্যায় আছে। আকাশমার্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যে বশিষ্ঠ-সন্নিহিত অরুন্ধতীকে দেখাইতে হইলে প্রথমে বশিষ্ঠকে দেখাইতে হয়; পরে বশিষ্ঠ দর্শনে মন ধ্যাননিষ্ঠ হইলে, বশিষ্ঠের অংশপ্রায় সূক্ষ্ম অরুন্ধতীর সহজে দর্শন হয়।

সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ অচিন্ত্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতে হইলে অরুন্ধতী-ন্যায় অনুসরণ করিয়া পরোক্ষভাবে তাঁহাকে জানাইতে হয়।

সেই ব্রহ্মের শব্দ দ্বারাই এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে। দেবতা, কর্ম্ম, মন্ত্র কেবল তাঁহাকেই জানাইতেছে এবং তাঁহারই নিত্য শব্দের নিত্য অর্থ ব্যক্ত করিতেছে।

তাঁহার শব্দের সহিত তাঁহার অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অনন্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক নিত্য সংকল্প। সেই সংকল্পই পরা বাক্। সেই বাক্ই বৈখরী বাণীতে আমাদের জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মের শব্দ দ্বারাই ব্রহ্মকে আমরা পরোক্ষ ভাবে জানিতে পারি। এই জন্য সমগ্র বেদ শব্দব্রহ্ম।

পরবর্ত্তী শ্লোকে পুরাণ বলিতেছেন—

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়ম্।

অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ১১-২১-৩৬

'প্রাণেন্দ্রিয়মনোময় শব্দব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্বোধ। যেন অনন্তপার, গম্ভীর, দুর্বিগাহ্য সমুদ্র।'

শব্দব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে দ্বিবিধ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ চোদনালক্ষণ বেদ স্থূল শব্দব্রহ্ম। এই স্থূল শব্দব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা যায়, কিন্তু ইহার অর্থ অত্যন্ত দুর্বোধ। আর সূক্ষ্ম বেদের স্বরূপ ও অর্থ অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়।

প্রথমে প্রাণরূপী পরাখ্যবেদ প্রাণরূপী ঈশ্বরের কল্পনা-ব্যঞ্জক। তাহার পর মনোময় 'পশ্যন্তী' সেই কল্পনাকে নানারূপ মানসিক ভাবে ও মানসিক সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত করে।

সেই সৃষ্টি ইন্দ্রিয়ময় বাণীতে পরিণত হইয়া অধিভূত অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও অধ্যাত্ম অর্থাৎ ঐ সকল বিষয়ের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয় এবং অধিদেব অর্থাৎ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশানুকূল দেবতা—এই ত্রিবিধ আকারে মধ্যমা বাণীতে পরিণত হয়।

বৈখরী বাণীতে বাগিন্দ্রিয় প্রমুখ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয় এবং বাক্ বা শব্দ অর্থের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয়।

যে বাক্যের সহিত ঈশ্বর-কল্পনা বা পরা বাণীর সম্বন্ধ আছে, সে বাক্য নিত্য ও অভ্রান্ত। "নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ" ১-১-১৮—এই সূত্রে জৈমিনি এই অর্থই প্রকট করিয়াছেন।

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

"চত্বারি বাক্ পরিমিতানি পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়' বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥"

'বাক্ পরিমিত শব্দব্রহ্মের চারি পাদ। এই চারি পাদ দ্বারা তাঁহার পরম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণের অন্তর্দৃষ্টি আছে, কেবল তাঁহারাই সেই চারিপাদ জানিতে পারেন। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এই তিন পাদ হৃদয় গুহার অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। বাহিরে প্রকাশিত হয়

না। এইজন্য মনুষ্যেরা বৈখরীরূপ চতুর্থ ভাগই কেবল আলোচনা করে, কিন্তু তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে না।'

বৈদিক কর্ম্ম প্রলুপ্ত হওয়াতে, আমরা শব্দব্রহ্মের গভীর অর্থ জানিতে পারি না। প্রণব রূপে প্রকাশিত সেই শব্দব্রহ্ম সমগ্র বেদকে উদ্ভাসিত করিয়া কিরূপে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সংকল্প অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বেদকে অনুসরণ করিয়া গ্রীস ও মিশর দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ঈশ্বরকে Logos, Verbum বা বাক্ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক মোক্ষমুলর বলেন—

'But although we can discover in this hymn an appreciation of the mysterious nature of Speech, we look in vain for the clear and definite idea that language and thought are one, which can be so clearly read in the Greek word Logos, both word and thought, nor do we find more than a slight anticipation of the Neo-Platonic dogma that the creation of the universe was in reality an utterance of the hidden thoughts and words of the deity."—The Six Systems of Indian Philosophy, p. 88.

আমার বিবেচনায় অধ্যাপক মোক্ষমুলরের এই ধারণা অমূলক। Logos বা শব্দব্রহ্মের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পূর্ব্ব মীমাংসার প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

এ বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি দুইয়েরই প্রমাণ আছে, যথা—

"স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজৎ"—শ্রুতি।

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চনির্ম্মমে॥"—স্মৃতি।

পূর্ব্ব মীমাংসার আর একটি কথা বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব মীমাংসকের মতে স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন আত্মাই পরমার্থ-নিত্য।

কোষের ভেদ পূর্ব্ব মীমাংসায় নাই। পুরুষ বা জীবাত্মার অনুভব করিতে গেলে, চিত্ত-বৃত্তির দমন করিতে হয়—পতঞ্জলি সূত্রে তাহা জানিয়াছি। জৈমিনির মতে চিত্ত সর্ব্বদা দেবতা ও স্বর্গের ভাবনা করিবে। স্বর্গে দেবতার ন্যায় অমর হইয়া থাকাই মুক্তি। দেবতা ও স্বর্গ ভাবনার ফল 'অপূর্ব্ব'। অপূর্ব্বই ফলদাতা। অপূর্ব্বেই স্বর্গভাব আছে। পূর্ব্ব মীমাংসকের অপূর্ব্বই আমার ক্ষুদ্র ধারণায় জীবাত্মার শক্তি, পরোক্ষভাবে জীবাত্মারই ব্যঞ্জক।

'চোদনা পুনরারম্ভঃ'—দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের এই সূত্রই অপূর্ব্বের অস্তিতা-প্রতিপাদক। এই সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী বলেন—"সূত্রে চোদনা এখানে অপূর্ব্ব বুঝিতে হইবে। অপূর্ব্ব নিশ্চয়ই আছে। অপূর্ব্বই আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত লইয়া যায়। বেদের বিধি, 'যিনি স্বর্গকাম, তিনি যাগ করিবেন'। কিন্তু যাগ-ক্রিয়া ভঙ্গী বা বিনাশনীল। যদি অপূর্ব্ব না থাকে, তাহা হইলে এই বিধান অনর্থক হয়। যদি অন্য কিছু উৎপন্ন না হইয়া যাগ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন নিমিত্ত না থাকার হেতু স্বর্গরূপ ফল প্রাপ্তি অসম্ভব হয়। এইজন্য যাগ কর্ম্মদ্বারা অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয়।"

এই অপূর্ব্ব জীবাত্মার স্বর্গগামী স্বর্গানুকূল, স্বর্গসম্বন্ধিনী শক্তি। যেমন যোগ-মার্গ দ্বারা মনুষ্য এই দেহে অবস্থিত হইয়াও জীবাত্মার আলোক অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ অপূর্ব্ব দ্বারা শরীর বিচ্ছিন্ন মনুষ্য স্বর্গভাবনা দ্বারা বহুকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে।

পূর্ব্ব মীমাংসার শব্দ হইতে উত্তর মীমাংসার ইচ্ছা। উত্তর মীমাংসায় পরা ও বৈধীর সমন্বয়।

বাদরায়ণ ব্যাসদেব ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া বলিলেন, ব্রহ্ম হইতেই জগতের জন্ম, স্থিতি, লয়, ব্রহ্মই বেদের কর্ত্তা, বেদান্ত ব্রহ্মবোধক এবং ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত।

এবার স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতির বিচার নাই, স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের বিচার নাই, এবার শরীর ও শরীরাত্মার বিচার নাই, এবার জগৎ ও জীব হইতে বিলক্ষণ সৃষ্টিকর্ত্তার বিচার নাই। এবার সকল বিচারের মূলে ব্রহ্ম, সকল তত্ত্বের আধার ও অধিষ্ঠান ব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন জগৎ ব্রহ্মের অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতি। জীব ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সত্তাতেই জগতের সত্তা ও জীবের সত্তা।

তাহার পর বাদরায়ণ এক গভীর তত্ত্ব বলিলেন—

ঈক্ষতেনাশব্দম্

উপনিষদ্ বলেন—তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন 'আমি এক, নানা হইব'। অতএব এই নানাত্বের মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরিণামশীল প্রকৃতির অসংখ্য আকার, অসংখ্য উপযোগিতা, অসংখ্য জীবের অসংখ্য ইচ্ছা অসংখ্য জ্ঞান ও অসংখ্য ক্রিয়া—সকলই ব্রহ্মের অসংখ্য ইচ্ছা।

'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'

—এই জীবরূপ অংশ-ব্রহ্ম আংশিক প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের অংশানুরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছে। ব্রহ্ম নিজের পূর্ণ ইচ্ছা, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণক্রিয়া দ্বারা সমষ্টি প্রকৃতিকে চালিত করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। সমষ্টি লইয়া তাঁহার পূর্ণত্ব, ব্যষ্টি লইয়া আমাদের অসম্পূর্ণত্ব। ব্রহ্মের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়াই মহদাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুরূপ সেই সৃষ্টি হইয়াছে।

হিরণ্যগর্ভ, দেবতা, ঋষি, মনু, পিতৃ, মনুষ্যের মধ্যে সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান, সেই ক্রিয়া আংশিক রূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানারূপ খণ্ড প্রকৃতির সহযোগে নানারূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছে।

এই বিচিত্র জগতের মনোহর দৃশ্য, প্রকৃতির পরম সৌন্দর্য্য, মনুষ্যের দেবভাব, হৃদয়ের আবেগময় উচ্ছ্বাস, প্রীতি ও প্রণয়ের আত্মহারা মধুর ভাব—সকলেরই মূলে ইচ্ছা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, জড়ের অন্ধ চেষ্টা, স্বভাব বা গুণ-প্রবাহ—এ জগতের কারণ নহে। ইচ্ছার বিচিত্রতা অনুসারেই জগতের বিচিত্রতা। ব্যষ্টি ইচ্ছার ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যষ্টি ইচ্ছার সাঙ্কর্য্য, ব্যষ্টি ইচ্ছার স্বতন্ত্রতাই জগতের সুখদুঃখের মূল। সকল ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার অনুকূল হওয়াই জগতের চরম উন্নতি এবং ভগবদিচ্ছার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি।

আমি যেমন ইচ্ছা করিতেছি, আমার জ্ঞান-অনুযায়ী আমি সেইরূপ কর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছি। সেই কর্ম্ম অনুযায়ী আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় ও আমার মন।

আমারই ইচ্ছা, জ্ঞান ও কর্ম্ম-অনুযায়ী আমার জন্ম, আয়ু ও ভোগ। আমিই আমার কর্ত্তা। আমার ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হওয়াই আমার চরম লক্ষ্য। যতদিন আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছার

প্রতিকূলগামী হইয়া চলে, ততদিন আমরা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হই এবং প্রতিকূল বাসনায় দুঃখময় ফল ভোগ করি। মধ্যে মধ্যে অনুকূল বাসনার সুখময় ফলও ভোগ করিয়া আশার নেত্রে সেই অনুকূল মার্গের অন্বেষণ করি। তখন আগম আমাদিগকে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া বিধি-নিষেধের কঠোর শাসনে পবিত্র ও পুণ্যময় করে, দেবতাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয় এবং দ্রব্যত্যাগের নিয়মাধীন করিয়া আমাদের পার্থিব আকর্ষণ শিথিল করে।

তাহার পর বেদান্তের অধিকার। উপনিষদ্, শারীরকসূত্র এবং ভগবদ্গীতা বেদান্তের তিন মহাপ্রস্থান। উপনিষদ্ বাক্যের সমন্বয় করিয়া বাদরায়ণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন এবং জীবের ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। তিনি সকল দর্শনের এইখানে সমাধান করেন।

ভগবদ্গীতা আগম ও দর্শনের সমন্বয় করিয়া মনুষ্যকে যথাক্রমে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের মার্গ দ্বারা বিষ্ণুর পরমধাম দেখাইয়া দেন। উত্তর মীমাংসা সিদ্ধান্তের জন্য অন্য দর্শনের খণ্ডন করেন, ভগবদ্গীতা সকল দর্শনকে ব্রহ্মপ্রমুখ করিয়া সকল দর্শনের সামঞ্জস্য করেন। সিদ্ধান্তের জন্য শারীরক সূত্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেন। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান মার্গের জন্য ভগবদ্গীতা কেবল সগুণ ব্রহ্মের কথাই বলেন।

কিন্তু সে জ্ঞান কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার জ্ঞান। সে জ্ঞান কেবল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জ্ঞান। সে জ্ঞান কেবল 'মৎকর্ম্মকৃৎ' ও 'মৎপরায়ণ' হইবার জন্য। সে জ্ঞান আত্ম ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া ভগবদিচ্ছায় গা ঢালিয়া দিয়া ভগবৎ কর্ম্মের সহকারী হইবার জন্য। সে জ্ঞানে—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্.

সগুণ ব্রহ্ম লইয়া বেদান্তদর্শনের এইখানে অবধি।

কেবলমাত্র মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া পূর্ব্বমীমাংসা। কেবলমাত্র উপনিষদ্ লইয়া উত্তরমীমাংসা। ভগবদ্গীতা ত' ভগবদ্বাক্য। তবে কি মনুষ্যের শিশুভাব এখনও যায় নাই? সে নিজে দেবতা বা বেদবক্তা ব্রহ্মাকে জানুক বা না জানুক, সে নিজে ঋষি হইয়া বেদবাক্য দর্শন করুক বা না করুক,

তথাপি বেদের উপর নির্ভর করিয়া এমন কি ভগবানকে না জানিয়াও ভগবদ্বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের চরম লক্ষ্য অবধারণা করিবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বলে সেই লক্ষ্যকে উপাসনা করিবে ?

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

যে যোগবলে নিজ আত্মা সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইবে, সে কখনও আত্মজ্ঞানী হইতে পারে না।

মনুষ্য যদি চিরকাল দেবতা, বেদ ও ঈশ্বর মানিয়া নিজের প্রযত্ন ও উদ্যমকে জলাঞ্জলি দেয়, নিজবলে, নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, তাহা হইলে দেবতা বেদ ও ঈশ্বর তাহার কাছে নিরর্থক।

বরং বেদ, দেব ও ঈশ্বর দূরে থাকুন, এখন মার্জ্জিত ও উন্নত মনুষ্য আর একবার স্বাধীন ভাবে চলিতে শিখুক। সে নিজবলে বলী হইলে আবার দেব, আবার ঈশ্বর আসিয়া পড়িবেন।

ইহাই যথার্থ বৌদ্ধ দর্শন, ইহাই ভগবান বুদ্ধদেবের যথার্থ অভিপ্রায়। আমরা যাহাকে সৌগতদর্শন বলি, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত বলিয়া যে সকল দর্শন সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে, তাহাকে আমি বৌদ্ধদর্শন বলি না। বুদ্ধদেবের জীবনকে, বুদ্ধদেবের বাক্যকে আমি বৌদ্ধদর্শন বলি।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বলেন —

যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধ একএব বোধয়িতা তথাপি বোদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদাৎ চাতুর্ব্বিধ্যং যথা গতোঽস্তমর্ক ইত্যুক্তে জারচৌরানূচানাদয়ঃ স্বেচ্ছানুসারেণাভিসরণ পরস্বহরণ সদাচরণাদি সময়ং বুধ্যন্তে। সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যমিতি ভাবনাচতুষ্টয়মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যম্।

'যদিও ভগবান্ বুদ্ধদেব একমাত্র বোধয়িতা, তথাপি যাঁহাদিগকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিভেদের জন্য বৌদ্ধদর্শন চতুর্ব্বিধ। যেমন 'সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে' এই কথা বলিলে স্ব স্ব ইষ্ট অনুসরণ করিয়া জার প্রণয়িনীর অভিসারে গমন করে, চৌর পরস্বহরণে তৎপর হয় এবং বেদাধ্যায়ী অনুচান সদাচরণের সময় বুঝিয়া বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ বুদ্ধের শিষ্যগণ স্ব স্ব ভাবনা অনুসারে, কেহ বলেন সকল পদার্থই ক্ষণিক, কেহ বলেন সকল পদার্থই দুঃখ, কেহ বলেন সকল পদার্থই স্বলক্ষণ, কেহ বলেন সকল পদার্থই শূন্য।"

কথাটি শ্লেষ পূর্ণ হইলেও একরূপ প্রকৃত।

বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত বাক্যে আমরা তাঁহার প্রকৃত দর্শন বুঝিতে পারি।

"বাশিষ্ঠ! বেদত্রয়ে পারদর্শী হইয়া কোনও ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? তাঁহাদের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্তও কি কেহ এরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? * * সূর্য্য ও চন্দ্র ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ করেন ও নিত্য উপাসনা করেন। তাঁহারা কি বলিতে পারেন, সূর্যলোকে ও চন্দ্রলোকে যাইবার সহজ পথ কি?

বাশিষ্ঠ! যদি কেহ বলে, এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা যে সুন্দরী রমণী আছে, তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং লোকে যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে রমণী কে এবং উত্তরে যদি সে বলে, আমি জানি না, তাহা হইলে কি সে উপহাসাস্পদ হয় না? * *

এই অচিরাবতী নদী যদি আকুলপূর্ণা হয় এবং কর্ম্ম উপলক্ষে যদি কাহাকেও অপর পারে যাইতে হয়, সে যদি এপার হইতে চীৎকার করে 'হে, নদীর অপরকূল, তুমি এই পারে আইস" তাহা হইলে কি অপরকূল সে কথা শুনিবে? বাশিষ্ঠ! যদি ব্রাহ্মণেরা তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াও সেই সকল সদ্‌গুণের আধার না হ'ন, যাহাতে লোক সত্য মত ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে কি "ইন্দ্র! তোমাকে আহ্বান করিতেছি—বরুণ! তোমাকে আহ্বান করিতেছি, ঈশান! তোমাকে আহ্বান করিতেছি—প্রজাপতি! তোমাকে আহ্বান করিতেছি—ব্রহ্ম! তোমাকে আহ্বান করিতেছি" এইমাত্র বলিয়া আহ্বান করিলেই তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারেন?

হে বাশিষ্ঠ! আমি তথাগত, আমাকে যদি কেহ ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি নিঃসন্দেহরূপে ঐ লোকের কথা বলিতে পারি, কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি।

তবে বাশিষ্ঠ! অবধান কর। কালে 'তথাগত বুদ্ধ' এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ সুলক্ষণ সম্পন্ন ও সুমহান্। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার করতলগত। তিনি দেবগুরু ও মনুষ্যগুরু। তিনি অন্তরের আলোক দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। অধোলোক ও ঊর্দ্ধলোক, মার ও ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্য, এমন কি যাবতীয় জীব তাঁহার জানিতে

কিছুই বাকি থাকে না। তিনি নিজে সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করেন। তিনি ধর্ম্মের পূর্ণতা ও পবিত্রতা বিস্তার করেন।" Rhys David's Buddhist Suttas (Sacred Books of the East, Vol. XL.) Tevigga Sutta p. 167.

তিনি সদ্‌গুণের আধার হইয়া "অন্তরের আলোক দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন"—এই হইল প্রকৃত বৌদ্ধ দর্শন। মনুষ্য এই সম্বোধিলাভে যত্নশীল হইবে। প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় উদ্যম করিবে, সৎমতি, সৎউদ্দেশ্য, সৎ-বাক্য, সৎআচরণ, সৎজীবনবার্ত্তা, সৎউদ্যম, সৎমনোনিবেশ এবং সৎধ্যান ও শান্তি এই অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু নিজ বলে চারি অবস্থায় উপনীত হইবে। প্রথম অবস্থা দীক্ষা বা স্রোতাপত্তি, দ্বিতীয় অবস্থা সকৃদাগমী, তৃতীয় অবস্থা অনাগমী, চতুর্থ অবস্থা অর্হৎ।

এই চারি অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই ভিক্ষু "অশেখ" বা ত্রিলোকীর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, ত্রিলোকীর স্বামী হন।

ব্যাসদেব মহাভারতেও এই কথা বলিয়াছেন—

চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচক বহূদকৌ।

হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥ অনু ১৪১—৮৯

কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই জীবন্মুক্ত। বুদ্ধদেবই বলুন আর ব্যাসদেবই বলুন, ইহাই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা। যাহা বেদে আছে, মনুষ্য নিজবলে সম্বোধি লাভ করিয়া বা জীবন্মুক্ত হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

নচিকেতাকে যাহা জানিবার জন্য আগমের শরণ লইতে হইয়াছিল, বুদ্ধদেব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই জন্ম জন্মান্তরের কথা, কর্ম্ম বিপাকের কথা, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ইহা কি মনুষ্যের কম গৌরবের কথা। যদি মনুষ্য সত্য সত্য নিজের প্রকৃত বল বুঝিতে পারে, যদি নিজ বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বকে একবারে জলাঞ্জলি দিয়া নির্ব্বাণের সীমায় পঁহুছিতে পারে, তবে বেদের আর কি প্রয়োজন থাকে?

এই বাক্যে মনুষ্য উত্তেজনাময় উৎসাহে পরিপূর্ণ হয় এবং তাহার শিশু-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য হইতে চেষ্টা করে।

এই হইল দর্শনের এক সীমা। ব্রহ্মবিরহিত জীবের নিজবল পরীক্ষার অবধি। কিন্তু যদি ব্রহ্ম না থাকেন এবং জগতের মূলে ব্রহ্মের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে জীবের নির্ব্বাণ কেবল দুঃখ হইতে পলায়ন এবং নিজের অস্তিত্ব বিলোপ। যেমন এই দর্শনে একদিকে মনুষ্যত্বের মনোহর ছবি, অন্যদিকে তেমনি দায়িত্বরহিত স্বতন্ত্রতা এবং কর্ম্মফলের অনিশ্চিত শাসন। কয় জনের সম্বোধিলাভ হয়? সম্বোধিও ত সাধারণের পক্ষে দেব ও ঈশ্বরের কল্পনার ন্যায় এক অদৃশ্য কল্পনা। এই কল্পনায় বুদ্ধদেবের বাক্য কেবল বেদের স্থান অধিকার করে মাত্র।

এইবার ঘড়ির দণ্ড এক সীমা হইতে অন্য সীমায় চলিল। এই সীমায় আর জীবও থাকিল না, ঈশ্বরও থাকিল না, জগৎও থাকিল না। থাকিল ব্রহ্ম এবং মায়ার মরীচিকা। মায়া এখন আর ব্রহ্মের ইচ্ছা নহে। 'স ঐক্ষত' এ কথা এখন আর ব্রহ্মে প্রযোজ্য নহে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এক নির্গুণ ব্রহ্মকেই স্থাপন করিলেন—আর সকলই মিথ্যা ইহাই উপনিষদ্ বাক্য হইতে নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৌদ্ধ দর্শন বেদান্ত দর্শনকে একবারে উপেক্ষা করিয়া তাহার উপর যে আঘাত করিয়াছিল, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ তাহারই প্রতিঘাত। প্রতিঘাতের পূর্ণ মাত্রায় শঙ্করাচার্য্য কেবল নির্ব্বিশেষ শ্রুতিই গ্রহণ করিলেন। গৌতম বুদ্ধের কেবল জীব, শঙ্করাচার্য্যের কেবল ব্রহ্ম। গৌতম বুদ্ধের বিশ্বব্যাপক সম্বোধি। শঙ্করাচার্য্যের বিশ্বনাশক জ্ঞান। গৌতম বুদ্ধের কেবল কর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্যের কেবল জ্ঞান। এক সীমায় বুদ্ধদেব, অন্য সীমায় শঙ্করাচার্য্য। দুই জনেই ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণ বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

ঈশ্বরের আজ্ঞা বুদ্ধদেবও পালন করিলেন, শঙ্করাচার্য্যও পালন করিলেন। মনুষ্য দুই বিপরীত লক্ষ্য লইয়া ধাবমান হইল। কিন্তু যদিও দেখিতে বিপরীত তথাপি দুই লক্ষ্যই মনুষ্যকে পক্ষসংযুক্ত করিয়া অন্তরের পথে উড়াইয়া দিল, মনুষ্য অনন্তের স্রোতে ভাসমান হইল। একদিকে ধ্যান, অন্যদিকে জ্ঞান। এক দিকে শীল, অন্যদিকে চতুঃসাধন। একদিকে শূন্যের ধ্যান, অন্যদিকে নির্গুণের নিদিধ্যাসন। কিন্তু জীবও শূন্য হইল না, জগতও শূন্য হইল না। জীবও নির্গুণ হইল না, জগতও নির্গুণ হইল না। ব্যবহারিক সত্তাকে অলীক বলিয়া মিথ্যাচার হইল বটে, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বস্তুতঃ অলীক হইল না।

কিন্তু শীল ও ধ্যান, চতুঃসাধন ও নিদিধ্যাসন মনুষ্যের মনকে বিজ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া এক অত্যুচ্চ স্থানে লইয়া গেল। সেই স্থান হইতে মনুষ্যের নিজ বলে নির্ব্বাণ মুক্তি বা জীবন্মুক্তি পাইবার অধিকার হইল।

এইবার গীতার বাক্য বুঝিবার জন্য মনুষ্যের প্রকৃত সামর্থ্য হইল। কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনার আবার সামঞ্জস্য হইল। জীব ও জগতের মূলে এইবার অন্তর্ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মে ব্রহ্মের ইচ্ছা স্থাপিত হইল। আবার উপনিষদের বাক্য সার্থক হইল। আবার গীতার মাহাত্ম্যে জগৎ আলোকিত হইল। পৌরাণিক দর্শনের উৎপত্তি হইল। অভেদের পাশে পাশে ভেদাভেদ ও ভেদ দণ্ডায়মান হইল। রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য মায়া-মরীচিকার মধ্য হইতে পিপাসাতুর জীবের জন্য জলের উদ্ভব করিতে লাগিলেন। সেই জলে পুরাণ সকল অভিষিক্ত হইল।

পৌরাণিক দর্শনকে আমি মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করি। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়া প্রথম ভাগ। মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ লইয়া দ্বিতীয় ভাগ। এবং অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতের সমন্বয় লইয়া তৃতীয় ভাগ। গীতার ঈশ্বর, পরা প্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতিই রূপান্তরিত হইয়া রামানুজের অন্তর্যামী চিৎ ও অচিৎ। গীতার 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' লইয়াই মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, সমগ্র গীতা, সমগ্র উপনিষৎ ও সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের সূত্র লইয়া পৌরাণিক দর্শনের তৃতীয় ভাগ—বৈষ্ণব দর্শন। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগই তৃতীয় ভাগের পূর্ব্ব সূচী। আমি এক্ষণে কেবল তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ বৈষ্ণব দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব দর্শনের মূলে বিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক—

বিষ্ণু শক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে॥

বিষ্ণুর সচ্চিদানন্দময় শক্তি। সেই শক্তি দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এই শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুর অবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সত্তা, সম্পূর্ণ অখণ্ডিত জ্ঞান এবং ছায়ার লেশ রহিত অখণ্ড পরমানন্দ। এই জন্য তাঁহার শক্তি 'পরা'। জীবের খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ শক্তি। তাহার রজোগুণ ও তমোগুণবিদ্ধসত্তা, জরামৃত্যুময় জীবন, তাহার ঝিকিমিকি জ্ঞান, আঁধার মিশ্রিত আলোক, তাহার দুঃখময় আনন্দ, আনন্দময় দুঃখ। জীব ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্র বা শরীর বিশেষ দ্বারা সঙ্কীর্ণ। এই জন্য তাহার শক্তি 'অপরা'।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা এই অপরা শক্তি পরা শক্তিতে পরিণত হয়। পূর্ণ বিকাশ হইলে সৎ শক্তিকে সন্ধিনী, চিৎ শক্তিকে সম্বিৎ এবং আনন্দ শক্তিকে হ্লাদিনী শক্তি বলে।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকা গুণ সংশ্রয়ে।
হ্লাদ তাপ করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে।

এই তিন শক্তি পূর্ণ মাত্রায় একাধারে ভগবানেই থাকে। হ্লাদতাপকর মিশ্র আনন্দ তাঁহাতে থাকে না। অপরা শক্তির অপরত্ব বিনাশের ও পরত্ব লাভের উপায় কি?

"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে।"

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশময় এই জগৎ কর্ম্মস্থল। কর্ম্ম দ্বারা অবিদ্যাদি নাশ করিতে করিতে পরাশক্তি লাভ করা যায়—যোগ নিষ্কাম কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—সকলই কর্ম্মের অন্তর্গত। যত কিছু দর্শন আছে, সকল দর্শনই অবস্থা ভেদে, প্রকৃতি ভেদে এই কর্ম্মের অন্তর্গত।

এই দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝা যায়—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পূর্ণ সফলতা হয়। ব্রহ্মের ইচ্ছা জানা এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আত্মসমর্পণই পৌরাণিক জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনা। সেই আত্মসমর্পণে শক্তির বিকাশ হয় এবং সেবার অধিকতর উপযোগিতা হয়।

পরাশক্তি লাভ কি মুক্তি? পরাশক্তি লাভ কি দুঃখ হইতে পলায়ন? পরাশক্তি কি নিজ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিজে নিজে আনন্দ লাভ?

পৌরাণিক বলেন ইচ্ছা করিলে মুক্তি হয় বটে, কিন্তু পৌরাণিক ভক্ত তাহাকে ঘৃণা করে। মুক্তির ইচ্ছাও তাঁহার কাছে সকামতা বা কৈতব।

তবে পৌরাণিক ভক্ত চায় কি? দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। সে চায় ভগবানের সেবা। 'ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।' ঈশ্বর জীবকলা রূপে আমাদের সকলের মধ্যেই অবস্থিত। এইজন্য জীবের সেবাই ভগবানের সেবা।

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদ ঈশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্॥ ভা, পু ৩-২৯-২৫

'জন্ম ও কর্ম্ম অনুযায়ী ধর্ম্ম আচরণ করা এবং প্রতিমাদিতে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া ঈশ্বর আরাধনা করা মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য নহে। যে কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে নিজের হৃদয় মধ্যে এবং সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত না দেখিতে পাইবে, সেকাল পর্য্যন্তই এইরূপ পরোক্ষ পূজা করিবে।'

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানাং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ ভাঃ পুঃ ৩-২৯-২৭

'যখন ঈশ্বরকে ভূতাত্মা ও ভূত মধ্যে কৃতালয় বলিয়া যথার্থ অনুভব করিতে পারিবে, তখন দান ও মান দ্বারা সকলকে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া সকলের সহিত মৈত্রীভাব করিবে।' ইহাই মৈত্রীমার্গ বা সেবামার্গ।

যাহাকে সেবা করা যায়, তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেবা যতই নিষ্কাম হয়, প্রণয় ততই অকপট ও নির্ম্মল হয়। নিজের প্রাণ দিয়া মাতা পুত্রকে সেবা করেন। এইজন্য মাতৃস্নেহের তুলনা নাই।

মা যেমন আত্মহারা হইয়া ছেলেকে ভালবাসেন, সখা যেমন প্রাণ দিয়া প্রাণ বঁধুকে ভালবাসে, প্রণয়বিহ্বলা রমণী যেমন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আপনার হৃদয় চোরকে ভালবাসে, আমরা জীব সেবা দ্বারা ভগবৎসেবা করিতে করিতে যদি ভগবানকে সেইরূপ ভালবাসিতে পারি, তখন সেই ভালবাসার নাম প্রেম—জগতের দুর্লভ, দেবের দুর্লভ প্রেম। পৌরাণিক দর্শনের সার প্রেম।

এই বঙ্গভূমিতে সেই প্রেম আনিয়া প্রেমরসিক চৈতন্যদেব আপামর সাধারণ জীবকে প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন।

গ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ ঘরে ঘরে হরিনাম দিচ্ছে সর্ব্বজনে॥

উ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ চেতন করান জীবে চৈতন্য নাম দিয়া॥
থ স্থির নাহি রহে প্রভু নয়নের জলে।
দ দীনহীন জনেরে ধরিয়া দিচ্ছে কোলে॥

আমি দীন, অতি দীন। তাই আমার নিকট নরোত্তমদাসের এই চিত্রই দর্শনের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা, জীব, ব্রহ্ম, ও জগতের পরম তাৎপর্য্য। দর্শন ও আগমের ইহাই পরম সমাধান।

দর্শন কেবল তর্কের জন্য নহে, কেবল পূর্ব্বপক্ষ অপর পক্ষের জন্য নহে, কেবল যুক্তির বলে বিতণ্ডার বলে ধূলিজাল বিস্তার করিবার জন্য নহে। নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া। কেবল তর্ক দ্বারা পরম তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। দর্শন সন্দেহ নিরাকরণ দ্বারা, চিত্তের সংযম দ্বারা, চিত্তকে স্থির ও গম্ভীর করিবে। সেই স্থির ও গম্ভীর চিত্তে আপনই তত্ত্ব প্রতিভাত হইবে। দর্শন মনুষ্যকে জীবাত্মার সন্নিহিত করিবে। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার আলোকে জীব পরম তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তখনই দর্শন মনুষ্যের ও মনুষ্য জাতির পরম মঙ্গলের আস্পদ হইবে এবং জগতের মধ্যে শান্তির রাজ্য, সুখের রাজ্য বিস্তার করিবে। ইহাই দর্শনের চরম প্রয়োজন, ইহাই দর্শনের সার্থকতা।

ইউরোপের মহাশ্মশান, জগতের হাহাকার, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বকোলাহল, মানব জাতির মর্ম্মস্পর্শী কাতর রোদন। আজ জগতে ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিন। আশা কেবল ভারতের পুনরুজ্জীবিত দর্শন। আশা কেবল ভারতবাসীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও উদ্বোধন। ভারতের আলোকে জগৎ আলোকিত হউক, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

বিজ্ঞান-শাখার
সভাপতির অভিভাষণ।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান

শিক্ষা জাতীয় জীবন-বিকাশের প্রধান সহায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এই বিকাশের অনুকূল না হইলে জাতীয় জীবন সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতালাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র। শিক্ষার উৎপত্তি বিজ্ঞানে; বিজ্ঞানেই শিক্ষার পরিণতি।

বিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান বা অন্য কোন বিজ্ঞান প্রবন্ধের অন্তর্ভূত বিষয় নহে।

প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া মানুষ পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা ইয়ুরোপের অধিবাসিগণ বহুদিন হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন। জর্ম্মনি এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে জর্ম্মনির বিজ্ঞানলব্ধ বল ও কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর দেশ সমূহ এ সম্বন্ধে যাহার যাহা কিছু অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান বলিতে এখন যাহা আমরা বুঝি, তাহার বিশেষ আদর কোন কালেই ছিল না। সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় একটা প্রবল চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। বহুদিনপূর্ব্ব হইতেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার সম্যক প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল। তাহা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এত দৈন্য, এত দুরবস্থা।
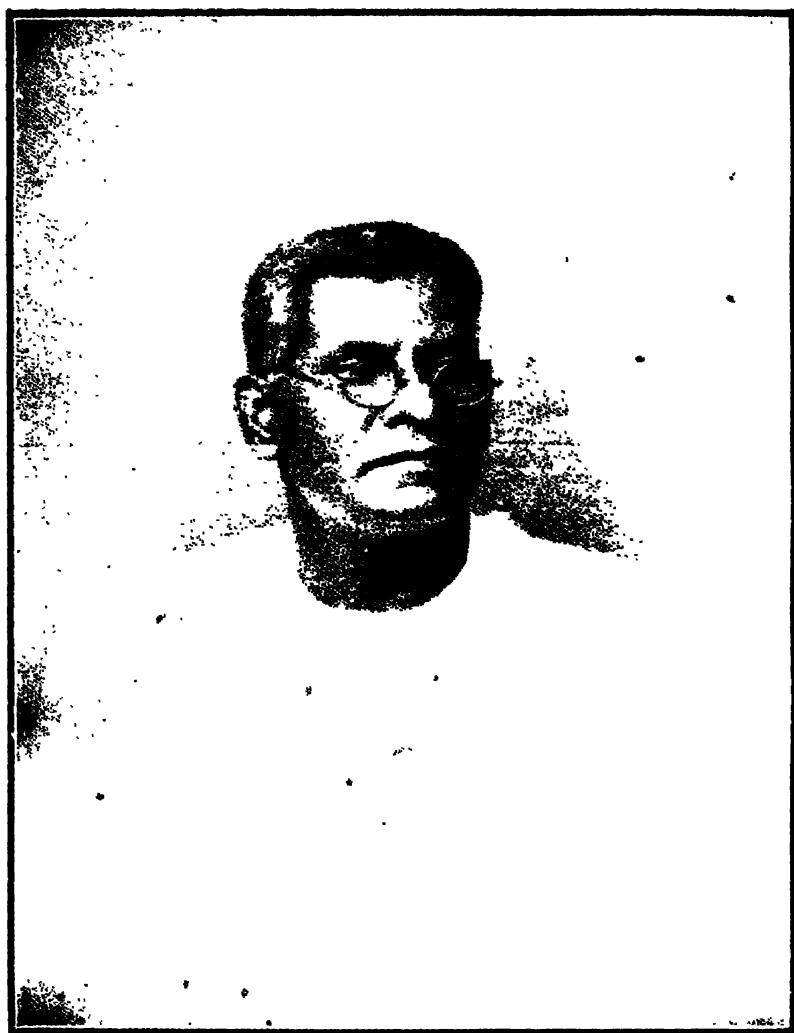
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

এই চেষ্টার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান কঠিন অন্নবস্ত্র-সমস্যাই প্রধানতঃ ইহার মূলে অবস্থিত। এতদিন পরে লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে চাকরি অথবা ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসা দ্বারা মুষ্টিমের মাত্র লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু উক্ত কোটী কোটী ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এখন আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ভারতবাসীর মরা বাঁচা নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে বিষম অন্নবস্ত্রকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে কখন ছিল না। ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যসামগ্রী এদেশে অসম্ভব সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। সেয়ার মুতাক্ষরীণ গ্রন্থের অনুবাদক রেমণ্ড ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে কলিকাতাস্থিত উইলিয়ম্ আর্ম্‌ট্রং নামক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে নবাব মীর কাসিমের শাসনকালে টাকায় দেড় মণ গম, এক মন পঁয়ত্রিশ সের চাউল, আধ মণ তৈল এবং আট সের ঘৃত কলিকাতায় বিক্রয় হইত।*

অতদিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমরাই দেখিয়াছি যে খাদ্যসামগ্রী এরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল না। আমাদের বাল্যকালে দুই টাকা হইতে নয় সিকায় ভাল চাউল, সাড়ে বা টাকায় সরিষার তৈল, ত্রিশ টাকায় ভাল ঘি, দশ টাকায় পুকুরের রুই মাছ, সাড়ে চারি টাকায় ময়দা, আড়াই টাকায় দাইল এবং পাঁচ টাকায় খাঁটী দুগ্ধের মণ কলিকাতায় বিক্রীত হইত। পল্লী-গ্রামে এ সকল জিনিসের দর আরো সস্তা ছিল। এখন কি কলিকাতায়, কি পল্লীগ্রামে, সর্ব্বত্র এই সমস্ত সামগ্রীর মূল্য ৩।৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ সাধারণ লোকের আয় এই হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। ওকালতি প্রভৃতি

* "It is certain also that when Mir Kasem Khan had brought his Government to bear, the country was well-cultivated (in comparison with the population), that we have seen in Calcutta sixty seers of wheat for a rupee, sevetny five of rice, twenty of oil and eight of Ghee" *Modern Review, March, 1922, page 309.*

ব্যবসা যাহা অল্প সংখ্যক লোকের আয় খুব বেশী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবিগণের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক হইলেও, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হিসাবে টাকার মূল্যের হ্রাস হওয়ায় এবং নানা কারণে তাহাদের ব্যয় অধিক হওয়ায়, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, ঋণের দায়ে তাঁহাদের মাথার চুল বিক্রী হইয়া যাইতেছে, মরণের পর তাহাদের পরিবারবর্গ পথে বসিতেছে।

বঙ্গদেশের জমীদারদিগের অবস্থাও সুবিধাজনক নহে। অনেক জমীদারির আয় গবর্ণমেন্টের খাজানা দিতে কুলায় না। তাঁহারা অনেকেই ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত। দশশালা বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও তাঁহারা কেবল খাজানা আদায়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহার সুফল মোটেই লাভ করিতে পারেন নাই। জাত্যভিমান ও পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যদি তাঁহারা আধুনিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যথোচিত উদ্যোগী হইতেন এবং প্রজাগণের উৎপন্ন যাবতীয় কৃষিজাত পদার্থের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিজেরা করিতেন, তাহা হইলে দেশজাত পণ্যের ব্যবসা, বিদেশী বা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের বণিকদিগের একচেটিয়া হইত না; তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রজাগণের গৃহে কমলা চিরদিন অচলা হইয়া থাকিতেন।

দ্রব্য-সামগ্রীর মহার্ঘতা ভিন্ন অপর নানা কারণে আমাদের ব্যয় এক্ষণে অনেক বেশী হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অনুচিকীর্ষা ও আড়ম্বর-প্রিয়তার প্রভাবে আমরা অনেক নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ সকল অভাব অনেকস্থানে কৃত্রিম ও অনাবশ্যক হইলেও অভ্যাসের দোষে এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমরা সে গুলিকে প্রকৃত অভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং তাহার পূরণের জন্য আমাদিগকে অনেক অর্থ অযথা ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশের লোক অনেক সময়ে বিস্তর ঋণ করিয়া বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। অনেকেই সেই ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ইহার ফলে আমরা অবশ্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচ সঙ্কুলান করিতে এবং অবশ্য পোষ্য দুস্থ আত্মীয় স্বজনগণের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে অধিকাংশ গৃহস্থ লোক তাহা বহন করিতে একেবারে অসমর্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য দেশে শিক্ষার ব্যয় আরো অনেক অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সকল দেশ আমাদের দেশ অপেক্ষা এত অধিক সমৃদ্ধিশালী যে তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ের সহিত ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যয়ের তুলনাই হইতে পারে না। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে গড়ে একজন ইংলণ্ডবাসীর আয় একজন ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা দশগুণেরও অধিক।

অর্থাভাবে আমরা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারি না। প্রায় চারি কোটী ভারতবাসীর একবেলার অধিক অন্ন জোটে না। আরো অধিক সংখ্যক লোক কোন প্রকারে অতি কষ্টে দুই বেলা উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্য দিন দিন হীন হইতেছে, তাহাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং নানাবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কত লোক জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হইয়াছে এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের জাতির অস্তিত্ব-লোপের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিতেছেন। ম্যালেরিয়াপীড়িত প্রদেশের কত জমি কর্ম্মিলোকের অভাবে আবাদশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রকোপে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের আয় দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে বিষম অশান্তি তাহার করাল প্রভাব দিন দিন বিস্তার করিতেছে, অন্নবস্ত্রের কষ্ট তাহার একমাত্র কারণ না হইলেও উহা যে একটী প্রধান কারণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মূলে অন্নবস্ত্র-সমস্যা ভিন্ন রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে। আজ শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের

পবিত্র অধিকারপ্রাপ্ত যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ড ভারতবাসীকে বিশেষ অধিকার প্রদান করিলেও, যতদিন তাহাদের এই ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হয়, ততদিন তাহাদের হৃদয় হইতে অসন্তোষের ভাব দূর হইবে না। তদুপরি জাত্যভিমান বশতঃ অনেকানেক ইয়ুরোপীয়ের ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি, বিশ্বাস ও সৌজন্যের অভাব, কার্য্যস্থলে এবং রেলওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের পথে ভারতবাসীর প্রতি অভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি অপর কয়েকটী কারণেও শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত সাধারণ লোকে এখনো রাজনীতির জটিল জালের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বায়ত্তশাসন কাহাকে বলে এবং তাহা লাভ করিলে দেশের ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা বুঝিবার বা তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। বাস্তবিক ভারতীয় সাধারণ প্রজাগণ, কে দেশ শাসন করিতেছে, তাহার সংবাদ কখনই রাখিবার চেষ্টা করে নাই। তাহাদের ভাত কাপড়ের দুঃখ যদি না থাকে এবং তাহাদের ধর্ম্মগত ও সামাজিক ক্রিয়া কলাপে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা চিরদিন স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া যে কোন রাজার অধীনে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমান অসন্তোষ অন্নবস্ত্র-সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আজ যদি কোন উপায়ে চাউল ও কাপড়ের দর কমিয়া যায়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে জনসাধারণের মধ্যে এই অসন্তোষ ও উত্তেজনার বহ্নি এককালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে শান্তভাবে তাহারা পুনরায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে অন্নবস্ত্র সমস্যার একটা সন্তোষকর ব্যবস্থা হইলে দেশের অশান্তি বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এই কঠিন সমস্যা পূরণের জন্য আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় একটা ঐন্দ্রজালিক উপায় আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে। এই সমস্যার পূরণ সময়-সাপেক্ষ এবং ইহার পূরণের একমাত্র উপায়—দেশের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রচার। ইহাই আমার বক্তব্য বিষয়। অদ্যকার অভিভাষণে এই কথা যথাসাধ্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন ভারতবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমরা বাংলার ইতিহাসে পড়িয়াছি যে এ দেশে এক সময়ে এত শস্য উৎপন্ন হইত এবং খরচ বাদে এত শস্য দেশে উদ্বৃত্ত থাকিত যে এখানে টাকায় ৮/ চাউল বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভূমির উর্ব্বরতার হ্রাস, ব্যাধির প্রকোপে কৃষকের সংখ্যার ন্যূনতা এবং তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তির হীনতা, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভ্রাট ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে এখন আর দেশে তত শস্য উৎপন্ন হয় না, এবং বিদেশে শস্যের অবাধ রপ্তানি হেতু, উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, দেশের লোকের পেট ভরিবার মত শস্যও দেশে পাওয়া যায় না। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অর্থনীতি-বিজ্ঞানের রিসার্চ স্কলার ও ইউয়িং ক্রিশ্চান কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দয়াশঙ্কর দুবে এম্ এ মহাশয় জর্ণাল, অব্ ইকনমিক নামক পত্রিকায় ভারতের অন্নসমস্যা (Indian Food Problem) সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ব্রিটিস্ শাসিত ভারতবর্ষের (দেশীয় রাজ্য বাদে) অধিবাসীগণের পেট ভরিয়া খাইবার জন্য ন্যূনকল্পে বৎসরে কত শস্যের প্রয়োজন হয়, বিশেষ অনুসন্ধান ও নানা বিশ্বাস্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি তাহার নির্ণয় করিয়াছেন এবং বিবিধ সরকারি রিপোর্ট হইতে ব্রিটিস শাসিত ভারতে বৎসরে কত শস্য উৎপন্ন হয়, বিদেশে কত শস্যের রপ্তানি হয় এবং বিদেশ হইতে কি পরিমাণ শস্যেরই বা আমদানি হইয়া থাকে, তাহার একটী বিবরণী প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন। যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিস ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ২৪॥ কোটী ছিল। ইহার মধ্যে ৮ কোটী ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের স্বচ্ছন্দে ভালরূপে আহার করিবার সুবিধা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৫ কোটী ৬৯ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের দেশজাত শস্য হইতে যথাপ্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের অসুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার গণনামতে ঐ বৎসর (ইংরাজাধীন) ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের জন্য ১৭৩ কোটী ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে বৎসর ১৪৭ কোটী ৯৬ লক্ষ মণ মাত্র শস্য দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতবাসীর অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা ২৫ কোটী ৭৩ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্য

কম ছিল।* এইরূপে তিনি ১৯১১ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর যে পরিমাণ শস্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবাসীর আহারের জন্য ঐ ঐ বৎসরে যে পরিমাণ শস্যের আবশ্যক ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরেই ২৫ হইতে ৩৬ কোটি মণ শস্যের অকুলান হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে যথা পরিমাণ শস্যের অভাবে শতকরা ৬৪ জন লোক, স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার ও কার্য্যক্ষম থাকিবার জন্য তাহাদের প্রত্যহ যে পরিমাণ শস্যের অবশ্য প্রয়োজন, তাহা তাহারা পায় না, তাহা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ শস্য কম পাইয়া থাকে। ঐ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"From the above study, we are forced to the conclusion that even in the best year from an agricultural point of view (*i, e.* 1916-17) and even with restricted exports of food-grains to foreign countries due to the war, so many as 160 millions of people in that year were in a position to get only 79 percent of the coarsest kind of food-grains to maintain them in health and strength ; and in a famine year (1913-14) the percentage fell to such a low figure as 62, Taking an average of all the seven years (1911—1917), it will be seen that 64.6 percent of the population lives always on insufficient food, getting only about 73 percent of the minimum requirement for maintaining efficiency. In other words, it clearly shows that two thirds of the population always get threefourths of the amount of food-grains they should have."

"The above conclusions are in full accord with the experience of those who have carefully observed the conditions of the living of the Indian masses in their own villages ; and they unmistakbly show, as nothing else can, the urgent necessity of taking in hand, and in right earnest,

the problem of agricultural improvement along right lines, to help the Indian cultivators to raise two blades of corn where one grows now."—*A Study of the Indian Food Problem by Daya Shankar Dubey, M. A.*

যতদিন ইহার প্রতিবাদ না হয়, ততদিন আমরা অধ্যাপক দুবে মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব।

এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন, সুসঙ্গত ও সময়োপযোগী। তিনি বলিয়াছেন যে, যেখানে কৃষকগণ এখন শস্যের একটী মাত্র শীষ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে, সেখানে যাহাতে দুইটী শীষ জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ ভিন্ন এ বিষয়ে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।

ভূমির উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিসাধন, বিভিন্ন প্রকার "সার" প্রস্তুত ও তৎ-প্রয়োগসম্বন্ধে জ্ঞান, বীজের উন্নতি এবং বিবিধ ব্যাধি ও কীটাদি শত্রুর হস্ত হইতে শস্য ও বীজরক্ষা, ভূমিকর্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন, ক্ষেত্রে জল-সেচনের সুব্যবস্থা, পর্য্যায়রোপণ, অল্পজমিতে অধিক শস্যের উৎপাদন, নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বারা দেশজাত ফল শস্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রয়োজনীয় বিদেশী উদ্ভিদের প্রজনন ইত্যাদি কৃষি সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। গতানুগতিক ভাবে কার্য্য করিলে আমরা এ বিষয়ে কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিব না।

যাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের কৃষকগণের কৃষিসম্বন্ধে শিক্ষা করিবার বিষয় কিছুই নাই, আমি তাঁহাদের মত ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে কৃষিকার্য্য করিয়া ভারতের বাহিরের অনেক দেশ অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহামতি বার্ক্ আমেরিকার সহিত পুনর্ম্মিলনের আবশ্যকতা দেখাইয়া নূতন মহাদেশের কৃষিসম্পদের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"I now pass to the Colonies in another point of view, I mean their agriculture. This they have prosecuted with

such vigour that, besides feeding plentifully their own growing multitude, they exported 20 millions tons of rice to the motherland. England would have suffered from a desolating famine had not this child of her old age, with a truly Roman charity, but her useful breast into the mouth of her exhausted parent."—*Burke's Speech on The Reconciliation with America.*

এই উক্তির পর প্রায় ১৫০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বার্কের সময়ে কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব বেশী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা কেবল বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই সকল দেশের নিকট ভারতবর্ষের এ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার যথেষ্ট অবসর আছে। অষ্ট্রেলিয়া পশুপালন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাংসের সরবরাহ করিতেছে। মাংসের জন্য তাহারা যত পশু মারিতেছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে পশুপালন করিয়া পশুর সংখ্যা তাহার দশগুণ বৃদ্ধি করিতেছে। আমেরিকায় এত ফল ও শস্য উৎপন্ন হয় যে প্রয়োজনমত খাদ্যসামগ্রী দেশে রাখিয়া ঐ দেশ অর্দ্ধেক জগতের খাদ্যের অভাব মোচন করিতেছে। হলণ্ড, ডেন্মার্ক প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে কৃষিকার্য্য ও গোপালন করিয়া কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধ-মাখন ইত্যাদি উৎপাদন সম্বন্ধে অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছে। আমরা এ সকল সংবাদ জানিয়াও যদি বলি যে ভারতবাসী কৃষকদিগের, কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই শিখিবার নাই, চিরদিন যে প্রণালীতে তাহারা কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল, তাহা হইলে আমাকে বলিতে হয় যে আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ এবং আমাদের উন্নতিশীল অন্য জাতির সমকক্ষ হওয়া, এখনো বহুদিন সাপেক্ষ।

বোম্বাইয়ের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার কীটিঙ্গ সাহেব সম্প্রতি এ দেশের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি লিখিয়াছেন যে, যদিও বোম্বাই প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে বেশী জমি চাষ করা হইতেছে এবং ঐ প্রদেশের প্রায় সমস্ত পতিত জমীর উদ্ধার হইয়াছে তথাপি কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বিঘা প্রতি কিছুমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়

নাই। তিনি আরো বলেন যে যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালী সামান্য ভাবেও প্রয়োগ করা গিয়াছে, সেইখানেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কিছু বেশী দেখা গিয়াছে। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"It is disappointing to have to record at the outset that no general or striking progress, comparable with other lands, has occurred. Statistical information, for instance, does not prove that the outturn of any particular crop per acre has increased by a definite percentage. On the other hand, a steady increase in cultivation has taken place during the last 30 years, until at present, there is no land fit for cultivation which is not occupied and the value of agricultural land has largely increased. So also has the value of the produce. More irrigation-wells are in use and rainfall is sometimes carefully caught. Yet it must be admitted that the existing methods of agriculture, sometimes skilful, sometimes careless, usually unnecessarily laborious, show little change or progress."

"There are nevertheless certain improvements which have slowly and in some cases almost imperceptibly been adopted, instances being the introduction of iron ploughs in place of the old wooden ones and progress also in matters relating to seed, manure and the prevention of plant diseases. It may be pointed out that the pargress here achieved has been due to the influence of "scientific propaganda." *Agricultural Progress in India by G. Keatinge*, I. C. S., C. I. E.

কৃষকগণকে "হাতে কলমে" উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিখাইতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" স্থাপন করিতে হইবে। সকল প্রদেশেই স্থানেস্থানে গভর্ণমেণ্ট কয়েকটী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আদর্শ কৃষিক্ষেত্র

সংস্থান করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সাধারণ কৃষকগণ এই সকল স্থানে আসিতে সহজে স্বীকৃত হয় না এবং অনেক স্থানে তাহা সম্ভবপর নহে। তদুপরি এখানে খরচ বেশী হয় বলিয়া ঐ সকল প্রণালী অবলম্বন করা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। ৭।৮ খানি গ্রাম একত্র করিয়া তাহার মধ্যে যদি এক এক খানি ছোট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা যায় এবং কৃষকদিগের অবস্থা বুঝিয়া অল্প খরচে তথায় হাতে কলমে উন্নত প্রণালীতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক কৃষকই ইহাদ্বারা লাভবান হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। নব প্রতিষ্ঠিত ভিলেজ (ইউনিয়ন Village Union) গুলি এই কার্য্যের ভার লইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। "সার", কৃষিযন্ত্র, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইতে যাহাতে কৃষকেরা সহজে ও অল্প খরচে পাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন; তাহা না হইলে তাহাদের শিক্ষা তাহারা কাযে লাগাইতে পারিবে না। বীরভূম জেলায় এই ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহার বিশেষ সুফল দেখা গিয়াছে। অন্যান্য জেলার লোকের বীরভূমের আদর্শ অবলম্বনপূর্ব্বক এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা যে গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা নহে; এ বিষয়ে দেশের জমীদারদিগেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। এদেশের জমীদারগণ প্রজাগণের প্রকৃত নেতাস্বরূপ। প্রজাদিগের শিক্ষা, সাংসারিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্রসম প্রজাগণের হিতার্থে যাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এতদিন তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। অনেক জমীদার জমীদারি ছাড়িয়া সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সহরে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া থাকেন; প্রজাদিগের অবস্থা ও তাহাদের সুখ দুঃখের কথা স্বচক্ষে দেখিবার এবং স্বকর্ণে শুনিবার অবসর তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। আজ স্থানে স্থানে প্রজাগণ জমীদারদিগের বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইতেছে, তাহার জন্য জমিদারগণই প্রধানতঃ দায়ী। এখনো যদি তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে বিরোধ দূর হইয়া উভয় পক্ষের এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়সমূহে কৃষিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ের নিকটে জমী লইয়া প্রত্যেক কৃষক বালককে উন্নত প্রণালীতে নিত্যব্যবহার্য্য ফসলের "পাঠ" হাতে কলমে শিখাইয়া দিতে হইবে, তাহাদিগের জন্য যথোচিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটু চেষ্টা ও সামান্য অর্থ খরচ করিলেই পল্লীগ্রামের নিম্ন ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষা সুচারুরূপে প্রদত্ত হইতে পারে। বঙ্গদেশের অনেক প্রবেশিকা বিদ্যালয়ও এই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।

আজকাল জীবিকানির্ব্বাহপযোগী শিক্ষা (Vocational education) সম্বন্ধে দেশের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্ চ্যান্সলার মাননীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষাবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বাংলার সমগ্র প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের কমিটীর অধ্যক্ষগণের একটী সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা যে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হইতেছে এবং জীবন-সংগ্রামের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপায় হইতেছে না, সে বিষয়ে সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে মত-ভিন্নতা ছিল না। এই সমিতির সভাপতি সার্ আশুতোষ বলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা বালকদিগের মতিগতি কেবল চাকরির দিকেই ধাবিত হইতেছে। চাকরির বাজার যেরূপ, তাহাতে যাহারা এম্ এ পাশ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। বালকগণ স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা জানে না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রশস্ত পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের ছাত্রগণকে কেবল পণ্ডিত মূর্খ করিলে চলিবে না; লেখাপড়ার সহিত তাহাদিগকে হাতে কলমে জীবিকা-নির্ব্বাহপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে।*

---

* "What is the mental attitude of the students at the presnnt moment.' *Service* and nothing else. The market value for Matriculation is Rs. 15 or 20, for the Intermediate Rs 25 or 30, for the B. A. Rs 40, for the M. A. Rs 50, 60, or 70. They are not able to take care of themselves. Eduction has been purely literary. It does not fit them even to get a "service." It is not for a moment too erly to give our students this composite training—*literary plus vocational.—Sir Asutosh Mookerjee's speech on 12 th june. 1921.*

যে দুইটী প্রধান বিষয় এই সমিতির আলোচ্য ছিল, তাহার একটী (১) প্রবেশিকা বিদ্যালয়সমূহে কোনরূপ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচলন,—এবং অপরটী—(২) সাধারণ শিক্ষার সহিত কোন না কোনরূপ জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। সমবেত সভ্যগণ সকলেই প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোন না কোনরূপ শিক্ষাপ্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৮৮৫ প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪৭১টী বিদ্যালয় এখনই কোন না কোনরূপ বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা প্রচলন করিতে প্রস্তুত; অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি অর্থের সুবিধা হইলেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ৮৮৫টী বিদ্যালয়ই অবিলম্বে সামর্থ্যানুযায়ী কোন না কোনরূপ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই দুইটী বিষয় ছাড়া, (৩) ইংরাজী ভাষাব্যতীত অপর সকল বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা ছাত্রের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া হওয়া সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হইয়াছিল। দুই চারিটী বিদ্যালয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে দেশের লোকে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছে এবং আমাদের দেশের ছাত্রগণের বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে ছাত্রদিগের মধ্যেও বিদ্রোহভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে পল্লীগ্রামের অনেকানেক বিদ্যালয় কৃষিশিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমাদিগের কর্ম্মজীবন নূতন পথে চালিত হইবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐকান্তিক চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা আবার মানুষ হইয়া উঠিতে পারিব।

কিন্তু কেবল সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আশানুরূপ ফললাভ হইবে না। এই শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক। পুণা, পুসা, সায়র প্রভৃতি স্থানে কৃষিশিক্ষার জন্য

কয়েকটী কলেজ ও স্কুল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন. কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এতদিন এই সকল বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ সহজে প্রবেশ করিতে স্বীকার পাইত না। জাত্যভিমান ও বংশমর্যাদাবশতঃ উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকে বালকগণকে কৃষিশিক্ষার জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আপত্তি করিতেন। কালের ও অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবসা, কৃষি বা পরিশ্রমের কোন কার্য যে অসম্মানসূচক নহে, ইহা অনেক লোকের ধারণা হইয়াছে। জীবিকা-অর্জ্জনের সমস্যা যতই কঠিন হইতেছে, দেশের মধ্যে শিক্ষা যত অধিক পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে, এ সম্বন্ধে অভিমান ও কুসংস্কার লোকের হৃদয় হইতে দিন দিন ততই দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রে (Experimental Farm) ধান্য, ইক্ষু, তুলা, গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন বিবিধ 'সার' সংযোগে, যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দেশের লোক যাহাতে বিস্তৃত ভাবে জানিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করার বিশেষ আবশ্যক। আমাদের দেশে এখন স্থানে স্থানে কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপলক্ষে দেশের ফসল, এবং কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পজাত পদার্থ এবং গোমহিষাদি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ, বিবিধ কৃষিযন্ত্র, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতি সাধারণের গোচর করিবার জন্য এই স্থানে আনয়ন করেন। লোক-শিক্ষার ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। সেদিন রাঁচিতে এইরূপ একটী কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিহার গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত কাঁকে কৃষিক্ষেত্র হইতে ইক্ষু, গম, তুলা, গুড় প্রভৃতি বিবিধ কৃষিজাত পদার্থ এবং উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত কৃষিযন্ত্র এই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনেক কৃষককে কৃষিকার্য্য ও গোমহিষাদি পালনে দক্ষতা দেখাইবার জন্য বিস্তর নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। আমি এই প্রদর্শনীর কার্য্য দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। এই সকল স্থানে অনেক কৃষক একত্রে সমবেত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

গভর্ণমেণ্টের দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে কৃষিশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে

অধিকতর মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যেমন্ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে আয়ব্যয় তালিকা (Budget) সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণী পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্ব বৎসরে কৃষি বিভাগের উন্নতির জন্ত যে টাকা বজেটে মঞ্জুর ছিল, গভর্ণমেন্ট তাহা খরচ করেন নাই। ধান ও পাটের উৎকৃষ্ট বীজ কৃষকগণকে সরবরাহ করিবার জন্ত বজেটে ৬৬০০০্ টাকা এবং নূতন আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের বাবদে ৫০০০্ টাকার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কৃষি বিভাগের মন্ত্রী সে টাকা ঐ বৎসরে একেবারেই খরচ করেন নাই। কেন যে খরচ করা হয় নাই, তাহার কারণ জানিতে পারা যায় নাই। ঐ বৎসরে ঐরূপ খরচের আবশ্যক ছিল না, এ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বরং এ সকল বিষয়ে আরো বেশী খরচের প্রয়োজন, ইহাই আমাদের ধারণা। এ সম্বন্ধে অস্তুতর সদস্ত কর্ণেল পিউ যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Under agricultural experiments, we gave Rs. 66000 to the Minister for provision for the distribution of improved paddy and jute seeds. Not a single pice seems to have been spent. We gave him at his special request Rs. 5000 for provision of the establishment of five new farms. Not that nothing has been done or spent, but the Minister seems to have abandoned the idea of having any more new farms, for he has asked for no provision in the Budget".—*Col. Pugh's speech reported in the Indian Daily News of 27. 2. 22.*

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনে এক একটি কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং কৃষি শিক্ষায় পারদর্শী ছাত্রগণের জন্ত বি এস্ সি প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভের ব্যবস্থা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কৃষি-বিদ্যার সহিত পশুপালন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত। ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য গো-মহিষাদির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এদেশের অধিকাংশ স্থানেই এই সকল পশুদিগের শারীরিক দুরবস্থা ও জাতিগত অবনতি

পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বাহিরে অনেকানেক দেশের গোধন এদেশ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক। পশুদিগের শারীরিক দুরবস্থার প্রধান কারণ যে কৃষকদিগের দারিদ্র্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কারণও ইহার মূলে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। পশুপালন একটী বৈজ্ঞানিক বিষয়। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এ বিষয়ে যথারীতি শিক্ষা দিবার জন্য বিস্তর স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি গো-মহিষাদি পশুগণকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে এবং বহু সংখ্যক পশু এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। গো-মহিষাদির সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাহাদিগের আরোগ্য করে এবং সুস্থকায় পশুগণকে ঐ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, আমাদের দেশের কৃষকগণ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে। সুতরাং কোনরূপ গো-মড়ক উপস্থিত হইলে তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত ভেটেরিনারি স্কুল ও কলেজ দ্বারা এই বিপদ নিবারণকল্পে বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছে। পশুচিকিৎসা শিখিবার স্কুল ও কলেজ আমাদের দেশে আরও বেশী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক লোক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলে দরিদ্র ভারতবাসীর একমাত্র সম্বল গোধন অকালমৃত্যু এবং জাতিগত ও স্বাস্থ্যের অবনতি হইতে রক্ষা পাইবে।

গোজাতির জাতিগত উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, বংশবৃদ্ধি, তাহাদের খাদ্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় পশুপালনের অন্তর্ভূত এবং প্রত্যেকটির উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই শিক্ষা দেশের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

দুগ্ধ এবং দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতাদি ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। গোজাতির সংখ্যার হ্রাস স্বাস্থ্যের অবনতি এবং অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান সময়ে দেশে দুগ্ধের বিশেষ অভাব হইয়াছে। সহর অঞ্চলে খাঁটি দুগ্ধ প্রায় মিলে না মিলিলেও তাহা এত মহার্ঘ যে সামান্য অবস্থার লোক তাহা ক্রয় করিতে একেবারেই অসমর্থ। দুগ্ধের অভাবে আমাদের দেশের লোক দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইতেছে। বড় বড় সহরে দুগ্ধের অভাবেই শিশুদিগের অকালমৃত্যু একটী অন্যতম কারণ। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শিশুর জন্মগত দৌর্ব্বল্যের

কুফল জাতিজীবনে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই একই কারণে দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ঘৃতাদি পদার্থ সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্ত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দুগ্ধ-সমস্যা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্য কারবার রূপে দেশের নানাস্থানে ডেরি (Dairy) স্থাপিত না হইলে এ দেশে দুগ্ধ সমস্যার সন্তোষকর পূরণ সম্ভবপর নহে। দুগ্ধ কেবল খাঁটি হইলেই চলিবে না, উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

অন্যান্য দেশে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্য সমবায়প্রণালী মতে (Co-operative system) সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। সমবায় প্রণালী মতে অল্প সুদে অর্থ সাহায্য করিয়া মহাজনের কবল হইতে শিল্পজীবি ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দেশে অনেক স্থানে ব্যাঙ্ক্ স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রণালী মতে কার্য্য সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। দেশের সাধারণ লোক ইহার উপকারিতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে এবং ইহা অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিশেষভাবে সুফল প্রসব করিয়াছে। কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে সমবায় প্রণালী আমাদের দেশে যাহাতে বিস্তৃত ভাবে অবলম্বিত হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া ও সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য দেশে সমবায়প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার বিশেষ আবশ্যক।

বস্ত্র-সমস্যা সমাধানও কৃষির উপর সবিশেষ নির্ভর করে। দেশের সাধারণ লোক তুলা ও পাট নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। বড় লোকে রেসম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্র সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুলা, পাট, শণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা কৃষিজাত। রেসম প্রস্তুতও কৃষি-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত এবং পশম সংগ্রহের জন্য পশু পালন করিতে হয়। ভারতবর্ষে সচরাচর যে তুলা জন্মে, তাহার আঁইস বড় নহে। বড় আঁইসের তুলা গভর্ণমেন্টের কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সুন্দর ভাবে জন্মিতেছে এবং দেশের স্থানে স্থানে উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার তুলার চাষ এ দেশে বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হওয়ার প্রয়োজন।

পাট বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন সুন্দর ভাবে জন্মায় না। পাটের ক্রয়-বিক্রয় যদি বাঙ্গালী নিজ হাতে গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাটের চাষে বাংলায় সোণা ফলিতে পারে। যাঁহারা পাটের চাষ কমাইতে অথবা উহা তুলিয়া দিতে বলেন, আমি তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। বিদেশী বণিক সম্প্রদায় পাটের ব্যবসায়ে লাভবান হইতেছে বলিয়া উহার নিবারণ কল্পে পাটের চাষ তুলিয়া দিলে আমরা ইচ্ছা করিয়া আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিব। তবে পাটের ক্রয়-বিক্রয় যতদূর সম্ভব, বাংলা-দেশের লোকের হাতে থাকা উচিত। দেশের জমীদারগণ চেষ্টা করিলেই পাটের ব্যবসা বাঙ্গালীর একচেটিয়া হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্র ব্যবহার লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে একটী বিষম আন্দোলন চলিতেছে। ১৯০৬ সালের বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইতেই ইহার উৎপত্তি। তখন এই আন্দোলন বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান অসহযোগিতা প্রচারের ফলে ভারতের সর্ব্বত্রই আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য দেশে একটা বৃহৎ চেষ্টা ও উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গ হইয়া মহা অনর্থপাতও হইতেছে। আমরা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু জোর করিয়া বা সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইয়া লোককে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এ বিষয়ে লোকের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত সুবিধার উপর নির্ভর করিতে চাহি। আমাদের বিশ্বাস যে কেবল বলপ্রয়োগ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া অথবা বিদেশী বস্ত্র অগ্নিসাৎ করিয়া কেহ কখন স্বদেশী বস্ত্র চালাইতে সক্ষম হইবে না। বঙ্গদেশে "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। স্বদেশী বস্ত্র বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা সস্তা বা সমান দরের না হইলে জনসাধারণে উহা স্বেচ্ছায় ক্রয় করিতে সমর্থ বা স্বীকৃত হইবে না। বৎসরে দেশে যত কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম কাপড় ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে, এবং যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার মূল্য বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক। যতদিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র দেশে প্রস্তুত এবং তাহা বিদেশী বস্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথবা তুল্যদরে বিক্রীত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত কেবল স্বদেশ-বৎসলতার জন্য দেশের

সাধারণ লোকে সস্তা বিদেশী বস্ত্র কখনই বর্জ্জন করিবে না।

অসহযোগী সম্প্রদায় স্বদেশী সূতার "খদ্দর" প্রস্তুত করিবার জন্য ঘরে ঘরে চরকা চালাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং উহার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন, তাহা কল্যাণপ্রদ হইলেও আমাদের বিশ্বাস যে তদ্বারা সমগ্র দেশের বস্ত্রের অভাব কখনই মিটিতে পারে না। অবশ্য বহুদিন পূর্ব্বে দেশে চরকার বিস্তৃত প্রচলন ছিল এবং চরকার কাটা সূতা এবং হাতের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের দ্বারা দেশের সাধারণ লোকের বস্ত্রের অভাব মোচন ও জীবিকা-নির্ব্বাহের সুবিধা হইত কিন্তু এখন আর সেকাল নাই। এখন দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, নানাদিকে কর্ম্মজীবনের বহুল বিস্তৃতির সহিত আমাদের বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাঁতিদিগের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, বহুসংখ্যক তাঁতি জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। দেশে এখন অতি অল্প সূতাই প্রস্তুত হয়; যাহা হয়, তাহাতেও ভাল কাপড় তৈরি হয় না, সুতরাং বিদেশ হইতে সূতা আমদানি করিয়া হাতে ও কলে অধিকাংশ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এখন চরকার সূতায় এবং হাতের তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশের সমস্ত অভাব দূর করিবে, ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হয়। অসহযোগিগণ বিদেশী সূতায় প্রস্তুত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কলের বস্ত্রেরও ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এক চরকার দ্বারাই ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে। আমরা তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করি না। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল চরকা চালাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে হয় ত দেশে যথেষ্ট সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নহে। অপরন্তু আজ কালকার দিনে চরকা এবং হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কখনই টিকিতে পারিবে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে চরকার এবং দেশীয় তাঁতিদের ব্যবসায়ের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না।

ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভাবে ভাল তুলার চাষ হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস যে অধিকসংখ্যক কাপড়ের কল ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদিগকে চিরদিন লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। কেবলমাত্র চরকা চালাইয়া এবং হাতের তাঁতের সাহায্যে আমাদের

দেশের বস্ত্রের দুঃখ কখনই ঘুচিবে না। এ কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা চর্‌কার পুনঃ প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। চর্‌কার প্রতিষ্ঠার দ্বারা বস্ত্রের অভাব যে কতকপরিমাণে দূরীভূত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরন্তু ইহা দ্বারা সামান্য অবস্থার গৃহস্থের আয়ের অনেক সুবিধা হইবে, বিস্তর নিরাশ্রয়া বিধবার অন্নের সংস্থান হইবে, অনেকানেক ভদ্রপরিবারের মহিলাগণ যে সময় আলস্য বা বৃথা আমোদে নষ্ট করেন, চর্‌কা কাটিয়া তাহার সদ্ব্যবহার, দীন দুঃখীদিগের বস্ত্রের সংস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন। দেশে চর্‌কা চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। এই কার্য্যের জন্য স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কেবল চর্‌কা কাটিতে হইবে, এ প্রস্তাবও আমরা যুক্তিসঙ্গত এবং কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। চর্‌কা-কাটা অন্যতম "কটেজ্ ইণ্ডষ্ট্রী" রূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে দেশের সবিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের অনেক অনাবশ্যক অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য এবং অনাবশ্যক অভাব যত পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল অভাব একেবারে উপেক্ষা করিবার আর উপায় নাই। অভ্যাসদোষে সেগুলি আমাদের জীবনের সাথী হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য যাহাতে দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার জন্য যে সকল কল কারখানার প্রয়োজন এবং তাহা চালাইবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক, ভারতবর্ষে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন কেবল তাহার অধিক প্রসারণ আবশ্যক। নতুবা সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেবল চর্‌কার প্রচলন দ্বারা আমরা দেশের বস্ত্র দারিদ্র্য ঘুচাইতে কখনই সমর্থ হইব না।

তাঁতের কায শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট শ্রীরামপুরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ছাত্রগণ হাতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য সুন্দর ভাবে শিক্ষা করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ হাতে বস্ত্র বুনিবার উন্নত প্রণালীর তাঁত প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিয়াছেন। দেশের স্থানে স্থানে এই নূতন তাঁত বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত

ছাত্রগণ অনেক স্থানে শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন। স্থানে স্থানে সমবায়-প্রণালী মতে তাঁহাদিগকে এই তাঁত ও সূতা সরবরাহ করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা তাহাদের উপার্জ্জন সম্বন্ধে সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম হইবে।

শুদ্ধ কৃষিকার্য্যের দ্বারা ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিবে না। ইহার উন্নতি ব্যতীত দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও নানাবিধ শিল্পের (Industry) বিস্তৃত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এইখানেই বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সহিত আমাদিগের বিষম প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইবার কথা। বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকের সম্পূর্ণ করায়ত্ত, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বড় বড় সওদাগরী অফিস্ অধিকাংশই বিদেশীয় মূলধনে স্থাপিত এবং বিদেশীয় অধ্যক্ষতায় পরিচালিত। বোম্বাই প্রদেশে আমরা এ বিষয়ে কতকটা স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেখানে সম্ভ্রান্ত ক্রোরপতি ভারতবাসী ব্যবসাদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বোম্বাইয়ের তুলনায় এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্প শিক্ষার জন্য নূতন প্রকার শিক্ষার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য কমার্সিয়াল স্কুল ও কলেজ এবং শিল্প শিক্ষার জন্য টেক্‌নিকাল্ স্কুল্ ও কলেজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এত দিন দেশের লোক এরূপ শিক্ষালাভ করিতে এক প্রকার উদাসীন ছিল। উচ্চ বর্ণের ও ভদ্র পরিবারের বালকগণের কোনরূপ ব্যবসা বা শিল্প কার্য্য করা অপমানসূচক বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। জীবিকা-সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হওয়াতে এ সম্বন্ধে লোকের ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ভারতের সর্ব্বত্র ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এখন দেশের শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দেশের শিক্ষা-পরিষদসমূহে ইহার সূচনা দেখা যাইতেছে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যবসা ও শিল্প শিক্ষা এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রগণকে উচ্চ উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্রের প্রবেশ করা সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত নহে।

সুতরাং দেশের যে সকল স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা আছে, তথায় এই শিক্ষার জন্য কতকগুলি স্কুল স্থাপন করিলে অনেক ছাত্র তথায় হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। গ্লাশাঙ্গাল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনের অধীনে কলিকাতা মাণিকতলায় যে টেক্নিকাল্ স্কুল্ স্থাপিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কায সুন্দরভাবে চলিতেছে। বঙ্গমাতার সুসন্তান স্বর্গগত সার্ রাসবিহারী ঘোষ এই স্কুলের উন্নতির জন্য ১২ লক্ষ টাকার বিষয় দান করিয়া গিয়াছেন। স্থানাভাবে অনেক ছাত্র এই স্কুলে প্রবেশ করিতে পায় না। বঙ্গদেশে এরূপ স্কুল্ দশটি হইলেও দেশের অভাব তাহাতেও মিটিবে না। এইরূপ স্কুলের অভাব আছে বলিয়াই আমাদের ছাত্রগণ অগত্যা উপাধি লাভের জন্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক সংখ্যায় আসিতে চায়, কিন্তু ঐ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার শক্তি অনেকেরই নাই, এবং যাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই কলেজে প্রবেশ না করিয়া এই সকল শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথও সুগম হইবে।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী টেক্নিক্যাল্ স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার জন্য ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের অর্থের যেরূপ অনাটন, আমাদের আশঙ্কা হয় ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সময়সাপেক্ষ। এবিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সত্বর যাহাতে এই শিক্ষাগারটী স্থাপিত হয়, তজ্জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ব্যবসা স্থলে এবং কলকারখানায় শিক্ষানবীশি (Apprenticeship) ব্যতীত ব্যবসা ও শিল্পকার্য্যে সাফল্যলাভের অন্য উপায় নাই। এ বিষয়েও অনেক বাধা বিপত্তি রহিয়াছে। ইয়ুরোপীয় ব্যবসাদারগণ এবং কলকারখানার অধ্যক্ষেরা সহজে আমাদের ছাত্রগণকে তাঁহাদের অফিসে বা কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না। বিলাতেও আমাদের ছাত্রগণের কলকারখানায় প্রবেশ করিবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষার পথে যে ইহা একটা প্রধান অন্তরায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কি উপায়ে এই প্রতিবন্ধক দূর হইতে পারে, বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়।

ব্যবসায়িক প্রাধান্য রক্ষা, ব্যবসা-সঙ্কেত গোপন রাখিবার ইচ্ছা এবং বর্ণ বিদ্বেষ, এই প্রতিবন্ধকতার মূলকারণ হইলেও, যদি ইংরাজ ও ভারতবাসিগণের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব না হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে সুবিধা হইতে পারে। ইহা দ্বারা দেশে বিষম অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ভিন্ন ভারতবর্ষ কখনই নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারিবে না, চিরদিনই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাশ্চাত্য জাতিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদিগের গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহাদের নিকটে অবনত মস্তকে শিক্ষা উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। জাপান এই উপায় অবলম্বন করিয়া ৫০ বৎসরের মধ্যে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদেরও এ বিষয়ে জাপান প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। অন্য উপায় নাই। জাপান অনেক হীনতা দীনতা স্বীকার করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের গূঢ় রহস্য আয়ত্তাধীন করিয়া নিজ দেশে ঐ সকল জ্ঞান-শিক্ষার পীঠ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদিগকেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত অসদ্ভাব করিলে আমাদিগকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, বিদেশে আমাদের ছাত্রগণের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব এই জাতি-বিদ্বেষ যাহাতে কমিয়া যায়, যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে উহার তীব্রতার হ্রাস হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা এবং ঐ সকল উপায় অবলম্বন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয় হউন আর ভারতবাসীই হউন, যিনি বাক্য বা কার্য্য দ্বারা এই বিদ্বেষবুদ্ধির সহায়তা করিবেন, তিনি কখনই দেশের প্রকৃত বন্ধু নন।

পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বথা হীনতা স্বীকার করিয়া অর্জ্জন করা আমার অভিপ্রেত নহে। আত্মসম্মানবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ন্যায়সঙ্গত আদান প্রদান দ্বারা এই জ্ঞানের অর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক মনস্বী পণ্ডিত দিন দিন (বিশেষত বিগত যুদ্ধের অবসানে) ভারতীয় সভ্যতার পক্ষপাতী হইতেছেন। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার মূলে তাহারা এমন একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আধ্যাত্মিক

সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার সংযোগে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস এবং তাহা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, কবিসম্রাট রবীন্দ্র নাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু আলোক দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আর্য্যঋষিগণের আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান আমেরিকায় প্রচার করিয়া অনেকানেক ধনকুবের আমেরিকাবাসীকে বিষয়চর্চ্চার সময় সংক্ষেপ করিয়া বেদান্তচর্চ্চায় মনঃসংযোগ করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের অপার্থিব কাব্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ ভারতবর্ষকে নূতন ভাবে প্রেম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারই ফলে ফরাসী আচার্য্য সিলভা লেভির ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্র নাথের "বিশ্বভারতীর" পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র, যোগবলে উপলব্ধ আর্য্যঋষি প্রচারিত বিশ্বব্যাপী জীবন-রহস্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রমাণীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। যদি আমরা ইয়ুরোপ ও আমেরিকাকে প্রাচীন ভারতের কাব্য দর্শন ও মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় অমূল্য অমূপমেয় রত্নরাজি প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকট হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানে দাবী করিবার আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আমার বিশ্বাস, আমাদের এ দাবী অগ্রাহ্য হইবে না। ব্যবসাপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতি দৈন্য ও ভিক্ষার বিরোধী কিন্তু ন্যায়সঙ্গত আদান প্রদানের পক্ষপাতী। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এই মহাকর্ত্তব্য উপস্থিত। প্রাচীন ভারতের অমূল্য জ্ঞানরত্ন সময়োচিত বেশভূষায় সজ্জিত এবং পাশ্চাত্য জগতের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিতে তাঁহারাই কেবল সমর্থ। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা দেশের লোকের "হাতে কলমে" বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেশে অন্নবস্ত্র-সংস্থানের অন্যতম উপায় স্বরূপ হউন।

এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য আমাদের যুবকগণকে দলে দলে ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে যাইতে হইবে। এই সকল দেশে যাইলে

জাতি যায়, এই কুসংস্কার সমাজ হইতে একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য সকল প্রকার সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন করিয়া দেশ-মাতৃকার কল্যাণে অর্পিতদেহ বিলাত প্রত্যাগত এই সকল যুবককে সাদরে ও সস্নেহে সমাজের বক্ষে স্থান দিতে হইবে।

কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সমিতি (Scientific Advancement Association) দ্বারা এ সম্বন্ধে দেশের অনেক উপকার করিতেছেন। ঐ সভা প্রতিবৎসর কতিপয় ভারতীয় যুবককে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়া ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে পাঠাইতেছেন। এই সকল ছাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দুই চারিটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেকে কল কারখানায় ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতেছেন। যাঁহারা বলেন যে আগে দেশে কলকারখানা স্থাপিত হউক, তারপর দেশের লোক বিলাত যাইয়া ঐ সকল কার্য্যে শিক্ষালাভ করিবে, তাঁহাদের সহিত আমি মতে মিলি না। এখন যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে দেশে দিন দিন নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীর তত্ত্বাবধানে এ সকল কার্য্যকরা সকল সময়ে সুবিধাজনক নহে। ইহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয় এবং বিদেশী অধ্যক্ষগণ দেশের লোককে ব্যবসার গূঢ় রহস্য জানিবার অবসর দেন না। এরূপ ব্যবস্থায় দেশের লোক চিরদিনই কেবল মুটে মজুরের কাজই করিতে থাকিবে, নিজে কোন শিল্প বা ব্যবসা চালাইতে কখনই সমর্থ হইবে না। বিবিধ শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে শিক্ষিত উপযুক্ত লোক দেশে থাকিলে এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে বেশী দেরী হইবে না। ইহাদের কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার উপর দেশবাসীর বিশ্বাস জন্মিলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধনেরও অভাব হইবে না। ক্রমে দেশে স্থাপিত শিল্প বানিজ্যের প্রতিষ্ঠান হইতে দেশের লোকে এই সকল কার্য্য শিক্ষা করিবে, অর্থব্যয় ও নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া তাহাদিগকে বিদেশ যাইতে হইবে না। জাপান এই পথ অনুসরন করিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরনীয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুবর ডাক্তার সার পি সি রায়ের সহিত নাগপুরের এম্প্রেস মিল নামক কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। উহার বিস্তৃত কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। বোধ হয় ভারতবর্ষে এত বড় কাপড়ের কল আর নাই। ইহা একজন পার্সি ভদ্র লোকের টাকায় স্থাপিত এবং ইহার সমস্ত কার্য্য ভারতবাসী দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে একজনও বিদেশী কর্ম্মচারীকে দেখা যায় না। ভারতীয় মূলধনে ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত কল কারখানা কিরূপ সুন্দর ভাবে চলিতে পারে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া কয়েকটী ভারতীয় ছাত্র ইয়ুরোপে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গমন করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই উদ্দেশ্যে দুই একটী বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প—ইহা দ্বারা দেশের অভাব পূরণ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং বিদেশে যাইয়া ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য আরো অনেক বৃত্তি স্থাপনের প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আরো বেশী টাকা খরচ করা উচিত এবং দেশের ধনকুবেরগণ কর্ত্তৃক ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে অধিক সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ ও বৃত্তিস্থাপনের প্রয়োজন। এবিষয়ে বঙ্গের দুইজন কৃতী সন্তান—প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারক নাথ পালিত ও ৺রাসবিহারী ঘোষ—স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর অনুকরণীয়। সেদিন লেজিস্‌লেটিভ্‌ এসেম্ব্লির কার্য্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। এসেম্ব্লির সুযোগ্য সদস্য মাননীয় সমর্থ মহোদয়ের প্রস্তাবে ভারতীয় ছাত্রদিগের বিদেশে বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য, ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কার্য্য দ্বারা মাননীয় সমর্থ মহাশয় প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। যে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বাৎসরিক ৬লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। তালিকা

দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে এতদিন পরে ভারতে বিবিধ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার একটা বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে এই প্রস্তাব যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। তালিকাভুক্ত শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি এই :—

১। জাহাজ নির্ম্মাণ (Ship-building)

২। জাহাজের কল্‌কব্‌জার সন্ধান (Ship-engineering)

৩। সমুদ্র-বিজ্ঞান (Oceanagraphy)

৪। বিনাতারে তাড়িতবার্ত্তা বহন (Wireless Telegraphy)

৫। বন্দুক, কামান ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ (Gunnery and other modern weapons of warfare)

৬। শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রসায়নী বিদ্যা (Industrial Chemistry)

৭। খনিবিজ্ঞান ও খনিজ পদার্থ হইতে বিবিধ ধাতু পৃথক্‌করণ (Mining and Metallurgy)

৮। ভূতত্ত্বের বিস্তৃত অনুসন্ধান (Geological Surveying)

৯। তাড়িত বিজ্ঞান, জলপ্রপাত সাহায্যে তাড়িতের প্রজনন এবং কৃষিকার্য্যে তাহার প্রয়োগ (Electrics with special reference to hydro-electric engineering and the application of electricity to agriculture)

১০। ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করণ এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থা (Making and canning fruit preserves.)

১১। ঘন দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করণ (Condensed milk, milk-products and concentrated food.)

১২। বিবিধ গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা (Cottage industries)

১৩। সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন (Organising and working of distributive Co-operative Stores and producers' Co-operative Unions)

ইহা ব্যতীত অপর যে কোন শিল্প সময়ে সময়ে দেশে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইবে, এই অর্থ হইতে ভারতীয় ছাত্রগণকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার

জন্য ব্যয় করা হইবে। মাননীয় সমর্থ মহাশয় এই প্রস্তাব উপলক্ষে যে সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধানের যোগ্য। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউস্ পত্রিকা হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Mr. Samarth then moved his resolution recommending that not less than six lakhs of repees be set apart every year from central revenues to provide for the education and the training abroad of Indian and Anglo-Indian youths in the following subjects :—Ship-building, ship-engineering, oceanagraphy, wireless telegraphy, gunnery and other modern weapons of warfare, industrial chemistry in all its branches—theoretical and practical ; mining and metallurgy, geological surveying, electrics with special reference to hydro-electric engineering, and the application of electricity to agriculture, making and canning preserves, condensed milk, milk products, and concentrated foods, cottage industries, organising and working of distributive stores, and producers Co-operative unions and such other subjects as the Assembly from time to time deem essential for the needs of India. The mover emphasised that the educational problem of the country was a national one and it was necessary for modern national growth that education should be given to youths in branches of science and everywhere. He instanced the educational scheme which was inaugurated in Japan and which :in two years brought out such a national growth and upheaval and ultimately distinguished itself in the Russo-Japanese war. He therefore wanted that his countrymen should rise to that standard and asked Government to send suitable candidates to

foreign countries and promote education in a manner a national government would do. Continuing, the speaker said that political domination was an evil and to depend for everything on foreign countries was equally an evil. He was one of those who would forget the past errors of Government and would see that in future, things went as the best interests of India demanded. He did not believe in Ahimsa and going centuries back in order to lead a life of simplicity (laughter). He belonged to the modern world and must try to learn what the world had to teach them."—*Indian Daily News*, 24-2-22.

গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন না করিলেও সমগ্র এসেম্ব্লি বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইহা কার্য্যে পরিণত করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও আমরা আশা করি যে গভর্ণমেণ্ট অন্যদিকে খরচ বাচাইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই অর্থের ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইবেন।

ব্যয়াধিক্য হেতু গভর্ণমেণ্টের অর্থের বিশেষ অনাটন হইয়াছে। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট অনেক নূতন ট্যাক্স বসাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ভয় হইতেছে যে, এই কার্য্য দ্বারা দেশে অসন্তোষের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, ভারত গভর্ণমেণ্ট কল কব্জার (Machinery) উপর ট্যাক্স বসাইয়াছেন বলিয়া দেশে শিল্প বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবে। শিল্পকার্য্যের জন্য কল কব্জা অতি অল্পই এ দেশে প্রস্তুত হয়, প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ট্যাক্স স্থাপনের জন্য কল-কব্জার দাম অধিক হইবে, সুতরাং এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে। যাঁহারা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মত এই যে, এই ট্যাক্সের জন্য দেশের শিল্পের প্রসার বিশেষ ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে সর্ রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি ও মিষ্টার ডার্সি লিণ্ড্সের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"The new duties only affected industry and commerce and left agriculture, Zemindari etc. practically untouched. They will throw a cold douche of water on the industries and commerce. The increase in the duty of machinery, iron, steel and railway materials will put a strong brake over the industrial wheels. The trade and industry are already in a low state and this new duty on machinery etc. will greatly hamper any new proposal for development of industries. The Government who, in my opinion, are not retrenching their expendture as much as they ought to do, should have found money from other sources than merely from industries and commerce."—*Sir R. N. Mookerjee K. C. I. E.*

Mr. Darcy Lindsay bitterly condemned these increases in taxation oncertain articles as most disturbing for both the public and the trade. There was not enough imagination or ingenuity in the Budget. The milch-cow was being milked dry. While crying out for industrial development the country was beine taxed on th machinery necessary for such progress. He felt sure there must be other avenues for taxation. He did not like the Budget as a whole. The Budget, he added, would give a fresh lease of life to no-co-operation."

সুখের বিষয় এই যে গভর্ণমেণ্ট শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়া কলকব্জার উপর সামান্য মাত্র ট্যাক্স বসাইয়াছেন। অবশ্য কলকারখানা স্থাপন যে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণপ্রদ, তাহা নহে। ইহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইলেও বিবিধ সামাজিক অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। নৈতিক জীবন ও স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যভিচার বৃদ্ধি, মাদক দ্রব্য সেবনে প্রবৃত্তি, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, মিতব্যয়িতার অভাব প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গল, সকল দেশেই শ্রমজীবিগণের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান

থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এ সকল অমঙ্গল ব্যবস্থার দোষেই ঘটিয়া থাকে যাঁহারা কলকারখানা স্থাপন করেন, তাঁহাদের প্রবল অর্থলিপ্সা, তাঁহাদের স্বার্থ-পরতা এবং কর্মীদিগের প্রতি সহানুভূতির অভাবেই এই সকল অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে। আজ কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কর্ম্মীদিগের হৃদয়ে আত্মসম্মান জাগরূক হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে সঙ্কুচিত হইত, নীরবে প্রভুদিগের (Employers) অত্যাচার সহ্য করিত। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সকলদেশের শ্রমজীবিগণ অল্পাবস্তর শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং সকলদেশেই উন্নতমনা একদল ব্যক্তি শ্রমজীবিগণের সমিতি সংঘটন করিয়া তাহাদের সাংসারিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও এইরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং ইহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইলেও বলপ্রয়োগ বা আইনের দ্বারা ইহা কখনই নিবারিত হইবে না। কলকারখানার অধ্যক্ষগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাহা শ্রমজীবিগণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে। সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ এই অর্থে তাহাদেরও কিয়ৎপরিমাণ অধিকার আছে। তাহাদের আশা বেশী নহে, তাহাদের সাংসারিক অভাব অল্প, সেই অভাব পূর্ণ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। যাহাতে তাহারা পরিজনবর্গের সহিত স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাদ্বিষয়ে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব নহে, নিজ নিজ স্বার্থের দিকে চাহিয়াও যথোচিত ব্যবস্থা করা ধনীদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে হৃদয়বান কলকারখানার অধ্যক্ষগণের মধ্যে এই কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া শ্রমজীবিগণ এবং তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, উপাসনালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন সমবায় ভাণ্ডার, পাঠাগার ক্রীড়াগার, ব্যায়ামক্ষেত্র, নির্দ্দোষ প্রমোদাগার এবং সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের পরিজনবর্গের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের সহায় হইতেছেন। স্ত্রীকর্ম্মী-

গণের কার্য্য করিবার সময়ে যাহাতে তাহাদিগের অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাগণের অযত্ন না হয় এবং তাহারা সময়মত পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জননীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। এ দেশেও এইরূপ সুব্যবস্থার সূচনা দেখা যাইতেছে। মার্চ্চ মাসের "মডার্ণ রিভিউ" নামক পত্রিকাতে সেণ্ট নিহাল সিংহ মহীশূরের রাজার অধীনস্থ কাবেরীপ্রপাত চালিত তাড়িতশক্তি উৎপাদনের কারখানার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রায় ১৫০০ লোক সেই কারখানায় কাজ করে। তাহাদের একটি সুন্দর উপনিবেশ সেখানে স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য কারখানার শ্রমজীবী অপেক্ষা তাহারা অধিক বেতন পায় এবং মহীশূর সরকার হইতে তাহাদের মানসিক, শারীরিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে এই কারখানায় কার্য্য করিতেছে। কি স্বদেশী, কি বিদেশী, প্রত্যেক কলকারখানার অধ্যক্ষ-গণের এই পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শ্রমজীবিগের ধর্ম্মঘট অনেক কমিয়া যাইবে এবং কলকারখানায় বহুলোক একত্রে কাজ করিবার জন্য যে সকল অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। এই অমঙ্গল নিবারণের জন্য কলকারখানা উঠাইয়া দিলে চলিবে না। অন্নবস্ত্র-সংস্থানের জন্য দেশে কলকারখানার স্থাপন অবশ্য প্রয়োজন। সামান্য স্বার্থত্যাগ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ দ্বারা কলকারখানা স্থাপনের অমঙ্গল দূরীভূত করিতে হইবে।

বিলাসিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত হয়। কাগজ, পেন্সিল, কলম ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, দেশালাই, সাবান, বাতি, কাচের বাসন, সূতা, পশম ও রেশমের কাপড়, আবাস. চিরুণী, বুরুশ লোহার জিনিস, ঔষধ, রঙ্গের জিনিষ প্রভৃতি আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থের অধিকাংশই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যের উপাদানের (Raw materials) অভাব নাই এবং এই সকল উপাদান কাযে লাগাইয়া ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, তাহারও অভাব নাই। এ সম্বন্ধে অভাব কেবল আমাদের শিক্ষার, উদ্যমের অধ্যবসায়ের ও সাহসের। আমাদের মানসিক

বৃত্তি ও কর্ম্মজীবন এই পথে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার এতদিন অবসর পায় নাই; আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। জাতীয় জীবন-স্রোত সবে মাত্র নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে, সম্মুখে অনেক বাধা বিপত্তি অবস্থিত, সেগুলি অতিক্রম করিতে পারিলেই স্রোতের গতি অবিচ্ছিন্ন পূর্ণতা লাভ করিবে। সাফল্য-লাভ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই, উহা কেবল সময় সাপেক্ষ।

এক্ষণে দেখা যাউক যে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার কি ব্যবস্থা আছে। ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার-ভুক্ত স্কুল ও কলেজ সমূহে অধ্যয়ন ও পরীক্ষার বিষয় ছিল। পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজেও রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। এ সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা মেডিকাল কলেজের আশ্রয় লইতে হইত। ক্রমে দুই একটী কলেজে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নী বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইল। তখন এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রের কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হইত। অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই পরীক্ষাগারে হাতে কলমে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিত। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা অন্য কোথাও ছিল না, মেডিকাল কলেজের রসায়নশাস্ত্র ও ভৈষজ্যতত্ত্বের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের পরীক্ষাগারে অবসর মত অল্প বিস্তর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সার আলেকজাণ্ডার পেড্লার্ প্রথমে সামান্য ভাবে গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়ার্ডেনের সহিত একত্রে কিছুদিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রসায়নাচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সময় হইতেই এদেশে রসায়নী বিদ্যার গবেষণা কার্য্যের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। তিনি এডিন্‌বরা হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। এবং সেই সময় হইতে স্বীয় প্রতিভা, অবসর ও মানসিক শক্তি রসায়ন-বিজ্ঞান-ঘটিত গবেষণায় নিয়োজিত করেন। ইহার ফলে তিনি জগতের বিজ্ঞান-সমাজে উন্নত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গবেষণা কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাযে

লাগাইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক মনে করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া গবেষণা কার্য্যে দক্ষ অনেকগুলি বাঙ্গালী শিষ্য গঠিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা দেশে ও বিদেশে সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

অনেকে মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সাধারণের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ইহাতে বিস্তর অর্থব্যয় হয় এবং এই সকল গবেষণার ফল কেবল মতবাদ (Theory) রূপেই থাকিয়া যায়, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে ইহাদিগের উপযোগিতা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য যে এই মত নিতান্ত সঙ্কীর্ণতাজ্ঞাপক। একটু ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই এই মতের ভ্রম সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার আদিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা তাপ, তাড়িত ও আলোককে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে যে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছি এবং কাল ও দূরত্বের ব্যবধান নাশ করিয়া দিন দিন জীবনযাত্রার পথ সুগম হইতে সুগমতর করিতেছি, তাহার মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিদ্যমান। যখন তাড়িত-তরঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিয়াছিল যে এই গবেষণা দ্বারা বার্ত্তাবহন-ব্যপারে পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌-বৃদ্ধি নির্ণয়ের জন্য যে অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে ভবিষ্যতে উহা ভারতবর্ষের প্রত্যেক কৃষকের ঘরে ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দিবে না? নিউটন্ যখন সূর্য্য কিরণ-বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণছত্রের (Spectrum) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন কে জানিত যে তাঁহার আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ যে কেবল সুদূরস্থিত ব্যোমচারী গ্রহ-নক্ষত্রাদির গঠনোপাদন ও গতিবিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহাই নহে উহা দ্বারা কত নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার এবং ভূগর্ভস্থ বিবিধ পদার্থের উপকরণ সহজে অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে তাহার কাযে লাগাইতে সমর্থ হইবে? মহাত্মা পাষ্টুরের জীবাণু সম্বন্ধীয় গবেশনার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রোগ-প্রতিষেধকতত্ত্ব এবং কতিপয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য

সামগ্রীর ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক কুরী এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী মাদাম্ কুরী রেডিয়ম্ (Radium) ধাতু আবিষ্কার করিয়া, ডল্টনের যে পরমাণু বাদ বৈজ্ঞানিক জগতে এ পর্য্যন্ত অকাট্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইত- তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন কেবল তাহাই নহে, এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে জাগতিক যাবতীয় পদার্থের মূলে ইলেকট্রন্ নামে একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ অবস্থিত এবং ইহা জড় নহে, তাড়িত শক্তির সূক্ষ্মকণা মাত্র। ইহার গতি ও শক্তি অপ্রতিহত। ইহা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরামাণুর দেহ হইতে অবিরাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরিমেয় তাপ উৎপাদন করিতেছে এবং এই বিক্ষেপণের ফলে, যে সকল পদার্থকে আমরা এ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় মূল পদার্থ (Elements) বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের রূপান্তর হইয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার আশায় যে স্পর্শমণির আবিষ্কারের জন্য মানুষ প্রাণ পাত করিয়া যুগযুগান্তরব্যাপী নিস্ফল চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে কুরী দম্পতীর রেডিয়ম্ ধাতু আবিষ্কারের ফলে তাহা এত দিন পরে সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে। এতদিনের পর বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন যে তাঁহারা একদিন পরীক্ষাগারে নিকৃষ্ট ধাতুসমূহকে সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন। আর্য্যঋষিগণ যোগবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই, যাবতীয় জাগতিক পদার্থ চেতনাময়। আজ বিজ্ঞানও প্রামাণিক পরীক্ষা দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে যাহাকে আমরা এত দিন জড় বলিয়া আসিয়াছি, তাহা জড় নহে, এক অদ্বিতীয় শক্তির রূপান্তর মাত্র। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কেবল একই শক্তি প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছে।

রসায়নীবিদ্যার গবেষণার ফলে জড় ও জৈবজগতের প্রভেদ দিন দিন লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এতদিন যে সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে সেই সকল পদার্থ এখন পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে। সুরা, শর্করা, নীল প্রভৃতি রঞ্জন দ্রব্য, নানাপ্রকার সুগন্ধি এবং উদ্ভিজ্জ ঔষধাদি নিত্যব্যবহার্য্য বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু, যাহাদিগের উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির পরীক্ষাগারেই সম্ভব বলিয়া মানুষ এতদিন বিশ্বাস করিত, এখন সেই

সকল পদার্থ মানুষের পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে বস্ত্র-রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জবর্ণ ব্যবহৃত হইত। স্বনামখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ পার্কিনের গবেষণার ফলে পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক বিবিধ বর্ণের এনিলিন (Aniline) নামক রঞ্জনদ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ কদাকার পাথুরে কয়লা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই রঞ্জন দ্রব্য এখন লোকে এত সস্তা দরে পাইতেছে যে উদ্ভিজ্জ রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ-সরঞ্জামের যাবতীয় রাসায়নিক স্ফোটক দ্রব্য (Explosives) বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে পরীক্ষাগারে উৎপন্ন হইতেছে। ফল-শস্যাদিকে ব্যাধি ও কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা সমস্তই বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত। অস্ত্র-চিকিৎসায় এবং সংক্রামক রোগ নিবারণকল্পে মানুষ যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহার মূলে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পাশ্চাত্যদেশ সমূহ এত সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং গবেষণা কার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ ফলপ্রদ না হইলেও ভবিষ্যতে উহা যে সমগ্র মানব সমাজের ধনবৃদ্ধির সহায় ও অশেষ কল্যাণের আকর, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

বিজ্ঞান যে কেবল মানুষের পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির সহায়, তাহা নহে, ইহার অন্য একটী মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যলাভই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানই মানব-মনকে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ভাব ও কর্ম্মজগতে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। কেবল মাত্র সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কতশত মহানুভব ব্যক্তি বিজ্ঞানের সেবায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই যে কার্যাদ্বারা তাঁহারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার মূল্য নাই। সে কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়, অপরের নহে। আর্য্যঋষিগণের ন্যায় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণও কায়মনপ্রাণ সমস্তই তাঁহাদের উপাস্য দেবতার আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন, সাংসারিক বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, আর্থিক চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, তন্ময় হইয়া সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্ট দেবতার সাধনা করিয়া থাকেন। যখন দেখি আর্কিমিডিস তাঁহার অভীপ্সিত বিষয়ের সন্ধান লাভ করিয়া স্নানাগার হইতে আনন্দের আতিশয্য বশত জ্ঞানহারা

হইয়া উলঙ্গাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে "ইউরেকা" "ইউরেকা (Eureka)' মাত্র শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণা- কার্য্যে তন্ময়ত্বের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। যখন দেখি যে যিনি চীনাবাসন (Porcelain) প্রথম প্রস্তুত করেন, ইন্ধনের অভাবে নিজের বাক্স, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দাহ্য সামগ্রী গৃহে ছিল, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি সেই সকল পদার্থ চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতঃ স্বীয় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখনই আবার আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তন্ময়ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই। গবেষণা জীবনের যে একটী প্রকৃষ্ট সাধনা, ইহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসোসিয়েসন (Indian Association for the Cultivation of Science) এসম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য। যাহাতে দেশের লোকের অধ্যবসায় ভারতবাসিগণ স্বাধীন ভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায় গবেষণায় নিপুণ এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে পারে, এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাক্তার সরকার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার রমণের তত্ত্বাবধানে ভারতের নানাস্থান হইতে আগত জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রগণ এই বিদ্যামন্দিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের আবিষ্কৃত নব নব তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জগতে সাদরে গৃহীত হইতেছে। এই বিজ্ঞান-সভাই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত দেশের লোককে বিজ্ঞান-শিক্ষা দিবার প্রথম প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নিকট তাঁহার দেশবাসী চিরদিন অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটী সায়েন্স কলেজ (University Science College) স্থাপিত হইবার পর বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার স্থাপয়িতা ও কর্ম্মকর্ত্তা মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা-

জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে এই বিজ্ঞানপীঠ তারকনাথ ও রাসবিহারীর সহিত চিরদিন স্যার আশুতোষের সুযশ ঘোষণা করিবে। এখানে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন বিভাগে এবং অধ্যাপক রমণ পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে বহু সুযোগ্য শিষ্য পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই বিজ্ঞান মন্দিরে ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা (Applied Physics) ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান (Applied Chemistry) এবং শিল্প বিজ্ঞান (Technology) শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইয়ুরোপে শিক্ষিত অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে এই শিক্ষার ভার সমর্পিত হইয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা কার্য্যের ফল বৈজ্ঞানিক জগতে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে। সায়েন্স কলেজের আরো প্রসারণ আবশ্যক। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের আরও অধিক অর্থ সাহায্য করা উচিত। উপযুক্ত বৃত্তি স্থাপন করিয়া এই বিজ্ঞান মন্দিরে ভারতীয় ছাত্রগণের গবেষণা কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া দেশের ধনীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর একটি কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস্ বিভাগের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, বিজ্ঞান বিভাগে তাহা অপেক্ষা কম খরচ করেন। সময়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া এ বিষয়ে সামঞ্জস্য স্থাপন একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পর বঙ্গদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা সমুচিত প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণ যাহাতে অব্যাহত ভাবে শুদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতে পারে, এই সময় হইতে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষাগারে (Laboratory) নিজ হস্তে যন্ত্রাদি সাহায্যে কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে কেবল উপাধি পরীক্ষার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল এবং তাহাতেও আশানুরূপ ফললাভ হইত না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষাবিভাগ (Post-Graduate Department) স্থাপিত হইবার পর দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার আরও বিস্তৃত লাভ করিয়াছে এবং গবেষণা কার্য্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই বিভাগ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়া ভারতীয়

ছাত্রদিগের বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের ছাত্রগণ বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ই তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট ভাবে আকর্ষণ করিত। সম্প্রতি ছাত্রগণেরও এ সম্বন্ধে মনোভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি তাহাদের একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। যে সকল কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের অধ্যক্ষগণ বলেন যে বিস্তর ছাত্রের বিজ্ঞান শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার আবেদন; স্থানের অভাববশতঃ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা যে একটি শুভলক্ষণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কলেজের অধ্যক্ষগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহাদের কলেজে যাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে পারে, তাঁহারা অবিলম্বে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

আচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে (Bose Institute) উদ্ভিদ-জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উন্নত গবেষণা কার্য্য চলিতেছে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার আজীবন সোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দেশের কল্যাণার্থ এই বিজ্ঞানপীঠ প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট অর্থ দ্বারা এই কার্য্যের সহায়তা করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে এই বিজ্ঞানপীঠ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের বৈজ্ঞানিক-দিগের একটী তীর্থস্থান হইবে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানালোক যেমন প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে এক সময়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন জ্ঞান বিস্তার করে বসু-বিজ্ঞান মন্দির পুনরায় ভারতের লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়।

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ওয়াটসন্ ও তাঁহার ছাত্রগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই কার্য্যের সবিশেষ প্রসারণ দেখিতে বাসনা করি। অধ্যাপক ওয়াটসন্ একণে গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত কানপুরের শিল্পশিক্ষাপীঠে গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং ব্যবহারিক রসায়নে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

স্বনামধন্য টাটা মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোরের টাটা-বিজ্ঞান-

মন্দিরে (Tata Institute) বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কল্যান সাধন করিতেছে।

পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত ও বেসরকারী কলেজ সমূহে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত কতিপয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা-কার্য্য অল্প বিস্তর সম্পাদিত হইতেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণার কার্য্য ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এ সম্বন্ধে কলিকাতায় School of Tropical Medicine and Hygiene, কসৌলির Research Institute এবং বোম্বাইয়ের Parel Laboratory বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ডাক্তার সর্ লেনার্ড্ রজার্স্, কলিকাতা Tropical School এর স্থাপয়িতা। আগে লোককে বিলাতে যাইয়া এ দেশের রোগ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইত ; ডাক্তার রজার্স্ এই গবেষণা-মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক সেই অভাব দূর করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দিন দিন বিবিধ সংক্রামক রোগ প্রসার লাভ করিতেছে। ঐ সকল রোগের কারণ নির্দ্ধারণ ও প্রতিশোধের উপায় উদ্ভাবন করাই এই গবেষণামন্দিরের উদ্দেশ্য। রোগ পরীক্ষার ও উপশমের জন্য ইহার সহিত কারমাইকেল্ হস্পিটাল্ নামক একটী চিকিৎসালয় সংযুক্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বহুমূত্র প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধি সম্বন্ধে এক্ষণে এই স্থানে গবেষণার কার্য্য চলিতেছে। গবেষণা কার্য্য শিক্ষার জন্য এখানে ছাত্র লইবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার রজার্স এই অনুষ্ঠান দ্বারা চিকিৎসা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

কেসৌলি এবং বোম্বাইয়ের গবেষণা-মন্দিরে বহু দিন হইতে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। রোগোৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণাব্যতীত কসৌলিতে প্লেগ, ডিপ্থিরিয়া ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক রোগের এবং কুকুর ও সর্পদংশনের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাই প্যারেল ল্যাবরেটারিতে প্লেগ সম্বন্ধে এতাবৎকাল বহু গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। এই সকল গবেষণার ফল গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত Indian Journal of Research নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের সহিত দেশের শিল্প বাণিজ্য যথোচিত প্রসার লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ভারতবাসীর অর্থে ও কর্ত্তৃত্বে শিল্প ও শিল্পজাত পদার্থের ব্যবসা কতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় অনেক স্থলেই নিষ্ফলতা ও তজ্জনিত নিরাশা অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সততা ও যথোচিত মূলধনের অভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত অনেকানেক শিল্প ও ব্যবসা অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য হতাশ হইবার কারণ নাই। নিষ্ফলতা হইতে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেছি এবং এই সকল কার্য্যে আমাদের অভিজ্ঞতা দিন দিন বাড়িতেছে। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে আমরা ক্রমশঃ আমাদিগের শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সজীব রাখিতে ও উন্নতিশীল করিতে সমর্থ হইব।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে, তন্মধ্যে বেঙ্গল কেমিকাল্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল্ ওয়ার্কস লিমিটেড্ (Bnegal Chemical and Pharmaceutical Works Ld.) প্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহার ইতিহাস হইতে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এবং সতীশচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক এই কারখানার সূত্রপাত হয়। দেশীয় উপাদান হইতে আধুনিক উপায়ে ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২৫০০০ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় লিমিটেড কোম্পানিরূপে রেজেষ্ট্রী করা হয়। তাহার পরে মূলধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এখন ২৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানির কারখানা সারকুলার রোডেই ছিল। তাহার পরে মাণিকতলায় প্রায় ১০/০ বিঘা জমি লইয়া নূতন কারখানা পত্তন করা হয়।

এখন ৪০/০ বিঘা জমীর উপর বিস্তৃত এই কারখানার ৪৫টী অতি প্রশস্ত গৃহে (Shed) নানাপ্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন কারখানার অধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী, শ্রমিক প্রভৃতির জন্য বাসগৃহ, হস্পিটাল্, পুস্তকাগার, বিশ্রাম ও প্রমোদ গৃহ, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আফিস্ এবং কারখানায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০০ শত কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। শ্রমিকদিগের সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত।

কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি উল্লেখযোগ্য :—

সল্ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid), নাইট্রিক এসিড্ (Nitric Acid), হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hydrochloric Acid), এমোনিয়া (Ammonia), ম্যাগ্নেসিয়ম্ সল্ফেট্ (Maganesium Sulphate), হীরকশ (Ferrouts Sulphate), পটাস্ সল্ফেট্ (Potassium Sulphate), সোরা (Potassium Nitrate), সোডা সল্ফেট্ (Sodium Sulphate), সোডিয়ম্ থিয়সল্ফেট্ (Sodium Thiosulphate), এলুমিনিয়ম্ সল্ফেট্ (Aluminium Sulphate). ডেক্স্ট্রিন্ (Dextrine), কেফিন্ (Caffeine), পিচ (Pitch) এবং বিশোধক ঔষধাদি (Disinfectants)। এতদ্ব্যতীত ঔষধের নির্য্যাস (Pharmaceutical Extracts, Tinctures, *etc*), অস্ত্র-চিকিৎসার সরঞ্জাম (Surgical dressings), বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Scientific instruments), পরীক্ষাগারের আসবাব (Laboratory fnrniture), জ্বালানি গ্যাস প্রস্তুতের যন্ত্র (Gas generater and holder), গ্যাস ও জলের কলের উপকরণ (Gas and Water-fittings) এবং অগ্নি-নির্ব্বাণ যন্ত্র (Chemical fire extinguishers) এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কারখানায় যত "বয়লার" (Boiler) আছে, তাহার বলের মোট পরিমাণ ৪৫০ Horse power। তাড়িত প্রবাহেই অধিকাংশ যন্ত্র চালান হয়। কারখানার ভিতরে মাল বহনের জন্য প্রায় ১ মাইল ব্যাপী রেলপথ আছে। ঔষধের লেবেল, তালিকা প্রভৃতি কারখানায় মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয়। প্রত্যহ প্রায় ৭০০ শত মণ কয়লা পোড়ে এবং ৪০০০০ গ্যালন জল খরচ হয়। প্রায় ২০০ শত 'ফীট' গভীর তিনটী 'টিউব ওয়েল্' (Tube well) হইতে জল সরবরাহ হয়। কারখানার যন্ত্রশালা (Machine shop সুবিস্তীর্ণ এবং সুব্যবস্থিত। কোম্পানির নিজ ব্যবহারের জন্য অনেক যন্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী বহুপ্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্র এই কারখানায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মাণিকতলায় স্থানাভাব বশতঃ কোম্পানি অন্যত্র আর একটী বৃহত্তর কারখানার পত্তন করিতেছেন। এই জন্য পানিহাটিতে প্রায় ২০০/০ বিঘা

জমী লওয়া হইয়াছে।

বোধ হয় কোন্নগরের ওয়াল্ডি কোম্পানি (Waldie & Co.) বঙ্গদেশে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রথম স্থাপন করেন। তাঁহাদের কারখানা এখনো চলিতেছে এবং অনেকানেক রাসায়নিক দ্রব্য সেখানে প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহারা এ বিষয়ে বঙ্গদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ নামক নবপ্রতিষ্ঠিত কারবারের নাম এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ইহা বেঙ্গল কেমিকালের অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঔষধ এবং অনেকানেক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

দেশে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ঔষধের এবং শিল্পের ব্যবহার্য্য বিবিধ রাসায়িক দ্রব্যের উপকরণ (Raw materials) যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার কারখানা এদেশে অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইলে এই সকল দ্রব্যের মূল্য সুলভ হইবে, দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যাইবে এবং বহু লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম হইবে।

এদেশে যে কয়টী কাগজ প্রস্তুতের কারখানা আছে, তাহাদের অধিকাংশ বিদেশীয় মূলধনে ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা চালিত। এই সকল কারখানার যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেক অভাবও মিটে না; বিদেশ হইতে বহুলপরিমাণ কাগজের আমদানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কাগজের উপকরণের সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ প্রয়োজন পরিমাণ কাগজ এদেশে প্রস্তুত হইতেছে না। সম্প্রতি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং দেশের স্থানে স্থানে ভারতবাসীর অর্থে ও তত্ত্বাবধানে কাগজের কল বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। আসাম পেপার মিল্স্ লিমিটেড্ নামক একটী যৌথ কারবার, কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা আসাম প্রদেশে স্থাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সদুদ্যমের সফলতা কামনা করি।

এত দিন পরে বঙ্গদেশে চীনা মাটীর বাসন (Porcelain) প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও ভালরূপে চলিতেছে গৃহব্যবহার্য্য সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হইলেও এই

কোম্পানী দ্বারা দেশের একটী প্রকৃত অভাবের মোচন হইয়াছে।

কাচ প্রস্তুত করিবার জন্য ইচ্ছাপুর ও অন্যান্য স্থানে ইতিপূর্ব্বে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু উহা সাফল্য লাভ করে নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে দুই একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য মন্দ চলিতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তথায় শিশি বোতল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, বাজারে তাহা বিক্রীত হইতেছে। কি শিক্ষা, কি গৃহকার্য্য, সকল বিষয়েই কাচের জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবসায়ের বিস্তৃতি একান্ত প্রার্থনীয়।

দেশালাইয়ের কারখানা মাঝে মাঝে দেশের স্থানে স্থানে স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহা এপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দেশালাই প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ। দেশে যত দেশালাই ব্যবহৃত হয়, তাহা সমস্তই ইয়ুরোপ ও জাপান হইতে আসে। ভারতবর্ষে দেয়াশালাই প্রস্তুত করিবার কাঠের অভাব নাই, কলকব্জাও বিশেষ জটিল নহে, রাসায়নিক উপকরণগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে। অথচ ইহার জন্য আমরা সম্পূর্ণ-ভাবে বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি সম্প্রতি দেশের দুই এক স্থানে দেশালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু যে দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বিদেশী দ্রব্যের তুল্য নহে।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য বঙ্গদেশে কয়েকটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

চাটনি ও ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করণ এবং ফল টাট্‌কা অবস্থায় রাখিয়া বিদেশে পাঠাইবার জন্য কয়েকটি কারখানা এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ফল পাওয়া যায় ও অধিক পরিমাণে জন্মে। এই ব্যবসা ভালরূপে চলিলে দেশে ধনাগমের বিশেষ সুবিধা হইবে।

আগে দেশে অনেক চিনি প্রস্তুত হইত এবং দেশের খরচ কুলাইয়া বিদেশে তাহার রপ্তানি হইত। এখন দেশের খরচের জন্য আর্দ্ধেকের অধিক চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। দেশে চিনির কলকারখানা আরো অধিক পরিমাণে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

কাপড়ের কল বঙ্গদেশে আরো বেশী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গলক্ষ্মী,

মোহিনী প্রভৃতি দুই তিনটী কল বঙ্গদেশের বস্ত্রের অভাব মোচন করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চর্‌কা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের বস্ত্রের অভাবের কখনই পূরণ হইবে না। বস্ত্রের কল অধিক পরিমাণে স্থাপিত না হইলে আমাদের চিরদিনই লজ্জানিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

এইরূপ শত শত শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারের উপর দেশের লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। কৃষির সহিত ইহাদের সংযোগ না হইলে কোনকালেই দেশের কঠিন অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতবাসী প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত কয়েকটী প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গালী দ্বারা চালিত বঙ্গদেশের কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান।

LIST OF INDUSTRIES IN BENGAL MANAGED BY BENGALIS.

রাসায়নিক দ্রব্য (CHEMICAL)

- Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, Ld.
- Calcutta Chemical Company, Ld.
- Datta Chemical Works, Ld.

ঔষধাদি (PHARMACEUTICALS)

- Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ld.
- Butta Kristo Paul & Co.
- Bose's Laboratory Ld.
- Bengal Immunity Co. Ld.
- Lister Antiseptics & Dressings Ld.

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি (SCIENTIFIC INSTRUMENTS)

Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ld,

Bose's Laboratory Ld.

চীনামাটীর দ্রব্য (POTTERY)

Bengal Potteries Ld. (Calcutta Pottery Works)

কাগজ (PAPER)

Assam Paper Mills, Ld.

Indian Paper & Paste board Co.

কলম, পেন্সিল ইত্যাদি (PEN, PENCIL & STATIONERY)

F. N. Gupta & Co.

Small Industries Development Co. Ld.

কালি (INKS)

Bengal Miscellany Ld. (Writing Inks)

P. M. Bagchi & Co. do.

Das-Gupta & Sons (Printing Inks)

মোরব্বা ও চাটনি (PRESERVES & CONDIMENTS)

Pioneer Condiment Co. Ld.

Bengal Canning & Condiments Works, Ld.

Sreekissen Dutt & Co.

কাচ (GLASS)

Calcutta Glass & Silicate Works, Ld.

সাবান (SOAP)

Calcutta Soap Works, Ld.

National Soap Factory.

Indian Soap Factory.

দেশলাই (MATCHES)

Govinda Match Factory (Naraingunj)

Bikrampur Match Factory.

বিস্কুট (BISCUITS)

K. C. Bose & Co.

কল (MACHINARY)

P. N. Dutt & Co.

Bando & Co.

Ghatak Iron Works (Behala)

Bengal Bridge & Bolts Co. Ld.

চিনি (SUGAR)

Kusthea Sugar Cane Mills Ld.

বস্ত্রের কল (COTTON MILL)

Bengal Luxmi Mills Ld.

Mohini Mills, Ld. (Kusthea)

চামড়া তৈয়ারি (TANNING)

টিনের জিনিস (TIN GOODS)

Calcutta Colour Printing & Hollowwares Ld.

সেলাই শিক্ষা (TAILORING)

Industrial School, Bengal Social Service League.

অন্য প্রদেশের ভারতবাসী কর্তৃক পরিচালিত।

MANAGED BY NON-BENGALI INDIANS.

বস্ত্রের কল (COTTON MILL)

Keshoram Cotton Mills Ld.

এলুমিনিয়ম্ ধাতুর দ্রব্য (ALUMINIUM GOODS)

Jiwanlal & (Co. Calcutta)

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে বিবিধ শিল্পবিজ্ঞান ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় :—

INSTITUTIONS FOR TECHNICAL EDUCATION.

Sibpur Engineering College.

University College of Science (Technological Chemistry Dept.)

Indian Association for the Cultivation of Science (Commercal Analysis class)

Dacca Agricultural School.

E. I. Railway Workshop, Lillooa.

E. B. S. Ry. Workshop, Kanchrapara.

Serampore Weaving Institute.

Maharaja cossimbazar Polytechnic (Calcutta)

Midnapore Weaving School.

Bankura Weaving School.

Technical School, National Council of Education.

Government Commercial Institute, Calcutta

ইহা ব্যতীত আরো দুই দশটী প্রতিষ্ঠান আছে; তাহাদের নাম সংগ্রহ করিবার অবসর পাই নাই। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুযোগ্য সম্পাদক ও ও কার্য্যাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে নবযুগের সাধনার প্রবুদ্ধ করিতে হইলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল যে ইহা স্কুলের বালকগণের বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা হইবে, তাহা নহে, বংলা ভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া ও পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহাতে উপাধি পাওয়া যাইতে পারে, যথাসময়ে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা বাংলাভাষার পুষ্টিসাধন এবং শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া যে কোন বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। বাংলাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালীর ছেলে অনেক অল্প সময়ে এবং অনায়াসে সকল বিষয়েই অধিক পরিমাণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কলেজের উচ্চশ্রেণীতে অনেক সময়ে বাংলায় বিজ্ঞানের

অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে ইহাদ্বারা ছাত্রগণ প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে বুঝিতে পারিত। আমি প্রায় ৩৬ বৎসর বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রামেন্দ্র বাবুর মতের সমর্থক।

বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ যত্নবান হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন কোন বিষয় বাংলাভাষায় পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার বিস্তৃত প্রচলনের উদ্যোগী, মাননীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহার উদ্যমে ও চেষ্টায় শুদ্ধ বাংলাভাষা নয়, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই সকল ভাষাসম্বন্ধে গবেষণাও চলিতেছে। এখন কেবল বাংলাভাষা চর্চ্চা দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভের পথ সুগম হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বহুকাল হইতে যাহাতে বাংলাভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গগত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আরম্ভ হইলে বাংলাভাষায় বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচিত হইবে, সুতরাং আপাততঃ উপযুক্ত পুস্তকের যে অভাব লক্ষিত হয়, তাহা বেশী দিন থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা প্রস্তুত করিয়া বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক রচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন।

সুকুমারমতি বালকগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া বিজ্ঞানের পুস্তক রচনা করিতে হইবে। বালকদিগের জন্য সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়, সেগুলি ভাষায় ও ভাবে অনেক সময়ে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে এবং উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাবে পাঠ্য বিষয়গুলি বালকেরা একেবারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, শুদ্ধ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং বিজ্ঞান-শিক্ষার সুফল তাহারা জীবনে কোন কার্য্যে লাগাইতে পারে না। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি শিক্ষা-

কার্য্যে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে যেরূপ সহজ ভাষায় সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ধরণের বাংলা বিজ্ঞান পুস্তকের বিস্তৃত প্রচার আবশ্যক।

বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে হাতে কলমে কাজ করা চাই। শিক্ষক যদি ছাত্রকে এইরূপ শিক্ষা দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই শিক্ষা দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার সাধিত হয় না। এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ছাত্রগণকে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল সময়ে বড় বড় পরীক্ষাগার এবং বহুমূল্য আসবাব ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন তাহা নহে। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক গৃহব্যবহার্য্য নানা পদার্থের সাহায্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি অনায়াসে ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন। বিজ্ঞান শিক্ষা অতিশয় ব্যয় সাপেক্ষ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্কুল ও কলেজ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পশ্চাদপদ হয়েন। এবিষয়ে আমি শিক্ষা বিভাগের ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বড় বড় ল্যাবরেটারি, বহুমূল্য যন্ত্র ও মোটা মাহিনায় শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অনেক স্কুল ও কলেজ একেবারেই অসমর্থ। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া এ সকল বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবী করিলে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ সবিশেষ প্রসার লাভ করিবে।

অতঃপর আর একটী কথা বলিয়া এই অভিভাষণের উপসংহার করিব।

আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংযোগ বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা উভয় দেশেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। উভয় জাতিরই পরস্পরের নিকট শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ইংরাজ বা ভারতবাসী কেহই দোষ শূন্য নহেন। পরস্পরের ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া গুণের পক্ষপাতী হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারত বাসী ভাব প্রবণ, ইংরাজ কর্ম্মপ্রবণ। বহুশতাব্দীব্যাপী নানা প্রতিকূল কারণে আমাদের কর্ম্ম জীবন শ্লথ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নিষ্ক্রিয়তা তমোগুণপ্রসূত, আমাদের জীবন এখন তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম মন্ত্রে ইহাকে পুনরায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই জন্য বিধাতার

বিচিত্র বিধানে আমরা রজোগুণসম্পন্ন এক মহাকর্ম্মী জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। এখন উভয়ের কাহারো আদর্শ পূর্ণ নহে; পরস্পর সম্মিলিত হইয়া গুণের আদানপ্রদান দ্বারা একটী পূর্ণ আদর্শের গঠন করিতে হইবে। ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের সহিত পাশ্চাত্যের কর্ম্মজীবন সম্মিলিত হইলে এই অপূর্ব্ব আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়কেই সাধনা করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সে দিন লর্ড রোণাল্ডসে ঢাকা ইউনিভার্সিটী কনভোকেসনে (Dacca University Convocation) যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, উভয়েরই বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—

"There ought to be harmonious development of the Eastern and Western culture hand in hand and that the achievements of the material science in the West should be tinged with the spiritual lever of the East."

আনন্দমঠ হইতে দেশাত্মবোধের প্রথম প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। চিকিৎসক সত্যানন্দকে বলিতেছেন :—

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই। ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরাজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। ইংরাজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনাপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী যাঁহারা মনে করেন যে যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই বর্জ্জনীয় তাঁহাদিগকে মহাপুরুষের এই মহাবাণী একবার স্মরণ করাইয়া আপাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীচুণীলাল বসু।

ইতিহাস-শাখার

সভাপতির অভিভাষণ।

সমাগত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দ!

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে সাদরে আজ যে আসন দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও কেন যে গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। আমার শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু, আমি যতটা জানি, অপরে ততটা জানেন না, বা অপরের জানিবার সুবিধা ততটা নাই। ইতিহাস-সৌধ-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে কোন মনীষী শিল্পীকে এ পদে বৃত হইতে দেখিলে আমাপেক্ষা অধিকতর সুখী বোধ হয় কেহই হইতেন না। তবে আমার পক্ষ হইতে একটা কথা বলিতে চাই, আপনাদের ভালবাসার এই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি আমার নাই। এই সভাপতি মনোনয়ন কার্য্যে বাঙ্গলা দেশ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করিতে না পারে, কিন্তু আপনাদের মহানুভাবতার—অমানীকে মানদান করিবার শক্তি ও অহৈতুকী ভালবাসার যে পরিচয় পাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না যে, পরমারাধ্য আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কার্য্যে ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্র কাঠ বিড়াল আপনার সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া যেরূপ ধন্য হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ মাতৃ মন্দিরের পরিকল্পিত ইতিহাস কক্ষ-নির্ম্মাণ কার্য্যে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত মালমসলা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছি, তাহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আর এ বিষয়ে আমার যে কতদূর যত্ন, চেষ্টা বা আগ্রহ আছে, তাহা আপনাদের ন্যায় বান্ধবদিগের অবিদিত নাই। কি বলিয়া আপনাদিগেকে যে আজ ধন্যবাদ দিব, তাহার ভাষা ঠিক করিতে পারিতেছি না। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন ভাষা মূক হইয়া যায়। আমি বক্তা নই—বক্তৃতার ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারিব না, আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রাণের কামনা।
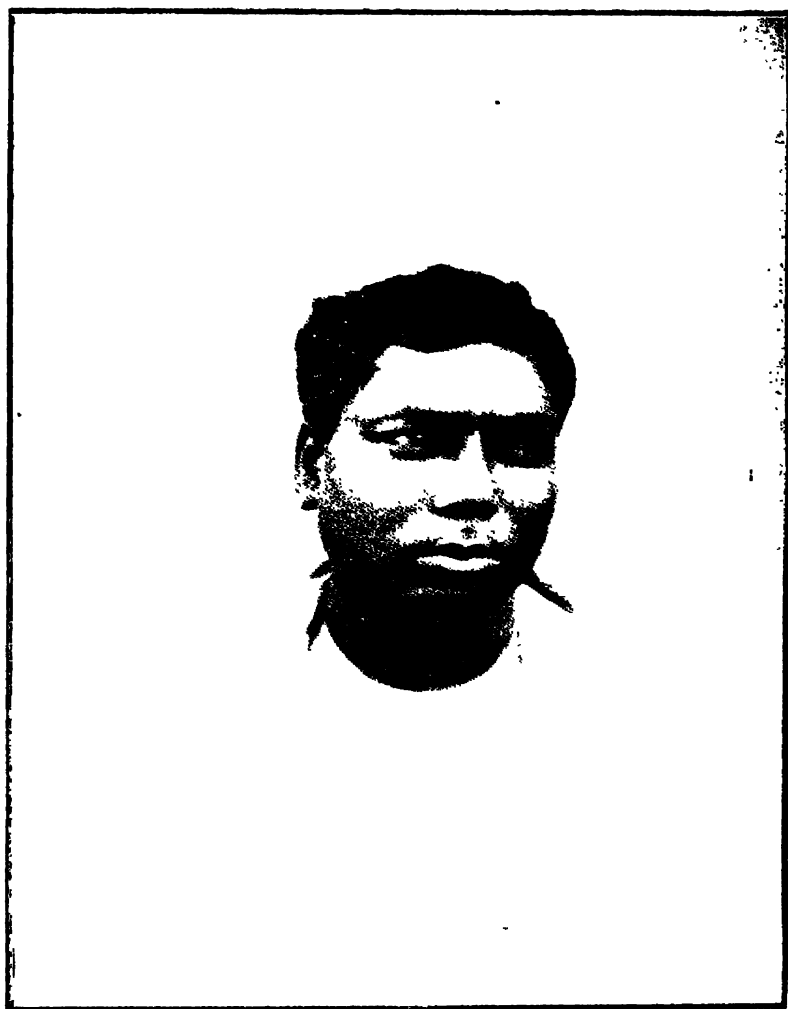
ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ।

আজ আমি যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু প্রণালী বিবৃতি করিবার চেষ্টা করিব, বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ইতিহাসবিশ্রুত সেই মেদিনীপুর জেলা মহামতি দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত মেদিনীপুরের নাম যে চিরকাল গ্রথিত থাকিবে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনকারীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই স্থানে বসিয়াই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম "চণ্ডী" মঙ্গলের অমরগীতি বাঙ্গালীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বরের "শিবায়ন," দুঃখী শ্যামদাসের "গোবিন্দমঙ্গল", ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল", কাশীরামের „মহাভারত" প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় গ্রন্থরাজির সহিত মেদিনীপুরের নাম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পুরীর পথে ছুটীতেছিলেন, তখন তিনি এই মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র পদধূলিস্পর্শে দেশ ধন্য হইয়াছে ও ইহার রজঃ আমার ন্যায় বৈষ্ণব-দাসানুদাসের নিকট ব্রজের রজের ন্যায় পবিত্র।

প্রাচীনতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এ প্রদেশান্তর্গত তমলুকের পদ চুম্বন করিয়া এককালে সমুদ্র প্রবাহিত হইত। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে আধুনিক তমলুক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারত, অথর্ব্বপরিশিষ্ট, বিষ্ণু, বায়ু, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম আছে। মহাভারতে বহুবার তাম্রলিপ্ত ও তাহার নরপতির কথা পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত বাঙ্গলার বন্দর ছিল। ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, "তাম্রলিপ্তপ্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে"। অশোক এই স্থানে একটী স্তূপনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কালে সিংহলদ্বীপে যাত্রা করিতে হইলে এই স্থান হইতেই যাইতে হইত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন, তখন ইহা গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত—সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তিনি এখানে ২৪টী বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। দুই বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া, ফা-হিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের অবিকল প্রতিলিপি ও চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির যথাযথ নক্সা অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। য়ুয়ন-চয়ঙ্ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখনও তাম্রলিপ্ত ১৫০০লি বা ২৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখানে তিনি ৫০টী

দেবমন্দির ও ১০টী বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছিলেন। ই-চিঙ্ ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে এই বন্দরে আসিয়াছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে যে বাণিজ্য সংঘটিত হইত, তাহার কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। তৎপরে তাম্রলিপ্ত পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১০২১ হইতে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোড়দেব রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণাংশ উৎখাত করিয়া ধনাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে চোড়গঙ্গদেব মন্দার-নরপতিকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করিয়াছিলেন।

অফগান ও মোগলদিগের অনেক খণ্ডযুদ্ধ এই জেলার মধ্যেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বহু যুদ্ধের স্মৃতি এই জেলা বহন করিয়া আসিতেছে।

অনেক দিন ধরিয়া দেশ হইতে শান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে মোগলেরা রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সে শান্তিও বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে এখানে তিনবার অশান্তির আগ্ন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলোলুপ সম্রাট-কুমার খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া, দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যসহ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। হিজলী অবরোধে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার দেশে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহাদের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহানলে তৃতীয়বার এখানে অরাজকতা ও অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়। শোভাসিংহ অফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গলা লুণ্ঠন করিতে থাকে। সম্রাট্-পুত্র অজিম-উস্-শান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ যখন উৎপীড়িত হইতেছিল, তখন মেদিনীপুরের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। ইহাদের হাঙ্গামায় মেদিনীপুরের যত ক্ষতি হইয়াছিল, বাঙ্গালার কোন জেলার তত ক্ষতি হয় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে চুয়াড় হাঙ্গামায় মেদিনীপুরবাসীকে অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলায় প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কিয়ারচাঁদে দুইফুট হইতে চার ফুট উচ্চ প্রায় হাজারটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্তম্ভ দাক্ষিণভারতে ও পুরুলিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এগুলি প্রথম প্রোথিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকের মতে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বুনো জাতিদের কীর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গলার মন্দিরের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন, এখানকার অধুনাতন মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের মন্দিরের অনুকরণে তৈয়ারী। বগড়ীর পঞ্চরত্ন মন্দির, চন্দ্রকোণার লালজী মন্দির ও মেদিনীপুর সহরের প্রান্তভাগে নাড়াজোলরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুপুরের প্রভাব-নিদর্শন আছে। গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা ও কামেশ্বর মন্দির, চন্দ্ররেখাগড়ের সহস্রলিঙ্গ মন্দির ও দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দির ওড়িষার মন্দিরের মত। প্রায় দুই শত বৎসর ওড়িষারাজদিগের প্রাধান্য এই জেলায় ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি সেই সময়েরই বলিয়া মনে হয়। তমলুকের বর্গভীমার মন্দির সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে চান, এটীও ওড়িষা-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু এ মন্দির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। যদিও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর ইহলোকে নাই—কিন্তু আমার পরমসুহৃদ ওড়িষার স্থাপত্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সত্য নির্দ্ধারণের পথ সুগম হইয়া যাইবে। ওড়িষার রাজা কপিলেশ্বরদেবের সময়ে পঞ্চদশ শতকে কেশিয়াড়ির নিকট গঙ্গেশ্বরে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে মুসলমানগণ উহা আপনাদের মসজিদে পরিণত করে।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্গ, গড় ও পরিখার চিহ্ন যত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালার কোন জেলায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পুরাকীর্ত্তির বিবরণ ও দুর্গাধিপতিদের কাহিনী সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাস গঠনে এগুলি সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের সহৃদয় ইতিহাসানুরাগীদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে চাই।

এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ ইতিহাস গঠনে কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা আমি সংক্ষেপে ইতিহাসালোচনার প্রসঙ্গে কিছু বলিব;

কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা দুইজন প্রতিভাশালী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে হারাইয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ও মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ইঁহারা দুইজনে স্বনামধন্য ইঁহাদের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। এই সময় কয়জন প্রত্নতত্ত্ব প্রতীচ্য পণ্ডিতেরও মৃত্যু হইয়াছে। আপনাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত সেই সমস্ত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদেরও নাম এখানে না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে মনে করি। অধ্যাপক সেন্, মাস্পেরো, ফ্লাট, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, ভেনিস, কিড্ হর্ণ্লে এগ্গেলিঙ্ ও কার্ণ, এই সকল মৃত মহাত্মাদের সকলেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চারি দিকেই ইতিহাস আলোচনার একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়িয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দের মধ্যে ইতিহাস-বিজ্ঞানে একটা মস্ত ওলট্-পালট হইয়া গিয়াছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মিসর, আসিরিয়া, কাল্ডিয়া, বাবিলোনিয়া, চীন, মধ্যএসিয়া ও পারস্য দেশ যে সমস্ত লুপ্ত রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ছিল, অদম্য অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সম্প্রতি তাহাদের কয়েকটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাসপাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন, প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রব্বি বেঞ্জামিন, বাবিলন ও নিনেভের ভগ্নাবশেষের কথা বলিয়া যাইবার পর হইতেই এই সকল স্থানের লুপ্ত গৌরবের দিকে লোকে আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৬শ শতকের শেষভাগ হইতে অনুসন্ধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। Sir Gardner Wilkinson এর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন মিসরের সামাজিক আচারপদ্ধতি আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। অধ্যাপক Lepsius, প্রুশীয় Fxplosius Expedition এর অধিনায়ক হইয়া সুডানে মিসর প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং সেই দেশের ইতিহাস সঙ্কলনোপযোগী উপাদান সমূহ বার্লিনে লইয়া গিয়াছেন। তারপর Mariette বাটি খুঁড়িয়া Lespsius এর কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অতঃপর Cairo Museum স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে আসিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াও অনুসন্ধান চলিতেছিল। ফরাসী বোতা (P. E. Botta) ও ইংরেজ লেয়ার্ড

(Layard) অক্কাড-রাজ সারগন ও সেনাখেরিব (Sennacherib) ও অন্যান্য অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু আসিরীয়ার রাজাদের প্রাসাদাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বাবিলোনিয়ার কয়েকটী প্রাচীন নগরের অস্তিত্বও জানা গিয়াছে, এবং তন্মধ্যস্থ মৃৎপুস্তকের গ্রন্থাগারও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় সংরক্ষিত আছে। বাবিলন-মন্দিরগুলির গঠনপ্রনালী কিরূপ ছিল, তাহাও মন্দিরনির্ম্মাণকারী বাবিলন ও আসীরিয়ার রাজগণের লিপি হইতে জানা যায়। সম্প্রতি নিপ্পুর, বাবিলন ও আশুরে কয়েকখানি "ground plan" মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রত্নানুসন্ধান-ফলে আর্য্য ও ককেসীয় জাতির সংমিশ্রনে উৎপন্ন হিটাইট্ নামক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই হিটাইট্ জাতিদ্বারা মিতান্নিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে মিতান্নিজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হিটাইদের রাজার অনুগ্রহে বোগজকোই-এর (Boghas-Koyi) সন্ধিসূত্রে মিতান্নিরাজ দশরত্তপুত্র মত্তিউজ (Mattiuza) পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে প্রভাবশালী হিটাইট্ জাতি মিতান্নিরাজ্যকে আপনাদের রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিটাইটগণ এসিয়ামাইনরের উত্তর-পূর্ব্বে কাপ্পাডোকিয়ায় (Cappadocia) আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহারা আসিরীয়দিগের নিকট "খত্তি" এবং মিসরবাসীদিগের নিকট "খেত" নামে পরিচিত ছিলেন। কালের প্রভাবে এই জাতির অধঃপতন ঘটে। আর্য্যজাতির আর এক শাখা আসিয়া ইঁহাদের হৃত রাজ্য অধিকার করে। কয়েকজন পণ্ডিত সম্প্রতি ইঁহাদের ভাষা পাঠ করিয়াছেন। রংগোজিন ও আর একজন হঙ্গেরীয় পণ্ডিত ইহাদের এ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বোগজকোই-এর গিরিস্থাপত্যে হিটাইটদের শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্মৃতিফলকগুলিতে কিছুদিন পূর্ব্বে Mi-it-ra-as-si-il, U-ru w-ra-as-si-el, In-da ra, Na-sa-at-it-ia-an na অর্থাৎ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, এই চারিটী দেবতার নাম পাওয়া গিয়াছিল। এখন আবার বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির

মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার শ্রদ্ধেয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বন্ধু শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংবাদ দিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমাপ্ত করিলে হিটাইট্‌দিগের সঙ্গে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয় আর্য্যদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে।

মধ্য এসিয়ায় সার অরেল ষ্টাইনের নেতৃত্বে প্রাচীন কীর্ত্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি, ইষ্টক, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী, গুপ্তব্রাহ্ম প্রভৃতি বহু ভাষার অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এসিয়া এক সময়ে গ্রীক, পারস্য, ভারত ও চীনপ্রভাবের মিলনক্ষেত্র ছিল। আমরা এখন মহামতি ষ্টাইনের আবিষ্কারের ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, শিল্প ও ধর্ম্মব্যাপারে মধ্য-এসিয়ার উপর ভারতের প্রবল প্রভাব বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই স্থানের ভাষা ও শাসনব্যাপারে কিছুকাল ভারতপ্রভাবের প্রতাপ বড় কম ছিল না। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে ভারত যে তাহার এসিয়ার প্রতিবেশীদিগের উপর সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ষ্টাইনের 'প্রাচীন খোটান' ও 'সের ইণ্ডিয়া' তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দিকে অক্লান্তকর্ম্মা Sven Hedin তিব্বত ও মানস-সরোবরের কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যাপার আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, ভারত-গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। রলিন্‌সন্, ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ফুশে, কোগেলপ্রমুখ পণ্ডিত, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ৯০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতালোকে ভারতবহির্ভূত অনেক জাতি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আবার স্যর চার্ল্‌স্ এলিয়ট্‌প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, ভারতবহির্ভূত জাতির উপর ভারতের প্রভাব বড় অল্প নয়। এক জাতি যদি অন্যের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে পরস্পর প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ অপর জাতির উপর ভারতের প্রভাবের কথা এই সমস্ত পণ্ডিত কিছু কিছু বলিয়াছেন।

ভারতের একটা কলঙ্ক আছে—ভারতবাসী দেশ ছাড়িয়া যাইতে চায় না; কিন্তু ইঁহারা দেখাইতেছেন যে, ভারতবর্ষ সমুদ্র ও পর্ব্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অতি প্রাচীনকালে ভারত-বাসী সমুদ্র ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দেশদেশান্তরে যাইত ও নানা স্থানে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করিত। প্রাচীন ভারতবাসী ভারতের বাহিরে, সুদূর অঞ্চলেও দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে, সাম্রাজ্য-স্থাপন করিয়াছে, এবং

ভাব ও ভাষার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রভাব—ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবাসী যে ভারতের বাহিরে রাজ্যবিজয়ে অনভ্যস্ত ছিল না, শ্রীবিজয়ের বিবরণ ও রাজেন্দ্রচোড়ের লিপি তাহার দৃষ্টান্ত। ভারতবাসী ভারতের বাহিরে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছে সত্য কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যবদ্বীপ, কম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে এক সময় হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়াছিল, এক সময় সুদূর বোর্ণিও দ্বীপেও হিন্দুর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইত। যবদ্বীপ ও মলয় অঞ্চলে ইসলাম-প্রভাব প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, হিন্দুপ্রভাবকে ম্লান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যবদ্বীপে ভারতীয় বর্ণমালা এখনও বর্ত্তমান, ভারতীয় রীতিনীতি এখনও প্রচলিত। সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম; কম্বোজ, চম্পা ও যবদ্বীপে যে ধর্ম্ম, শিল্প, লিপি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাও হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত। আর তিব্বতের কথা বলিতে গেলেও ঠিক একই কথা বলিতে হয়। পদ্মসম্ভব তিব্বতীদের মহামান্য লামাগুরু। ইঁহার অপর নাম পদ্মাকর। ওয়াডেল্ বলেন, তিনি ৭৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একশত পণ্ডিত লইয়া তিব্বতে গমন করেন। এই ভারতবাসী তিব্বতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও লামার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পূর্ব্বে রাজা স্রোঙ্ সনের (Srong-btsan) সময় হইতে (৬৫০ খৃঃ) ভারতবর্ষ ও চীন হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মধ্যে মধ্যে তিব্বতে গমন করিত। পদ্ম-সম্ভবের তত্ত্বাবধানে তিব্বতের অন্তঃপাতী সম্-য়াস্ প্রদেশে ভারতীয় নালন্দমঠের আদর্শে তিব্বতের প্রথম মঠ নির্ম্মিত হয়। তিনি তাঁহার আত্মীয় শান্তরক্ষিতকে সেই মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রভাব ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়া-ছিল—কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তেমন করে নাই। চীন, জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি স্থানে চৈনিক ভাবেরই প্রাদুর্ভাব বেশী। শিল্প, নীতি, সাহিত্য—সকলই চীনের। চীন ভাষার বর্ণমালা খাঁটি চীনা। কিন্তু চীন ও জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতেরই সম্পত্তি।

ফরাসী পণ্ডিত ফুরনেরো তাঁহার "প্রাচীন শ্যাম" পুস্তকে বলিয়াছেন, পুরাতন লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে পূর্ব্ব উপদ্বীপ ছয়টী

রাজ্যে বিভক্ত ছিল—(১) টনাকিন উপসাগর হইতে লাওস অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রদেশ যবন দেশ নামে অভিহিত ছিল; (২) চম্পাদেশ বর্ত্তমান আনাম; (৩) উত্তর পশ্চিমে সয়ম্ দেশ; (৪) কম্বুজদেশ, ইহা এখনকার কাম্বোডিয়া, (৫) রমন্যদেশ ও (৬) মলয় উপদ্বীপ—এই ছয়টি দেশে অল্পবিস্তর ভারতীয় বীজ উপ্ত হইয়াছিল। কাবাস্তন, ফিনো, এমেনিএর, ফর্গুসন প্রমুখ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত দেশের জাতিদিগের মধ্যে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও শিল্পে এগুলি তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। যবদ্বীপেও যে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা স্থলপথ দিয়া নয়, জলপথ দিয়া।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক অনুসাশন ও গুহা-মন্দিরস্থ লিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কোন পণ্ডিতই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাহ্লীকদিগের ভারত আক্রমণ ও পঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন সত্য কিন্তু এসম্বন্ধে মূল গ্রন্থ লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া আলোচনা না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বাহ্লীকদিগের পর শক-জাতি আসিয়া কাঠিয়াবাড় ও মালবে ২০০ বৎসরও অধিকাল শাসন করে। ইহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। শকদিগের পর উত্তর ভারতে কুষাণদের আগমন। ইহাদের দুইটি বংশ ছিল, কণিষ্কই শেষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহাযান-সাহিত্যে ইঁহার নাম অধিক প্রসিদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাকে সাধারণতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে স্থাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বিশেষরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদে ফেলিয়াছেন। তিনি মালব ও অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত কুষাণ-লিপির অব্দ পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রারম্ভ ১০০ খৃষ্টাব্দেই স্থির করিয়াছেন। তবে তাহার এই মত অন্যান্য পণ্ডিতেরা মানিতে চান না। কণিষ্কের সময় সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। তার পর গুপ্তদের সময়ে কুষাণ, কাঠিয়াবাড় ও মালবের শকেরা হতবল হইয়া পড়ে। আর বিদেশীয়েরা ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। আভীরগণ দলে দলে আসিয়া হিন্দু হইয়া যায় এবং ভারতীয়দের শাখা বলিয়াই চলিয়া যায়। নাসিকে আভীরের একখানি লিপি দেখিয়া স্যর ভাণ্ডারকার বলেন, তাহারা মহারাষ্ট্র দেশে, সম্ভবতঃ

খান্দেশে রাজত্ব করিত। গুর্জরগণও বাহিরের জাতি—পঞ্জাবের পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজপুতনায় তাহারা রাজ্য স্থাপন করে। সেখান হইতে কনৌজ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করে। এইরূপ জাতিদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা হয় নাই। রাজপুতদেরও দুই একটা শাখা বাহির হইতে আসিয়াছে। ধারা ও উজ্জয়িনীর পরমারবংশের বিবরণ এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। ইহাদের অনেক উপাদান আছে। যৌধেয়দের সম্বন্ধে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার অনেকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রত্নতত্ত্বালোচনা যাহা কিছু করা হইয়াছে, প্রধানতঃ মুদ্রা ও লিপির সাহায্যেই হইয়াছে।

সম্প্রতি মুদ্রা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত মুদ্রার লিপি অনুশীলন করেন নাই। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অণুবীক্ষণ সাহায্যে অস্পষ্ট মুদ্রালিপি ও মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্ত্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিয়া মুদ্রার নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গার্ডনার একটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পুরু একটি হস্তীর উপর আসীন রহিয়াছেন ও আলেকসন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, হস্তে বল্লম লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় উহার ছায়াচিত্র অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিয়া বলিতেছেন যে, হস্তীর উপর আসীন যোদ্ধা অশ্বারোহী ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই একটি ঘটনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এই সব প্রণালীতে মুদ্রার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিলে হয়ত মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণে মুদ্রাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্বের উপযোগিতা কত বেশী তাহা প্রত্যেক ইতিহাস অনুশীলনকারীই অবগত আছেন। তবে মুদ্রা বা লিপি হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, মুদ্রা বা লিপি জাল কি না, অথবা কোন ইসলাম্ আখুন কর্ত্তৃক অরেলষ্টাইনের ন্যায় মুদ্রা বা লিপিপরীক্ষক প্রতারিত হইতেছেন কি না।

ভারতের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে কয়েকটি সমিতি বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। লর্ড কার্জনের সময়ে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়।

১৯১০ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলী ডাক্তার ফোগেল, কার্ণ প্রভৃতি মনীষীর সাহায্যে Panjab Historical Society স্থাপন করেন। এ দিকে Behar and Orissa Research Societyও খুব কাজ করিতেছেন। মৌর্য্যদের পূর্ব্বভারত ইতিহাস-সম্পর্কে ১৮২৫ সাল হইতে কলিঙ্গরাজ খারবেলের লিপি জানা ছিল। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী হাতি-গুম্ফার উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। প্যারিসের ষষ্ঠ কংগ্রেস বিবরণে এই পাঠোদ্ধার আছে। ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লীট ও লুডার্স এই অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ভিন্সেণ্ট স্মিথের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল খারবেল লিপির পুনরায় পাঠোদ্ধার করিয়া "১৬৫" মৌর্য্যাব্দে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। ইহার ফলে ভিন্সেণ্ট স্মিথ সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ ৫০ বৎসর করিয়া পিছাইয়া দেন। এই লিপি সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বাদানুবাদ চলিতেছে। এই লিপির সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেখিতে হইবে, খারবেল নামক রাজার এই লিপি ব্যতীত অন্য কোথাও পরিচয় পাওয়া যায় কি না, বাহাপতি মিত্র ও পুষ্যমিত্র এক ব্যক্তি কি না, পুষ্যমিত্রের সহিত খারবেলের কোন সংঘর্ষ সুঙ্গবংশের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় কি না, এই বিষয়গুলি আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিয়া, এই লিপির সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা দেখিতে হইবে।

এইবার আমরা আমাদের বঙ্গদেশের বিষয় কিছু বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশাল গবেষণাক্ষেত্রের কোন কোন অংশে এখনও কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। মৃত্তিকাগর্ভে যে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ লুক্কায়িত আছে, তাহার উদ্ধারের জন্য যে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ প্রয়োজন, তাহা এখনও বিশেষভাবে করা হয় নাই। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী গৌড়, মুর্শিদাবাদে রাঙামাটী ও পাঁচথুপী, বগুড়া জেলায় মহাস্থান, পাহাড়পুর, বিহার ও মহীপুর, দিনাজপুরে জগদ্দল প্রভৃতি প্রাচীন স্থান ঐতিহাসিকগণের তত্ত্বাবধানে খনিত হইলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য নিশ্চয়ই বাহির হইবে। বর্ত্তমান প্রণালীর ইতিহাস আলোচনা এ দেশে

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ঊনবিংশ শতকে তাঁহাদের বিপুল প্রচেষ্টার ফলে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অনেক লুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই শতকের শেষভাগে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী ও রামকৃষ্ণভাণ্ডারকারপ্রমুখ ভারতবাসী ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অধুনা তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে বলিতে পারা যায়, ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারতীয়ের কৃতিত্ব কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। পাদ্রে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিবার পর, রাজা রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ"-সংগ্রহে" বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তারপর "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। শ্রদ্ধেয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ছোট রকমের একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া ফেলেন। 'বঙ্গদর্শন' উঠিয়া যাইবার সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হন। ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুপ্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মৌলিক গবেষণাদ্বারা আমাদের দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ লেখকগণের পথ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করিয়া দিতেছেন। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাজসাহীতে আজ কয়েক বৎসর হইল, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এই সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ইহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সকল বিভাগের পরিচয় দেওয়া এই অল্প সময়ে সম্ভবপর নয়। তবে উদাহরণস্বরূপ দুই চারিটী বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব। গুপ্তরাজাদিগের কোন লিপি পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না, এক্ষণে তাঁহাদের একখানিমাত্র তাম্রশাসন বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানি প্রথম কুমার গুপ্তের লিপি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমার গুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত—এই কয়জন গুপ্তরাজারও কয়েকটী মুদ্রার আবিষ্কার বাঙ্গালা দেশে হইয়াছে। এইরূপ প্রমাণ আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের দেখিবার সুবিধা হইবে, বঙ্গদেশ কোন দিন গুপ্তদিগের

অধিকার-ভুক্ত ছিল কি না।

ভৌগোলিক সংস্থান-নির্ণয় ইতিহাসের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ভৌগোলিক সংস্থান স্থির না হইলে ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া অনেক সময় গোলমালে পড়িতে হয়। বঙ্গের কোন্ সময়ে কতটা সীমা ছিল, বঙ্গ নাম কেন হইল, বঙ্গে কত জাতির প্রভাব ছিল এবং বঙ্গের উপর অন্য জাতির প্রভাবের পূর্ব্বে ইহার অধিবাসীরা কিরূপ ছিল, এই সমস্ত বিষয়েরও মীমাংসা করিতে হইবে। দশকুমারচরিতে পাওয়া যায়, "সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী।" দামলিপ্তী বা তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুরের তমলুক; দেখা যাইতেছে, ইহা এক সময়ে সুহ্মের রাজধানী ছিল; সুতরাং সেই সময়ে সুহ্মের সংস্থানও স্থির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বরাহমিহিরের সময় সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত পৃথক্ ছিল। কেননা, তিনি "তাম্রলিপ্তকাঃ" ও "সুহ্মাঃ" পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দিকে মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ, সুহ্ম ও রাঢ়ের একই অর্থ করিয়াছেন। পালি মহাবংশের নির্দ্দেশ হইতে বঙ্গ ও মগধের মধ্যে উত্তর-রাঢ়ের সংস্থিতি পাওয়া যায়। কাজেই নীলকণ্ঠের "রাঢ়" ও সুহ্ম অভিন্ন হইবার পক্ষে আপত্তি থাকে না। এইরূপে যে সমস্ত স্থানে সুহ্মের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় একত্র সমাবেশ করিয়া বিভিন্ন সময়ে সুহ্মের সংস্থান ঠিক করিতে হইবে এবং সুহ্ম বলিতে আসাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান বোঝা সম্ভব কি না, তৎসম্বন্ধে সমস্ত তর্কের সমাধানও করিতে হইবে। পুণ্ড্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থান লইয়াও অনেক তর্ক আছে। এই সমস্ত স্থানের সংস্থান লইয়া বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।

সমতটের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া এত দিন ঐতিহাসিকগণ নানারূপ মতবাদের অবতারণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বেলাকিনিয়া গ্রামে উৎকীর্ণ লিপি সমেত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে 'বিষবিষীক্ষ' গ্রাম যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা ক্ষোদিত আছে। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা যে সমতটের অন্তর্গত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। "বাঙ্গালা-নগরে"র সংস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বারেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। একণে ১৯২০ সালে Hodivala ও ১৯২১ সালে Geographical journal এ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়াছেন।

ভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার নায়কদিগের সঠিক বিবরণ জানা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার কারণ, মানব যে ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সঠিক পরিচয় সহজে সকলে পায় না; কিন্তু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সমাজে চলিয়াছিল, তাহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

একটা চলিত প্রবাদ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শন পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় (History repeats itself)। কথাটা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ততটা অন্ত ঘটনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কোন অবস্থাবশে কোন দেশে যে প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়াছিল, সেই অবস্থা-সমাবেশ যদি অপর দেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি, প্রাগুক্ত-রূপ অনুষ্ঠান শেষোক্ত দেশেও কার্য্যকর হইতে পারে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের বহু দেশ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতা-ধারার অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি কি অবস্থায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এমিল রাইখ (Emil Reich) সত্যই বলিয়াছেন,—"The untravelled historian is like a chemist who has no laboratory. Travel and sojourn in countries of different types of civilisation can alone give those object impressions of the forces of history without which the related facts can be neither interpreted nor co-ordinated" ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা অবশেষে যেমন রাসায়নিক সত্য বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ বহু দেশের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর ঘটনা পরিদর্শন করিয়া আমরা তেমনই ঐতিহাসিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। তর্কশাস্ত্রের মতে কারণ সেই অবশ্যম্ভাবী অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বঘটনা বা ঘটনার সমাবেশ, যাহা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। শুধু বর্ত্তমানের আলোচনা করিলে প্রকৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিবে না। বিগত শতকে আরনল্ডপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানের উপর ইতিহাস গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বর্ত্তমানের দ্বারা অতীতকে বুঝিতে হইবে, আবার অতীতই যে বর্ত্তমানের কারণ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। তাই ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য, অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক সমালোচনা করা। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, অতীতের সমস্ত ঘটনা পরস্পর এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রাকারে গ্রথিত- শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটী ঘটনাকে সেই শৃঙ্খলা

হইতে বিচ্যুত করা যায় না। প্রত্যেক ঘটনাই সমগ্রের অংশ—সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার কোন অর্থই থাকে না। অধ্যাপক বুরী বলিয়াছেন, জীবদেহ হইতে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সেই অঙ্গের কোন মূল্য থাকে না, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা হইতে বিযুক্ত করিয়া কোন একটী ঘটনাকে পৃথক্ ভাবে দেখিলে তাহারও কোন মূল্য থাকে না। এ বিষয়ে আমরা দর্শনাভিমুখ ইতিহাস আলোচনাকালে বিশেষ ভাবে বলিব। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং এইগুলিই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতিহাসের কতকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। মানবের কার্য্যাবলী লইয়া যখন ইতিহাসকে নাড়াচাড়া করিতে হয়, তখন এই মানবের প্রকৃত তত্ত্ব বোঝাও আবশ্যক। নৃতত্ত্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। তার পর সমাজ বা জাতিতত্ত্বের আলোচনাও ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

প্রধানতঃ ভূগোল, জীবনবৃত্ত, ব্যবহারশাস্ত্র, পুরাবৃত্ত, ধর্ম্ম, আচার ও সাধারণ জ্ঞান ইতিহাস রচনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এ গুলি গৌণভাবে রচনায় ইতিহাস সহায়তা করিয়া থাকে। তার পর প্রাচীন বংশাবলীর প্রশস্তি প্রভৃতির সহিত পরিচয় না থাকলে, মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ইতিহাসের স্রোত ত্রিধা প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার একটী ধারা কলাভিমুখী, অন্যটি বিজ্ঞানামুখী, তৃতীয়টি দর্শনাভিমুখী। এই তিন ধারার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে ঐতিহাসিক প্রণালীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মানবই ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির একটা সীমা আছে; সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলা বা আর্টের আবশ্যক। প্রকৃত ঐতিহাসিকের নিকট জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকা চাই—তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারিবেন, যিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন। সাংসারিক বুদ্ধি যাঁহার যত বেশী, তিনি ঐতিহাসিক সত্য তত অল্প আয়াসে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য নির্দ্ধারণ। ঘটনাবলী পাইলেই ঐতিহাসিক তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন না। তিনি তর্ক ও দর্শন-শাস্ত্রের কষ্টি পাথরে সেগুলি যাচাই করিয়া দেখেন—তাহারা খাঁটি সত্য কি না। তাই বলিতে-

ছিলাম, ঐতিহাসিক হইতে গেলে তাঁহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক আলোচনার পথকে দুর্গম করিয়া দিয়াছে। এখন শুধু ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না। অবশ্য ঘটনার তালিকা বা পৌর্ব্বাপর্য্য-সূচী যে ইতিহাসের অঙ্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইতিহাসের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না বা কেবল মাত্র ইহার উপর ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না।

চার্লস এনানডেল (C. Annandale) চিত্রবিদ্যার সহিত ইতিহাসের তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক চিত্রকর ও ঐতিহাসিকের কার্য্য কতকটা একই প্রকারের। প্রকৃতি চিত্রকরকে উপাদান-সম্ভার দিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্যশালিনী স্বভাবরাণী কোথাও সমগ্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখেন নাই। শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে চিত্রকরকে উপাদানগুলির সংস্কার করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়; তার পর তুলিকার সাহায্যে যথাযথ বর্ণ সংযোজন করিয়া, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়; সেইরূপ সমাজ, ইতিহাস গঠনের উপাদান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে, ঐতিহাসিককে ঐ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত, ঘটনার ফিরিস্তি করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি আবার করি—ঘটনার কারণানুসন্ধান তাঁহার অন্যতম কার্য্য। কোন্ অবস্থায় কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল, তাহাও দেখা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। পটুয়া ও চিত্রকরে যেরূপ প্রভেদ, ঘটনার ফিরিস্তি-বিবৃতিকারী ঐতিহাসিক ও ঘটনার কার্য্যকারণ-আবিষ্কারক ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ। প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর ও ঐতিহাসিক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" শ্রেণীর নকলনবিশ মাত্র। চিত্রকর ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের সাধারণ ও বিশেষ দুই প্রকার গুণ থাকা উচিত। সাধারণ গুণ অর্থে যে কেবল সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু বুঝিতে হইবে—প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। যে শক্তিবলে ঐতিহাসিক মানবকে জ্ঞানের পথে সত্যনির্দ্ধারণে সহায়তা করে—যে শক্তিবলে মানব তাঁহার নিকট হইতে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহাই এই প্রকৃষ্ট মানসিক শক্তি। দার্শনিক বেকনের মতে ইতিহাস স্মৃতির উপর, দর্শন জ্ঞানের উপর ও কবিতা

কল্পনার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ ইতিহাস যে স্মৃতির উপর কতকটা নির্ভরশীল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ঐতিহাসিককে মানবের ঘটনা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মানবের প্রত্যেক ঘটনার সহিত স্বার্থ বা বিরাগ ও অনুভূতি কতক পরিমাণে জড়িত থাকেই থাকে। প্রকৃত ঐতিহাসিককে এগুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় সত্য নির্দ্ধারণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ভাবাবশে ঘটনাকে বিকৃত করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রমাণগুলিকে ব্যবহারাজীবির মত দেখিলেও চলিবে না; তাহা হইলে ঐতিহাসিক একদেশদর্শী হইয়া পড়িবেন। তাঁহাকে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া স্থিরচিত্তে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে, প্রমানগুলি বিচারসহ কি না। আর দেখিতে হইবে, কোন অবস্থাবশে মানব কোন কার্য্য করিতে পারে। মানবের সুখদুঃখের অংশভাগী তাঁহাকে হইতে হইবে—সহকর্মী হইয়া তাঁহাকে ঘটনাগুলি দেখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি ঐতিহাসিকের চাই 'সু-মতলব।' কু-মতলবে আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনাকে বিকৃত না করিয়া অথবা ঘটনা হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সত্যবদ্ধ ঐতিহাসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। বক্তব্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলাও ঐতিহাসিকের আর একটী সাধারণ গুণ। বর্ণনভঙ্গী অর্থে রচনা-প্রণালী বুঝিলে চলিবে না—ভাব ও চিন্তার ধারাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের বর্ণনভঙ্গী।

এই পর্য্যন্ত ইতিহাসের ধারা কলাভিমুখী। ঐতিহাসিকের বিশেষ গুণ আলোচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। আজ কাল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীদ্বারা ইতিহাসের আলোচনা হউক, এ কথা আমাদের দেশে অনেকেই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ইতিহাস আলোচনা সম্ভবপরই নয়। ঐতিহাসিক যে যুগের ইতিহাস লিখিবেন, সেই যুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা ও দেশের অবস্থার বিবরণ বা statistics সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্কশাস্ত্রের মতে ঘটনাপরিদর্শন জন্য যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে,

বাঙ্গালার রাজাদের সময় লইয়াও অনেক গোলমাল। ধর্ম্মপাল, হরিবর্ম্মা ও বল্লালসেনের সময় এখনও ঠিক হয় নাই। ১৯১৭ সালে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় বিজয়সেনের তাম্রশাসনে "৬১" রাজ্যাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা "৩২" বলিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইবে বলিয়া মনে হয়। এই রাজ্যাঙ্ক "৬১" হইলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, বিজয়সেন ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আসিয়া পড়েন। তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত লক্ষ্মণসেনের প্রথম রাজ্যাঙ্ক যে ১১১৮—১১১৯ খৃষ্টাব্দ, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে আবার মিথিলার সমস্ত পঞ্জিকার উল্লেখে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের আরম্ভ ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। মিথিলায় যাবতীয় পুঁথিতেও এই সময়ই পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় বিচারকালে এই বিষয়টিও উপেক্ষিত না হইয়া আলোচনার সহায়ক হইতে পারে।

সম্প্রতি চন্দ্রবংশের রাজাদেরও কালনিরূপণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুলগ্রন্থকে কেহ কেহ একেবারেই ইতিহাসে স্থান দেন না। কুলগ্রন্থে যে সকল নৃপতির নাম আছে, সেগুলি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেমন পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পারে, সেইরূপ কুলশাস্ত্রও একেবারে উপেক্ষার জিনিস নয়। ইহাতেও ঐতিহাসিক মালমসলা আছে। তবে সেগুলি অতি সতর্কতার সহিত বিশ্লেষণ করা চাই। কুলগ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে নাই, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কুলগ্রন্থে অনেক সময় বিবরণে ভুল থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইতেও সময় সময় সত্য বাছাই করিয়া লইতে পারা যায়।

কয়েকজন ঐতিহাসিক কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহ করিবার কারণও আছে। ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান বলিয়াও কেহ কেহ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই যে, বাঙ্গলার ঐতিহাসিককে সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রসার নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের নিকট আজকাল যাহা 'ইতিহাস', খুব প্রাচীন কালে 'ইতিহাস' বলিলে ঠিক তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বকল্পে ঘটিয়াছিল এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইত অর্থে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইত—ইতি—হ আস অর্থাৎ ইতি= ইহা, হ,—নিশ্চয়, আস—হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষ প্রণীত "'সুমঙ্গলবিলাসিনী"র "অম্বট্‌ঠ সুত্ত বন্ননা"র এইরূপ পাই—"ইতিহাস পঞ্চমং—অথব্বণবেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস ইতি ঙ আসাতি ঈদিস বচন পতিসংযুত্তো পুরাণ কথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতে সন্তি ইতিহাসপঞ্চমা। তেসং ইতিহাসপঞ্চমানং বেদানং। কোন প্রাচীন কথার শেষে "ইতি হ আস" এই কথাটি বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তখন প্রাধানতঃ চারিটী প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত,—প্রথম ইতিহাস. দ্বিতীয় পুরাণ; তারপর আর দুইটী হইতেছে—"শ্লোকাঃ" ও "নরাশংসী"কোন ঘটনা সমাবেশে বড়লোকের কথাবলিয়া বহুবচনান্ত "শ্লোকাঃ" এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন একপ্রকারের আখ্যায়িকার নাম ছিল "পুরাণ"। "ইতিহাস পুরাণ" এক সঙ্গেও কোথাও কোথাও আছে।

ইতিহাসের-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে। কোন কোন জায়গায় "পুরাতন ইতিহাসে"রও উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের "পুরাতন ইতিহাস" বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনুগীতার সময় বৈদিক প্রবাদ পুরাণ হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ "পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে। বেদে "নারশংসী" নামে একরূপ আখ্যায়িকা আছে। এগুলি অনেকটা History"র মত। এগুলিতে প্রাচীন লোকদের বংশবিবরণ থাকিত আর থাকিত তাহাদের গুণকীর্ত্তির গাথা। রাজপুতানা ও গুর্জ্জরের চারণদের গানে এগুলির কিছু আভাস পাওয়া যায়। নারাশংসীর ন্যায় "গাথা" বলিয়া

একরূপ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। এইগুলি বৈদিক যুগের পরে নারাশংসীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া "নারশংসী গাথা" বা শুধু "গাথা"য় পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার উপবিভাগও বৈদিক সাহিত্যে বিরল নয়। আখ্যান, অন্বাখ্যান, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি যে এই সমস্ত আখ্যায়িকার কোনরূপ উপবিভাগ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এগুলি কিরূপ ছিল, তাহা জানি না। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিবার সময় এখনও হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে একটু ইঙ্গিত করিবা চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

ডিল্‌থে (W. Dilthey) ট্রএল্‌ট্‌শ্ (E. Troeltsch) ভুণ্ট্ (W. wundt), এনান্‌ডেল্ (C. Annandale) ও জর্জ্জপ্রমুখ পণ্ডিত-মণ্ডলী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস কি এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। এ বিষয়ে দশজন পণ্ডিতে যে সমস্ত কাজের কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমি বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া, তাঁহাদের উক্তির সার নিষ্কর্ষ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীসদেশের সুপণ্ডিত হেরোডেটস্ ইতিহাস অর্থে ঘটনার বিবৃতি ও মানবের সামাজিক ও নাগরিক অবস্থার বর্ণনই বুঝিয়াছিলেন; বহুদিন ধরিয়া এই মনীষীর পথানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ ইতিহাসের এই সংজ্ঞাই নির্দেশ করিয়া আসিতেছিল। তারপর ইতিহাসের পরিসর আর একটু বাড়াইয়া দিয়া, পণ্ডিতেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির অন্তস্তল তন্ন তন্ন করিয়া যে সমুদয় সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাও প্রাকৃতিক ইতিহাস বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইল। এই অর্থেই শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাস, আবিষ্কারের ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, এমন কি, জীবনবৃত্তও ইতিহাসের সুবিশাল গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। ক্রমে পণ্ডিতেরা বুঝিলেন, এই অতিবিস্তৃতি-দোষদুষ্ট সংজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতিকে যে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না, তাহা নহে; ঐগুলি মানবের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমাজবদ্ধ মানবের সুখদুঃখের অনুভূতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তাহা হইলেও

থাকিতে হইবে, এগুলি সমাজজীবনের তন্ত্রীতে যে ভাবে আঘাত দেয়, প্রকৃত ইতিহাস সে ভাবে আঘাত দেয় না। ইতিহাসের আঘাতে সমাজে যেরূপ সাড়া পাওয়া যায়, এগুলির আঘাতে সেরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইতিহাসকে কেবল ঘটনার বিবৃতি, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কদিগের জীবনের ঘটনার বিবৃতিতে পর্য্যবসিত না করিয়া, ইহার সীমা এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, সেই ঘটনাই ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে—যাহা দ্বারা সমবেত মানব সমাজ-গঠনপ্রয়াসী হইয়া, তাহার মঙ্গলকামনায় মানবসঙ্ঘের উন্নতি বা অবনতির কারণ হইবে—মানব-সম্মিলনের ভাবধারাকে বংশপরম্পরায় সঞ্জীবিত রাখিবে; অবশ্য সেই ভাবধারা যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, তাহা নহে—অবস্থাবিশেষে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। এই সম্মিলিত সমাজের কার্য্যাবলী, জাতি, রাষ্ট্র, রাজ্য, প্রজাতন্ত্র, সাম্রাজ্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা কোন সমিতি-সম্পর্কে 'সমিতির ইতিহাস' এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু সমাজ, ব্যবহারাজীব সমিতি, নাগরিক কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বা বংশাবলীর কাহিনী প্রকৃত ইতিহাস পদবাচ্য নহে। অবশ্য এগুলি যদি রাজনৈতিক উন্নতি বা অবনতির সহায় হয়, তাহা হইলে ইহারা ইতিহাস গঠন উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, ঘটনাবলী ও অনুষ্ঠাতাদিগের সংখ্যা অগণিত। ইতিহাস কেবল সাধারণ ঘটনার সমবায় নহে। কোন ঘটনাই আকস্মিক কারণে উদ্ভূত হয় না। যখন এইরূপ কতকগুলি সাধারণ ঘটনা কেন্দ্রাভিগ হয়। কিম্বা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করে, তখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাসের আলোচ্য হইতেছে এই বিশেষ ঘটনা। শুধু এইগুলির বিবৃতি করিয়া ইতিহাস ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কোন ইচ্ছাশক্তির বলে ঘটনার সমবায় বা বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার নামই কারণ—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ইহাকে Psychological motive বলিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক চিন্তা উদ্দেশ্যমূলক। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প মানব হৃদয়ে কেন উদ্ভূত হয় তাহা বুঝিতে হইবে—আর বুঝিতে হইবে, কেন ই বা মানব সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান

ঐতিহাসিককে সেগুলির প্রতি অবহিত হইতে হইবে। প্রমাণগুলির যথার্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, প্রমাণ-উত্থাপনকারীর ঘটনাবলী দেখিবার কতদূর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, ঘটনাপরিদর্শনকারী সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য পরবর্ত্তী কালের সাক্ষ্যের মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী। স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিফলক, দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ লিপির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও দেখিতে হইবে, কবে কাহাকর্ত্তৃক ঘটনার কত বৎসর পরে সেই স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছে কিংবা লিপি বা ফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে চাই না। দেশবিখ্যাত শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বর্দ্ধমান-সম্মেলনের সভাপতিরূপে এ বিষয়েরই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমি এ স্থানে (Troeltsch) ট্রএল্‌টশের সুচিন্তিত গ্রন্থের দু' একটী কথার পুনরুল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ইতিহাসেও সেইরূপ। পুঁথিগত বিদ্যা সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণ ভাব আবার কার্য্যকরণের নিয়মবশে চালিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের ব্যবহারিক কার্য্যকরী দিক্‌টা ছাড়িয়া দিলে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রত্যেক ঘটনা, কার্য্য, প্রণালী ও ঘটনার সূত্র কার্য্যকারণ-পরম্পরার নিয়মানুসারে নির্দ্ধারণ করা। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নামান্তর মাত্র।

জার্ম্মানদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বের্ন্‌হাইম (Bernheim) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমতে ইতিহাস আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানেরা এ বিষয়ে যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন ততদূর অন্য কোন জাতির ঐতিহাসিকগণ হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেনোবো (Seignobos) ও লাঙ্‌লোয়া (Langlois) সমাজবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি কতদূর প্রযোজ্য, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিষয় একই মানব। তবে সমাজতত্ত্বে মানব-সংহিতার (Communialism) দিক্ হইতে ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ নাই। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি এখানে কার্য্যকরী হয় না। সংহতির পূর্ণতার জন্যই ব্যক্তির আবশ্যকতা। সমাজই ব্যক্তির ইতিহাস, ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যাবলী লইয়াই ব্যস্ত। ব্যক্তির কার্য্য সমাজের পরিপন্থী কি না, তাহার বিচার ইতিহাস করিয়া থাকে। জার্ম্মান দেশের এই

পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অনুসৃত হয়। এখন সকল পণ্ডিতেরা একরূপ একবাক্যে এই পদ্ধতি, ইতিহাস আলোচনার সুষ্ঠু পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার দার্শনিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। কার্য্যকারণপরম্পারায় সূত্র ও ঘটনা একত্র সমাবেশ করিয়াই ইতিহাস নিশ্চেষ্ট থাকে না। জগতের যে কার্য্যকরী শক্তি সমুদয় সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ কি এবং প্রত্যেক যুগধর্ম্ম ও তাহার কার্য্যকরী শক্তি ইতিহাসের দ্বারা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সে সমস্যা-পূরণে সহায়তা করিবার জন্য ইতিহাস চেষ্টা করিয়া থাকে। দার্শনিক পরাবিদ্যায় "মানবআত্মার স্বরূপ," "জগতের আদিকারণ যিনি এই জগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও ধারণকরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি" ও "আত্মার স্বাভাবিক জীবন ও নৈতিক পার্থক্য প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাস কতটুকু সহায়তা করিতে পারে বা করিয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইতিহাস তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে; যুগশক্তি কিরূপে মানবহৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারও একটা বিচার করিয়া থাকে। এই বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়ীভূত নয় সত্য, কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা কেবল ঘটনা বা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিবার ইচ্ছা মনে স্বতই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন-সমাধান-চেষ্টাই ইতিহাসের দার্শনিক ধারা নামে কথিত হইয়া থাকে। পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, এখনও আমাদের দেশে এ শ্রেণীর ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হয় নাই, তবে আশা করিতে পারা যায়, শীঘ্রই কোন শক্তিশালী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে রাজনীতি, আইন, সৌন্দর্য্যানুভূতি-নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নগুলির সমীচীন সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐতিহাসিক প্রশ্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইখানে-দর্শনাভিমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে। ইহা নূতন একটা কিছুই নয়। চরিত্র-নীতির নিয়মবলে এ কার্য্য সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পূর্ব্বসূরিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক

ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; ল্যাইমাথের ও হেগেল প্রভৃতি জার্ম্মান মনীষীরা এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসৃত হইলে ইতিহাসের মূল্য আদর্শানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটু গোলমাল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই আদর্শের স্বরূপ কিরূপ হইবে—ভাবগত বা রূপরসগত বাস্তব আদর্শ? বাস্তব আদর্শকে ত একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আবার কেবল চরিত্রের দিক্ হইতে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে সফল হইবার সম্ভাবনা কমই দেখা যায়; কারণ, চরিত্রের মাপকাঠি কোথা হইতে পাওয়া যায়?—ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিয়াই ত চরিত্রের মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সেই তর্কশাস্ত্রের চক্রাবর্ত্তে (Reasoning in a circle—petitio principii) পড়িতে হইল। তাই বলিয়া যে এ বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল লাভ হইবে না, তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিক, ঘটনায় জনয়িত্রী শক্তির যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্দত্ত সামর্থ্যবলে যে কতকটা পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখানে চরিত্রের বিকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা উঠিবে। এই জীবনেই কি আমরা আত্মানুভূতি করিতে পারি? যদি আমাদের চরিত্রের বিকাশ আদর্শানুযায়ী এই জন্মেই না হয়, তা হইলে কি হইবে?—পরজন্মে আমরা সেই সূত্র ধরিয়া আত্মদর্শন করিতে কি পারিব না? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের দার্শনিক মত আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। তবে একটা কথা এখানে বলিতে চাই, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও অবনতি লইয়া ব্যস্ত। দার্শনিক ইতিহাসে জাতির শুধু উন্নতির দিকই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আর একটা কথাও এখানে বিচার করিতে হইবে। আত্মদর্শন করিতে হইলে আদর্শ ভাবের পশ্চাতে ছুটিতে হয় সত্য, কিন্তু এই ভাবকে আপনার করিবার চেষ্টাও চাই। এই ভাবকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা ও উন্নতি প্রবণতা বলে জগৎ যাহার অভিমুখে ছুটিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্ম ব্যগ্র—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সেই সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ—এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য; আর এই দু'য়ের সমন্বয় করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়;—তথাপি বলিতে হইবে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা, সার্ব্বজনীন ভাবের দিকে কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে,

তাহা দেখিয়াই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সীমাবদ্ধ ও অসীমের ভাবটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সীমাবদ্ধের সংহতি অসীম নহে; অসীম সীমাবদ্ধের ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমগ্র ভাবে নাই, অংশতঃ আছে; আর অসীম সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ জিনিসের উৎপাদন করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইতিহাস সীমাবদ্ধ ঘটনার বিবৃতি করিয়া অসীমের দিক্ হইতেও তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে। দার্শনিক ইতিহাস ও ইতিহাসে আর একটু পার্থক্য এই, দার্শনিক ঐতিহাসিকেরা সাধারণ ঐতিহাসিকের ন্যায় স্থান, কাল, পাত্রের দিকে মনোযোগী হন না। তাঁহারা স্থান, কাল, পাত্রের অতীত অসীমের সন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের দিকে অবহিত হওয়া দার্শনিক ঐতিহাসিকেরও কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের অগ্রণী জোসেফ ফেরারি (Joseph Ferrari) এ দিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

আজকাল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সঙ্গে দু'এক জন পণ্ডিত আখ্যানকল্প বা romantic ইতিহাসেরও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেকলে ও ফ্রুড্ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক। তবে ইঁহাদের লেখা ঐতিহাসিক আখ্যান নয়। আখ্যানকল্প ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আখ্যান এক জিনিস নয়। ঐতিহাসিক আখ্যানে ঐতিহাসিক উপাদান চিত্রের backgroundরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল চিত্রটী কিন্তু একেবারে অমূলক কাল্পনিক থাকিয়া যায়। কিন্তু আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান-রীতি ও প্রকৃত দৃশ্যের অবতারণ পদ্ধতিতে গল্পকথকের ভঙ্গীবিলাসের চরম নৈপুণ্য অবলম্বন করিয়া, আখ্যানবস্তুটী জলন্ত ও জীবন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য—ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ব্যাপার করিয়া তোলা, এবং অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে বর্ণনার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবধানের দূরত্ব মন হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া। অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্যে ক্ষীণালোকে ভীতি-চকিত—আড়ষ্ট পাঠকের সানন্দ আগ্রহকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিবৃতি-বর্ত্তিকার মাধুরীতে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন. এইটুকুই তাঁহার প্রধান গুণপণা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বলেন, "History is not a shilling shocker"; ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনার সত্যানন্দ বিবৃতি থাকা চাই—ঘটনা যেমনটী পাইবে, ঠিক তেমন

কারয়াই তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধরিবে—তুমি যে সত্যানুসন্ধিৎসু, এ কথা ভুলিয়া, শুধু পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুমানের সাহায্যে নাটকীয় পদ্ধতির সার্থকতা সম্পাদন করিলে চলিবে না। দার্শনিক ঐতিহাসিক কিন্তু অনুমানের একেবারে অপক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, অনুমানের দরকার—ঘটনাকে নাটকীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করিবার জন্য নয়, সেই সমুদয় হইতে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, এইরূপ ভাব নিষ্কর্ষ করিবার জন্য। আখ্যানকল্প ইতিহাসে ঘটনা নাটকীয় আকার ধারণ করে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সেই ঘটনা শ্রেণীবিভক্ত হয় এবং দার্শনিক ইতিহাসে তৎসমুদয় হইতে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়।

বাঙ্গলার ইতিহাস প্রণয়ন কার্য্য এই তিন প্রণালী-দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। আপাততঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তারপর যখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিব, তখন ইতিহাসের দর্শনের দিক্ আলোচিত হইবার আশা করিতে পারি। বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীন ইতিহাস এখনও হয় নাই। জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া, তমসাবৃত যুগে আলোক-সম্পাত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন—যাঁহাদের সাধনার ফলে বাঙ্গলার ইতিহাস চর্চ্চা প্রসার লাভ করিয়াছে সেই সকল অক্লান্তকর্ম্মীদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামপালের ভূমিকায় ও ধর্ম্মঠাকুরের ব্যাখ্যানে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়লেখমালায় ও পালরাজগণের আলোচনায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালায় ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Palas of Bengal" ও বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বলিতে হইবে—প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কথাই আজিও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ কার্য্য সময় সাপেক্ষ। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস আশা করা যাইতে পারে না।

কয়েকখানি প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হউক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। এখানে একটা কথা বলিতে চাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল জাতি সেই দেশে বাস করিয়া থাকে, তাহাদের

বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহাদের সভ্যতার ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে, কোন্ অবস্থাবশে সমাজবদ্ধ হইয়া তাহারা উন্নতি বা অবনতির পথে চলিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাসে তাহাদের শিল্পানুরাগের চিত্র না থাকিলে তাহা গ্রীসের ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না, রোমের ইতিহাস বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রচারিত আইন কানুন না বুঝিলে রোমের ইতিহাসের কথা অজ্ঞাতই থাকিবে। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম্ম ও সমাজকে না বুঝিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা হইবে। কারণ, বাঙ্গালী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল ও আছে—আর বাঙ্গালী সমাজের সুশীতল ছায়ায় একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতে যতটা ভালবাসে, ততটা অন্য কোন জাতি বাসে না।

অনুসন্ধানের উপর যখন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তখন বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে একজনের চেষ্টায় যে হইবে, তাহা বলিয়া আমাদের মনে হয় না; সমবেত চেষ্টা চাই। আপনাদের ন্যায় সুধী সজ্জনকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে, সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। জেলায় জেলায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ন্যায় সমিতির সৃষ্টি হউক। সমবেত চেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সত্যসন্ধ সাহিত্যিকবৃন্দ বদ্ধপরিকর হউন। সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিতে হইলে হিংসা-দ্বেষ দূর করিতে হইবে, যশের মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে হইবে, আপনার কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। শুধু সত্যের দিকে চাহিয়া, আত্মাভিমান ভুলিয়া, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

মনের ভিতর কোন সংস্কার লইয়া কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অনুসন্ধিৎসুর মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকা উচিত। যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে, তাহারই নিখুঁৎ ছবি যেন উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণের উপমা ছাড়িয়া ফটোগ্রাফের উপমা দেওয়াই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, দর্পণের চিত্র বিপরীতমুখী হয়—তাহার পর বিচার বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাহাকে ঠিক করিয়া লইব; ফটোগ্রাফের চিত্রে অবিকল প্রতিবিম্বই

পাওয়া যায়। সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া কোন কর্ম্মীর ভুল-ভ্রান্তি দেখিলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ত্রুটিবিচ্যুতি মানুষেরই হইয়া থাকে। দশ জনের আলোচনার ফলে মিথ্যা মেঘ কাটিয়া গিয়া, ইতিহাসের আকাশে সত্য-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধ মতগুলিকে যুক্তির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে ঘৃণার চক্ষে দেখা কখনই কর্ত্তব্য নয়। কারণ, এ কথাটা মনে রাখা উচিত, মানুষ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মনে রাখা উচিত সুযোগ ও সুবিধার অভাবে পরীক্ষিত ঘটনাগুলির সম্যক্ পরিদর্শন না করিয়াই বা বিচার-বুদ্ধির প্রকৃত চালনা না করিয়াই তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ কথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর আজ যিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অপরের অনুসন্ধানফলে প্রকাশিত ঘটনাগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নয়।

অনুসন্ধান-সমিতির পরিচালনভার সুদক্ষ ঐতিহাসিকদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের নেতৃত্বে ও পরামর্শমতে কার্য্য করিলে সুফল যে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শরৎকুমার, অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির কার্য্যাবলীর দ্বারা বাঙ্গলা দেশে ইতিহাস রচনায় যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ইতিহাস অনুশীলনকারীকে আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এই সঙ্গে গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের রাঢ় দেশে একটি এইরূপ অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য্য করিতে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কার্য্যের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া গিয়াছে। আশা করি, তাঁহারা পূর্ব্বেকার উদ্যমের সহিত পুনরায় আপনাদের উদ্দিষ্ট পথে চলিবেন। নবপ্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতিগুলির জন্য কলাভবন নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্যসম্ভার কোথায় থাকিবে? কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষদে, রঙ্গপুর ও কুমিল্লা শাখার ভবনে ও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় এইরূপ অনেক প্রাচীন নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। জেলায় জেলায় এইরূপ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আলোচনার প্রসারও বর্দ্ধিত হউক।

আমার বক্তব্য যাহা, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ইতিহাস-প্রণালী কিরূপ ভাবে চালিত হওয়া উচিত তাহারই একটা দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি—নূতন কিছু বলি নাই; বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। তবে সুধী-সজ্জন প্রদর্শিত বিভিন্ন পথ-সকলের আলোচনা করিয়া, যে পথ ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেই পথপরিচয় আপনাদিগের নিকট দিলাম মাত্র। আপনারা সুধী জন, এ পথ ধরিয়া চলা উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

পরিশেষে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন আমরা কার্য্য করিবার শক্তি—সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থলাভ বা যশোমাল্যে বিভূষিত হইবার জন্য যেন আমরা সত্যকে বিকৃত করিয়া বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আবৃত করিয়া দশের নিকট উপস্থাপিত না করি। প্রাচীন কালে জগতের অন্যান্য দেশবাসীরা আমাদের সত্যানুরাগের যে উজ্জ্বলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সে চিত্র যেন আমরা কোনরূপে মসী-মলিন হইতে না দিই। বংশানুক্রমপ্রভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট যে সত্যনিষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা যেন চির উজ্জ্বল থাকে। আর সত্যের প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া যেন আমরা সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সবল মনের অধিকারী হইয়া, বাহিরের প্রভাবে চালিত না হইয়া বা ঐতিহাসিক দলবিশেষের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইয়া, কেবলমাত্র বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় ধ্রুব সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা রাখিয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া—কর্ম্ম করিতে পারি। সত্যভাষণে যেন আমাদের কখনও কুণ্ঠা না আসে। আমরা যেন বৈদিক ঋষির ন্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি,—

"ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু।
তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারম্॥"

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

ত্রয়োদশ অধিবেশন।

মেদিনীপুর—১৩২৯।

কার্য্য-বিবরণী।

প্রথম দিবস—১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম, এ; পি, আর, এস; সি, এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রচিত "বাণী বন্দনা" গীত হয়।

বাণী-বন্দনা।

(আবার) ভরিয়া এনেছি ঘট
কুড়া'য়ে এনেছি প্রাণ;
গড়িয়া তুলেছি পূজা-আয়তন,
শঙ্খে মুখর তোমার ভবন,
আবার করেছি পুষ্প চয়ন,
করিতে অর্ঘ্য দান।

(মাগো) আদরিণী তব কন্যা
(আজ) জগতে হ'য়েছে ধন্যা,
(বিশ্বে) তুলেছে ভাবের বন্যা,
লুটিয়া এনেছে মান।
ভাষার গর্ব্বে নাহিকো কার্পণ্য
বিশ্বে পেয়েছে স্থান।

(ওগো) কুন্দবরণা বাণী,
মরালবাহনা পদ্ম-আসনা বাণী,
বর্ষ প্রভাতে, তোমার সভাতে
আবার গাহিব গান॥
শতেক ভক্ত বন্দনাপূত
লহ গো অর্ঘ্য দান॥

(ওগো) কুন্দবরণা বাণী
বীণাপাণি শুভ্রবসনা বাণী,
বর্ষ প্রভাতে, তোমার সভাতে
আবার গাহিব গান।
শতেক ভক্ত বন্দনা-পূত
লহ গো অর্ঘ্য দান॥

নাহি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,
নাহি ব্যোমকেশ সেবকবর,
বিহারীর বীণা হ'য়েছে নিথর,
অপূর্ণ উপাদান ;
তবু সাজায়েছি ডালা,
তবু গাঁথিয়াছি মালা,
তবু করি আহ্বান।

(ওগো) কুন্দবরণা রাণী,
বেদ-ধারিনী জ্ঞানদায়িনী বাণী,
আবার গাহিব গান।
শতেক ভক্ত বন্দনা-পূত
লহ গো অর্ঘ্য দান।

শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাগ বাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত রামরক্ষ তর্কতীর্থ মহাশয় স্বরচিত "স্তোত্রম্" পাঠ করেন।

স্তোত্রম্।

সুমধুর নিক্কণ বিজিত কমলদল পদযুগ বিলসন শীলে।
জয় জয় ভারতী সেবকগণ নতি সাদর সংগ্রহ লোলে॥
এহি কৃপাময়ি হৃদয় নিকুঞ্জে
দীপয় জ্ঞান প্রদীপম্।
হীন বৈধ বিধি দীন তনয়গণ
কৃত মিতি নাপনয়াত্মপম্॥
দুরিত বিমোচন বাঙ্ময় মর্চ্চন
মিদমতি ভাব বিহীনম্।
স্বীকুরু ভগবতি দীন দয়াময়ি
শোভয় হৃদয় সরোজম্॥
মানস মতিশয় গাঢ় তমোময় মপনয় জ্ঞান বিকাশৈঃ।
সান্ত্বয় সুতগণ চিত্ত মনুক্ষণ ময়ি বদনে মৃদু হাসৈঃ॥

শ্রীরামরক্ষ তর্কতীর্থ।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় কবি গুণাকর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় লিখিত "উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন।

উদ্বোধন

বঙ্গবাণীর মন্দিরে আজ ভক্ত সেবক মণ্ডলী
শুদ্ধ শুচি অর্ঘ্য রচি, পুলক ভরা অন্তরে
যাচ্ছে ছুটি আধার টুটি ঝরছে আলোর অঞ্জলী
কোন মানসের অচ্ছোদে ঐ মানস তাদের সন্তরে।
মাঙ্গলিকের শঙ্খ বিহগ বাজায় শুভ সিদ্ধিতে
স্বচ্ছ তরল উষার রাগে পাদ্য পাঠায় নিত্যি কে?
সাজায় মধু পর্ক নব মঞ্জু কুসুম ঋদ্ধিতে
গুঞ্জরিছে মন্ত্র মধুর মত্ত মধুপ ঋত্বিকে!
কুজ্ঝটিকায় ধ্বান্ত রাশি করলে আজি শ্রান্ত কে?
কোন সুরভির দুগ্ধ ধারায় শুভ্র ধরায় অঙ্গ এ!
কমল হ্রাহ কোন্ কামিনী রূপ দেখায় শ্রীমস্তকে?
রূপ সারঙ্গে সুর তরঙ্গ তুলছে সারা বঙ্গ রে!
পুষ্প রেণুর গুন্ গুনে দিক কম্পিত কি সৌরভে!
ঋদ্ধ শোভা সঙ্গীতে আজ মাতৃপূজার হর্ম্ম্যরে!
অন্তরে কোন্ সিদ্ধ কবি লিখ্‌ছে গীতি গৌরবে?
কোন্ চারণীর চরণ নূপুর বাজচে বনের মর্ম্মরে?
দিক্‌বালা ধর্‌চে চারু শঙ্খ ধবল ছত্ররে
চন্দ্রমা ঐ দীপ জ্বেলেছে সন্ধ্যাবতীর অঙ্গনে
মলয় মরুত মন্দ মধুর ঢুলায় ব্যজন পত্ররে
এই বেলা তুই রিক্ত কবি ভক্তজনের সঙ্গ নে!

কবি গুণাকর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এবং

৪। বালিকাগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত "বাণী বন্দনা" গীত হয়।

বাণী বন্দনা।

নম কুন্দ বিনিন্দিতা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী
শারদ কৌমুদী বরণা!

নম অভ্র সমশুভ্র লুণ্ঠিত অঞ্চল
সুচিক্কণ মঞ্জুল বসনা!
নম অলক্ত রঞ্জিত মঞ্জীর শিঞ্জিত
রাতুল পঙ্কজ চরণা!
নম হংস সমারূঢ়া অচিন্ত্য রূপধরা
মুক্তা প্রবাল মণি ভূষণা!
কিবা পৃষ্ঠে বিলম্বিত কুন্তল আলুলিত
কনক কিরীট রাজে মস্তে!
কিবা কর কমলে বীণা ঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা
জয় জয় জননী নমস্তু!
উর চির কল্যাণী ভাব বিভঙ্গিনী ভক্ত ভাবুক চিত শোভনা
ধন্য হউক আজি তব পূজা আয়োজন সিদ্ধ হউক সব সাধনা!
আজি ফুল্ল এ মধুময় মঙ্গল লগনে
সেবক উপাসক বৃন্দ!
হ'ক সমবেত মধ্যে মেদিনীর বক্ষে
পূজিতে ও চরণারবিন্দ!
অয়ি কজ্জল প্রোজ্জ্বল নয়নে নিরখিয়া
অপগত কর মোহ ভ্রান্তি!
অয়ি স্ফুরিত বিম্বাধরা অজ্ঞান তমোহরা
বরিষণ কর শুভ শান্তি!
মাগো কণ্ঠে কণ্ঠে তব বন্দনা গীতি রব
সঞ্চারি উত্তম চেতনা!
নব ভাবমধু কল্পনে নন্দিত কর সবে
সাধক সেবক শরণা!
উর চির কল্যাণী ভাব বিভঙ্গিনী ভক্ত ভাবুক চিত শোভনা!
ধন্য হউক আজি তব পূজা আয়োজন সিদ্ধ হউক সব সাধনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মেদিনীপুর।

তৎপরে

৫। শ্রীমতী রাধারাণী দাসী কর্তৃক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচিত "বাণী বোধন" গীত

বাণী বোধন।

আগত মধুমাধব পুন মঙ্গলময় প্রাতে,
জাগিল সব রম্য বিটপ মঞ্জু মুকুল সাথে;
মুগ্ধ মধুর তানে
হর্ষ বিভল প্রাণে
গাহিল যত কোকিল কুল তব বন্দনগীতি
মদমূর্চ্ছিত মধুপবৃন্দ হাসিল বনবীথি;
বিগত আজ বহু বেদন নিবিড় তিমির রাত্রি,
এস জ্ঞানদাত্রি গো! এস জগদ্ধাত্রি!
আন্দোলিত নবপল্লব মুক্তমন্থর বায়ে,
কুজন রত বিহগ রাজি নিভৃত কুঞ্জছায়ে;
রস সৌরভ ভারে,
বিশ্ব ভুবন দ্বারে,
বিস্মিত শত নেত্র মিলিল গর্ব্বিত বনমল্লী;
চল চঞ্চল কুসুমোজ্জ্বল মাতিল সব বল্লী;
হর্ষ মগন সেবকগণ মিলন তীর্থযাত্রী,
এস জগতধাত্রি গো! এস জগতধাত্রি!
চল মর্ম্মর পত্র গহন নূপুর তব বাজে,
শ্যাম বিপিন শীর্ষে তব ঘন কুন্তল রাজে,
রঞ্জিত পদ রাগে,
রক্ত কমল জাগে,
ভাতিল তব শুভ্র ধবল হাস্য কুমুদ কালে,
চন্দন রক্ত অঙ্গ দ্যুতি রবি সিন্দুর ভালে;
ভেদ দ্বন্দ্ব মোচন কর সেবকজনমাতৃ,
এস জ্ঞানদাত্রি গো! এস জগতধাত্রি!

অন্তরীক্ষ ঘোষিল তব জয় মঙ্গল বাণী;
সূর্য্য চন্দ্র বরিল আজ ফুল চন্দন দানি ;
নিজ গৌরব সাথে,
করুণ দৃষ্টিপাতে,
নব জীবন অবলম্বন শুভসঙ্গম আশে,
মিলিল আসি ভক্ত অযুত চরণকমল পাশে ;
পাথন কার পালন করি অয়ি মঙ্গল দাত্রি !
এস জগতধাত্রি গো ! এস জগতধাত্রি !

শ্রীভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
মেদিনীপুর।

হইলে পর

৬। স্থানীয় "ডায়মণ্ড য়্যামেচার কন্‌সার্ট পার্টি" একতান বাদন করেন।

৭। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "সাহিত্যিক বন্ধুগণ! আজ এই ত্রয়োদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন কার্য্যের ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরবাসীর কাছে আমার পরিচয়ের দরকার নেই—বাইরের লোকের কাছে সে পরিচয় আবশ্যক। সেটি এই, যে আমি মেদিনীপুর সাহিত্য সমাজের একজন দাস। যতদিন মেদিনীপুরে এই সাহিত্য পরিষৎ ততদিন আমি তার দাসের কাজ, সেবার কাজ করেছি। আপনারা আজ এখানে সমাগত বলে' উদ্বোধনের কাজটা তাই আমাকেই করতে হবে কেননা আমি দাস। বাড়ীর কর্ত্তা থাকেন ভেতরে দাসকে দ্বারে থাকৃতে হয়। কাজেই দাসকে তা সম্পন্ন করতে হবে। আর এটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। আপনারা জানেন উদ্বোধন করে ঢাকী। দুর্গা পূজার সময় জানিয়ে দেয় চক্রবর্ত্তী বাড়ীর পূজো, সেই ঢাকী। আমার এই উদ্বোধন মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়ে নয়, আমাদের এই হিন্দুর দেশে প্রত্যেক পূজা পার্ব্বনে ঢাকীর আবশ্যক হয়। সে গৃহস্থের কেউ নয় অথচ পূজার কয়দিন আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢাক বাজিয়ে গ্রামবাসীগণকে পূজার মণ্ডপে সমবেত করে। আমিও

এই সাহিত্য সম্মিলনে ঢাকীর কাজ করছি। এই ইতিহাস খ্যাত মেদিনীপুরে বাণীর পূজকগণ পূজা করবেন। আমি বলছি, কে আছ পূজক, সেবক ক্ষুধিত, তৃষিত, তাপিত! এস মায়ের পূজা কর। ঢাকীর কাজটাও আমার একমাত্র কাজ নয়। উদ্বোধন উপলক্ষে—বাণী পূজা উপলক্ষে কি আয়োজন করা হয়েছে তার পরিচয় দি। পূজার পৌরহিত্যের জন্য বন্ধু যতীন বাবুকে নিয়ে এসেছি। টাকীর ভূম্যাধিকারী—সে খবর নাই বা দিলুম। তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র হ'লেও সাহিত্যের প্রায় সকল শাখা বিশেষতঃ দর্শন শাখায় তিনি রীতিমত আলোচনা করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আপনারা সকলেই জানেন। আজ কত কথাই মনে হচ্চে এই সাহিত্য সম্মিলন ও পরিষদ সৌধের যাঁরা কারিগর ছিলেন তাঁদের অনেককেই আমরা হারিয়েছি। সে রামেন্দ্র সুরেশ ব্যোমকেশ আর নাই। আছেন হীরেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ। আজ তাঁরা উভয়েই এই সভায় উপস্থিত। ঢাকায় হীরেন্দ্রনাথ পৌরহিত্য করেছেন। এখানে যতীন্দ্রনাথ আসন অলঙ্কৃত করবেন। এই এক নম্বর ঢাকের বাদ্যি।

দুই নম্বর ঢাকের বাদ্যি। চার শাখার চারটী যন্ত্র আনা হয়েছে। সাহিত্য-শাখায় ললিতকুমার বিদ্যারত্ন। আমি বৃদ্ধ কাক, আজ ৪০।৫০ বৎসর সাহিত্য চর্চ্চা করছি। কিন্তু বটতলার বই থেকে নিমতলা ঘাটের সব বাঙ্গলা বইয়ের ঘুন, বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে এমন পরিচিত বাঙ্গলায় আর কেউ নাই। বিজ্ঞান শাখায় গভর্ণমেণ্টের সেকালের বড় সহর কোটাল চুণী বাবুকে আনা হয়েছে। খুব বড় উচ্চ বিজ্ঞানের কথা না হলেও আমাদের জীবন মরণ সমস্যা সমাধানে একাগ্রমনে কেউ যদি চেষ্টা করে থাকে সে এই চুণী বাবু। ইনি সে কথা যেমন করে বলেছেন ও বলতে আরম্ভ করেছেন ও যেমন করে বলবেন এমনটি বাঙ্গলার কেউ বলতে পারবে না।

এই গেল সাহিত্য ও বিজ্ঞান। তারপরে দর্শন। দর্শন বিভাগে বাঁকীপুর থেকে যাঁকে এনেছি তিনি আমার সোদরপ্রতিম—তাঁকে আমি ভক্তি করি, পূজা করি ও শ্রদ্ধা করি। দর্শন শাখায় এখন বাঙ্গলায় হীরেন্দ্র বাবু ও পূর্ণেন্দু বাবু বিরাজমান। হীরেন্দ্র বাবুকে ক্ষমা করে রেহাই দিয়েছি। তিনি বেঁচে বর্ত্তে থাকুন। পূর্ণেন্দু বাবুকে টেনে আনা হয়েছে। সকলের

শেষে ইতিহাস। ইতিহাস শাখার সভাপতি আমার বন্ধু আমার বৈবাহিক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। আমার চেয়ে বয়সে কম হলেও আমার মনে হয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অধ্যাপক যদুনাথ প্রভৃতি দু একজনকে বাদ দিলে এ রকম ঐতিহাসিক খুব কম আছে। অমূল্য আমার বৈবাহিক হলেও ও হচ্ছে আমাদের শব্দকল্পদ্রুম ইংরাজীতে যাকে বলে Encyclopedia। তাঁকে যখন যে কথাটি জিজ্ঞাসা করা যায় তার জবাব মিলেই। গরু হারালেও ওঁর কাছে গেলে পাবেন।"

৮। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রচিত "অভ্যর্থনা সঙ্গীত গান করেন।

অভ্যর্থনা।

আজি খুলেছে বাণী মন্দির দ্বার বিগত আঁধার রাত্রি,
ওগো কে কোথায় আছ ছুটে এস ত্বরা নবীন তীর্থ-যাত্রি!
ওই নব প্রভাতের অম্বরে রাজে দীপ্ত উজ্জল সূর্য্য,
নিখিল বঙ্গে রঙ্গে বাজেরে জয় দুন্দুভি তূর্য্য।
আজি সকলে সাজায় পূজার অর্ঘ্য আরতি প্রদীপ খানি
শুধু "মেদিনী" কি হায় রবে নিদ্রিত—অতীত জ্ঞানের রাণী।
ওই দৃপ্ত গরবে বিশ্বমোহিনী ধ্বনিত বীণার যন্ত্রে,
বাজে কান্ত কোমল ললিত রাগিণী মোহন মধুর মন্ত্রে।
উল্লাসে হাসে নব মূর্চ্ছনা অযুত-ভক্ত চিত্ত,
অমল কমল শ্রীচরণ তলে ঘিরিয়া করে গো নৃত্য!
আজি জাগ্রত সবে ধরিয়াছে করে আশার প্রদীপ খানি,
ওগো তোমরাও এস গড়ে তোল আজ "মেদিনী" জ্ঞানের রাণী।
আজি শ্যামল সুধা অঞ্জন দাও মোহ বিজড়িত নেত্রে,
এস 'শ্যাম' ও "সাগর" "রামেশ্বরের" পদধূলি পূত ক্ষেত্রে;
আজি কুহক-দণ্ড পরশে নিমেষে জাগাইয়া তোল সুপ্ত,—
উদ্ধার কর অতীত-কীর্ত্তি-কলাপ-কাহিনী লুপ্ত।
এস নব গরিমায় নব প্রতিভায় বিদূরি আঁধার গ্লানি
হাসুক, নাচুক, নাচুক, আবার "মেদিনী" জ্ঞানের রাণী।

আজি এস রঞ্জন নন্দিত কর হিয়ে এস বন্ধে বন্ধে,
প্রীতির অশ্রু ঝরুক মরমে গম্ভীর মহানন্দে!
আজি নাচুক ছন্দ নব নব গান হৃদয়ে আসুক ভক্তি,
বর্ষিত হোক্ ধাতার আশিস্ কল্যাণময়ী শক্তি!
আজি স্বাগত সুধী সাধক-বৃন্দ কর্ম্মী মনীষী জ্ঞানী,—
আজি জাগাও, মাতাও, নাচাও তোমরা "মেদিনী" জননীর প্রাণী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।

মেদিনীপুর।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বড়ই পরিতাপের বিষয় যিনি গানটী রচনা করিয়াছেন তিনি সম্প্রতি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।

৯। তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাকুমার অগস্তি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় অভিভাষণের শেষাংশটুকু পাঠ করেন।

১০। এই অভিভাষণের পাঠ সমাপ্ত হইলে পর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয় স্বরচিত "স্বাগত" কবিতাটি পাঠ করেন।

স্বাগত।

স্বাগত আজিকে মনীষি বৃন্দ!
বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবক সাজে,
মেদিনীর এই কঙ্করময়
পাষাণ কঠিন বুকের মাঝে।
এস সুধী সাধু পণ্ডিত সবে
মণ্ডিত মুখে মধুর হাসি,
নব বরষের নব জাগরণে
লয়ে এস নব প্রীতির রাশি।
প্রতিভার পূত বিমল আলোকে
সারদা সেবায় সকলে মাত—
অজ্ঞান ঘোর অন্ধ মানসে
জ্বালাও জ্ঞানের নবীন ভাতি।

যদিরা মোদের মেদিনী জননী
জানে না বরিতে নূতন করি,
ধান্য দূর্ব্বা স্নেহের সাথীরে
ডাকিছে সবারে আঁচল ভরি!
মেদিনীকরের স্থাপিত যে পুরী
অতীত গরবে নহেক হীন,
প্রকৃতির শোভা সম্পদে চারু
কভু এ নগরী নহেক দীন।
দিকে দিকে ঘেরা মোহিনী তটিনী
অতল সুনীল জলধি আর,
বক্ষে দোদুল কংসাবতীর
অমল ধবল স্ফটিক হার।

শিরেতে শোভিত শৈল মুকুট
চরণে শালের কানন রাজি,
এস সুন্দর প্রকৃতি দুলাল
বাণীর কুঞ্জে এস গো আজি!
এই মেদিনীর তাম্রলিপ্তে
অনেক কীর্ত্তি আজিও জাগে,
ভুবন বিজয়ী অর্জ্জুনে জিনি
তীর্থ হয়েছে পুণ্য রাগে।
ব্রহ্ম হত্যা পাতক মুক্ত
হইল শম্ভু এখানে এসে,
গিয়াছিল এরি অর্ণব পোত
গ্রিরিশ রোম ও চীনের দেশে।
মেদিনীর বুকে আজিও বিরাজে
ময়না গড়ের পুণ্য স্মৃতি,
মোগল মারীর মহারাষ্ট্রের
আজিও ধ্বনিছে বিজয় গীতি।
মুসলমানের কত না কীর্ত্তি
এখনো হেথায় লুকান আছে,
নবাব সিরাজ আলী খান আর
ছুটেছে কতনা মারাঠা পাছে।
সাজাহান গেছে এই পথ দিয়া
পীরে দেছে কত নগর দেশ,
মিরজাফরের অনেক দিবস
এরি কোলে বসে হয়েছে শেষ।
জব চার্ণক গেঙ্গরীতে আসি
গড়িল কতই মোহিনী আশা,
তাড়িৎবার্ত্তা এই থান হতে
বহিল প্রথম মানব ভাষা।
সিংহলে এরি সন্তান দল
স্থাপি কারণ উপনিবেশ,

স্বাগত স্বদেশ ভকত বৃন্দ
উজল করহ সোণার দেশ!
বুদ্ধের বাণী উঠেছিল হেথা
ইহারি আকাশ বাতাস চুমি,
নিমাইএর পূত পদধূলি পেয়ে
ধন্য হয়েছে পুণ্য ভূমি!
বর্গভীমার মন্দির দ্বারে
দূরের যাত্রী আসিছে ছুটে,
কর্ণগড়ের মহামায়া পদে
কতনা সাধক পড়িছে লুটে!
কৃষ্ণরায়ের বকুল কুঞ্জ
রঙ্গীন এখনো ফাগের রাগে,
মঙ্গলা শ্যাম শ্যামলেশ্বরে
মেদিনীর চির কীর্ত্তি জাগে।
ধর্ম্ম এখনো রেখেছে বজায়
হিজলীর খ্যাত মসন্দরী,
কাশীগঞ্জের সাহেবের গোর
হিন্দুও পূজে প্রদীপ ধরি!
সকল ধর্ম্ম—মিলেছে এখানে
বিরোধ দ্বন্দ্ব গিয়াছে মিটে,
সকল জাতির সাধক এস গো
মায়ের পুণ্য চরণ পীঠে!
বাণীর সাধক চির দিন হেথা
মেদিনীরে দেছে অতুল মান,
হেথায় বসিয়া কাশীরাম দেছে
মহাভারতের অমৃত দান।
শিবায়ন গীতি চণ্ডীর গান
হেথায় প্রথমে উঠিল ধ্বনি,
কবি কানুরাম হেথায় মায়ের
চরণে দানিল অতুল মণি।

কত না ভক্ত দানিল অর্ঘ্য
মায়ের রাতুল চরণতলে,
রসিকানন্দ গোপীবল্লভ—
দুখী শ্যাম ভাসি নয়ন জলে।
তারিণী করুণা বিদুষী দুজনে
ব্যজন করিল চামর চারু,
নবীন বাউলে আকুল করিল
এমন ভক্তি ছিলনা কারু।
বীর সিংহের বীরের জনম
বিদ্যাসাগর ভুবন জয়ী,
কার্ত্তিক নীলকণ্ঠ প্রতিভা
দীপ্তি লভিল হিরণময়ী।
ঈশান বিষাণ বাজাইল হেথা
সেকাল দেখাল রাজনারাণ ;
এস কবিকুল ভাবুক সুজন
অঞ্জলি পদে করহ দান !
রক্তিম ধূলি— ধূসর মলিন
জীর্ণ মেদিনী মায়ের বুকে,
এস এস আজি অতিথি দেবতা
প্রীতির কুল্ল সহাস মুখে !
পদে পদে ত্রুটী ধরিওনা দোষ
চরণে সবার জানাই নতি ;
স্বাগত বাণীর শ্রেষ্ঠ-সাধক
স্বাগত সকল সভাধিপতি !

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মেদিনীপুর।

১১। শ্রীযুক্ত রায় মন্মথ নাথ বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দেও ধবল দেব বি, এ (মেদিনীপুর) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন (কলিকাতাবাসীর পক্ষে) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী (মুসলমান সাহিত্যিকগণের পক্ষে) শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার ময়মনসিং ও মৌলবী মুন্সী মহম্মদ ইয়াকুব সাহেব যথাক্রমে সমর্থন ও অনুমোদন করিলে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তি ভূষণ শ্রীকণ্ঠ এম, এ বি এল মহাশয় সাধারণ সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, সাহিত্য শাখার সভাপতি, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য আই, এস, ও, এম্ বি, এফ, সি, এস্ বাহাদুর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি, রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম এ, বি এল্ বাহাদুর দর্শন শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। হীরেন্দ্র বাবু মূল সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন, "প্রস্তাবক সংক্ষেপে সভাপতি মহাশয়ের কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্বনামখ্যাত তাঁর পরিচয়ের আবশ্যক নেই। আমি সেইজন্য পরিচয় দিব না। সোণাকে গিল্টি করা কাজের উচিত হিয়াছেন হয়রা

মূর্খতা তা আমি করব না। একটা বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করব সেটা তাঁকে শুধু শ্রীকণ্ঠ বলা হয় বলে। আমি তাঁকে শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে ধীকণ্ঠ বা বাণী-কণ্ঠ বলতে চাই। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপুত্র যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি।

১২। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৩। সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম পাঠ করেন।—

অনাগত ভদ্র মহোদয়গণের পত্র ও টেলিগ্রাফ।

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর——বোলপুর।
২। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাসিমবাজার।
৩। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী——ঢাকা।
৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—কলিকাতা।
৫। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী——কলিকাতা।
৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি মোহন সেন——বোলপুর।
৭। " দুর্গাদাস লাহিড়ী——হাওড়া।
৮। শ্রীমতী সরযুবালা বিদ্যারত্ন—— ঢাকা।
৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব——কলিকাতা।
১০। শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ——কলিকাতা।
১১। " গৌরহরি সেন——কলিকাতা।
১২। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—কলিকাতা।
১৩। " স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী——কুমিল্লা।
১৪। " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য——গৌহাটী।
১৫। " শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ——ঢাকা "বান্ধবকুটীর"।
১৬। " বসন্ত ভট্টাচার্য্য——দিল্লী বঙ্গসাহিত্যসভা।
১৭। " ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—ঈশ্বর আশ্রম কলিকাতা।
১৮। মৌলবী শ্রীযুক্ত মুজাফর মহম্মদ——বালিগঞ্জ কলিকাতা।
১৯। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী——শ্যামবাজার কলিকাতা
২০। " উপেন্দ্র নাথ সেন—সম্পাদক 'সুবর্ণবণিক সমাচার।

২১। শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় —— গড়পার কলিকাতা।
২২। „ মন্মথ নাথ জ্যোতিঃশেখর——ঘাটাল, মেদিনীপুর।
২৩। „ কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত —— বোলপুর।
২৪। „ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু——শাঁখারীটোলা কলিকাতা।
২৫। „ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য--সাহিত্য-পরিষৎ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
২৬। „ দুর্গাসুন্দর শর্ম্মা——শাকুরাই, ময়মনসিংহ।
২৭। „ দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ——কলিকাতা।
২৮। „ শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী——টাউনশ্রীপুর, খুলনা।
২৯। „ সুরেন্দ্র নাথ পাত্র——পাঁচরোল।
৩০। „ রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্ম——বাসুদেবপুর।
৩১। „ মহারাজকুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী——কেতমপুর।
৩২। „ প্রসন্ন কুমার সরকার——কৃষ্ণনগর।
৩৩। „ কিরণ চন্দ্র দত্ত ——কলিকাতা।
৩৪। শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও।
৩৫। „ শৈলবালা ঘোষ জায়া।
৩৬। „ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ। কলিকাতা
৩৭। „ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।
৩৮। „ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। কলিকাতা
৩৯। „ যতীন হালদার এম এ। পাটনা
৪০। „ হেমচন্দ্র সরকার এম এ। কলিকাতা
৪১। „ বিনোদবিহারী রায়। রাজসাহী
৪২। „ ধনেশ্বর সেন। কৃষ্ণনগর
৪৩। „ শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এম এ আগরতলা
৪৪। „ গোলকেন্দ্র নাথ দে বি-এ, কলিকাতা।
৪৫। „ শান্তশীল সাহা, খাগড়া বহরমপুর।
৪৬। „ মনোরঞ্জন মজুমদার বেদান্তভূষণ, কুড়িগ্রাম, রংপুর।
৪৭। „ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা।
৪৮। „ শশিভূষণ মাইতি।
৪৯। „ দেবেন্দ্র নাথ বসু।

৫০। „ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

৫১। „ বিধুভূষণ গোস্বামী।

৫২। „ রাজেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

১৪। সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত দ্বাদশ অধিবেশনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্য বন্ধুর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন

পরলোকগত।

সাহিত্যিক ও সাহিত্য বন্ধুগণ।

১৩২৬।

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মহারাজ স্যার গিরিজা নাথ রায়।

৩। দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম্ এ, বি এল্।

৪। কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

৫। পরেশ চন্দ্র সোম।

৬। রায় বৈকুণ্ঠ নাথ বসু বাহাদুর।

৭। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্. এ, বি এল্।

৮। রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। য়েয়াসুদ্দিন আহম্মদ।

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী।

১১। অক্ষয় কুমার বড়াল।

১২। অমর চন্দ্র দত্ত।

১৩। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

১৪। কবিরাজ সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী।

১৫। অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী।

১৩২৭।

১৬। অনন্ত নারায়ণ সেন।

১৭। উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী)।

১৮। চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার।

১৯। জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়।
২০। ডাঃ জে; ডি, এণ্ডারসন্।
২১। রাজা নরেন্দ্র লাল খান বাহাদুর।
২২। রাজা জ্যোতিঃকুমার মুখোপাধ্যায়।
২৩। বোধিসত্ত্ব সেন এম্. এ, বি, এল।
২৪। রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।
২৫। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ,
২৬। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি।
২৭। ডাঃ উপেন্দ্র নাথ নাগ।
২৮। কৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু।
২৯। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩০। পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।
৩১। মনোমোহন গোস্বামী বি-এ।
৩২। কবি দেবেন্দ্র নাথ সেন এম্ এ, বি-এল।

১৩২৮।

৩৪। প্রভাত কুসুম রায় চৌধুরী।
৩৫। বরদা প্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ।
৩৬। চন্দ্র শেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি.এ।
৩৭। রাজা রাম চন্দ্র রায় বীরবর।
৩৮। কিরণ কুমার বসু এম্ এ, বি এল্।
৩৯। তরাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
৪০। জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি.এল।
৪১। যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪২। মণীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল।
৪৩। শশী ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৪। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার।
৪৫। জগবন্ধু মোদক।
৪৬। দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু।
৪৭। দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

৪৮। বীরেন্দ্র কুমার দত্ত।

৪৯। ডাঃ প্যারি শঙ্কর দাস গুপ্ত।

৫০। প্রতিভা দেবী।

৫১। প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ।

৫২। রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তৎপরে

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সমবেত সভামণ্ডলী মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(তৃতীয় দিনের সাধারণ সভায় স্থির হইয়াছে যে এই প্রস্তাব ২য় প্রস্তাবরূপে গণ্য করা হইবে)।

১৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাওড়ার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল।

১৬। পরিচালন সমিতির সম্পাদ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইল। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে যে সকল প্রতিনিধি প্রতিনিধিগণের দেয় ২৲ দুই টাকা ফি দিয়াছেন তাঁহারাই এই বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে আগামী কল্য প্রাতে (২রা বৈশাখ) ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইবে, তৎপরে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিগণের অভিভাষণ পঠিত হইবে এবং অপরাহ্নে ৩টার সময় হইতে ইতিহাস ও দর্শন শাখার সভাপতিগণের অভিভাষণ পঠিত হইবে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে আলোক চিত্র প্রদর্শন দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাখায় দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তৎপরদিন ৩রা বৈশাখ প্রাতে চারি শাখার সভা বিভিন্ন স্থানে হইবে, তথায় প্রবন্ধাদি পঠিত হইবে এবং অপরাহ্নে পুনরায় সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
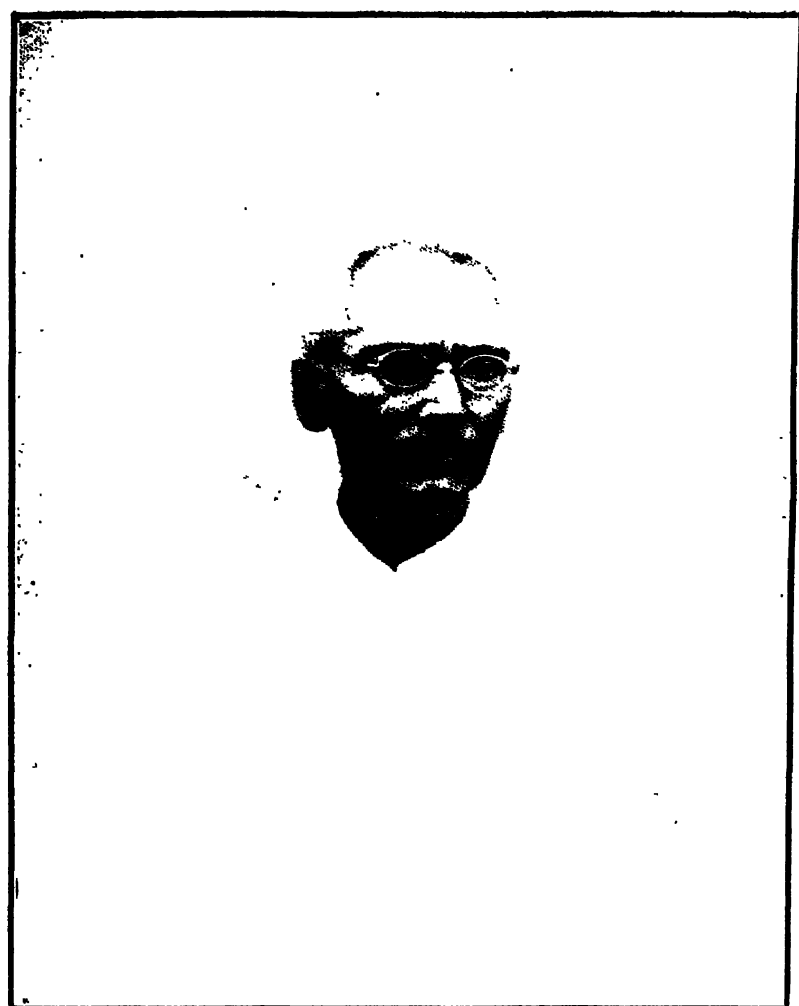
মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সাধারণ সভার কার্য্য সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় শেষ হইল।

অতঃপর সম্মিলন মণ্ডপে স্থানীয় শাখা পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাত্রি ৭॥০টার সময় এই সভা শেষ হয়।

এই সভা শেষ হইলে পর Social Service League এর পক্ষে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় "জগতে ভারতের স্থান" বিষয়ে এক বক্তৃতা দিলেন। ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের দ্বারা বহুচিত্র প্রদর্শন করিয়া তিনি জগতের নানা দেশের লোকের সহিত ভারতবর্ষের লোকের তুলনা দিলেন। এই তুলনায় তিনি দেখাইলেন যে ভারতবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ও শিক্ষায় কত পশ্চাৎপদ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দিবস—২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল শনিবার।

প্রাতে ৮ টা। ৯ টা।

সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, মহাশয় সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভি-ভাষণ পাঠ করিলেন।

৯॥০ টার সময় সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই, এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার "জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান" নামক অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

১০ টার সময় এই শাখার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে বেলা ৪ টার সময় সভারম্ভ হয়।

ইতিহাস শাখার

সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইতিহাস শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ৫॥০ টার সময় এই অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইল। তৎপরে

দর্শন শাখায়

সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল, মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই অভিভাষণের শেষাংশটুকু পাঠ করেন।

তৎপরে সাধারণ সভায় সন্ধ্যা ৭ টার সময় শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, ডি, এম্ এস্ সি, মহাশয় রোমী প্রাণী Ciliated srotoza of our ponds) বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের দ্বারা কতকগুলি ছায়া চিত্র প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দেন। এই প্রবন্ধ বিজ্ঞান শাখার অন্তর্গত।

অতঃপর ৮ টার সময় শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, মহাশয় "মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের বিষয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে আলোকচিত্র দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের বহুচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ ইতিহাস শাখার অন্তর্গত।

রাত্রি ৯ টার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

এই দিন রাত্রি ১০ টার সময় স্থানীয় শাখা পরিষদের কতিপয় উৎসাহী সদস্য এবং সহরের কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধি ও সাহিত্যিকগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য সম্মিলন মঞ্চেই "প্রফুল্ল" অভিনয় করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিবস।

৩রা বৈশাখ, ১৩২৯, ১৬ই এপ্রিল, ১৯২২ শুক্রবার।

প্রাতে ৭টা—৮টা।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী।

এই অধিবেশনে আলোচনার জন্য প্রস্তাবাদি গঠিত হয়।

সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে স্থির হয় যে তিনি প্রতিনিধিগণের চাঁদা বাড়াইবার প্রস্তাব পুনর্ব্বার সম্মিলনের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকায় স্থির হয়

অপরাহ্নে ৩ টার সময় পুনরায় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি বসিবে, তাহার পর সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হইবে।

সাহিত্য-শাখা।

ভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ।

প্রথম বৈঠক—রবিবার ৩রা বৈশাখ, ১৩২৯। প্রাতে ৯॥ ঘটিকা।

পঠিত প্রবন্ধের তালিকা।

১। গান; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত।
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার (কলিকাতা) কর্ত্তৃক গীত।

সঙ্গীত।

বাণীর দেউল দুয়ারে এসেছ ভক্ত সকলে আজ,
নব প্রভাতের হিরণ কিরণে,
পুলক আকুল পুণ্য মিলনে,
জাগ্রত করি নবীন হৃদয় দীনের মাঝ।

শক্তি লভেছি ক্ষুদ্র আমরা তোমাদেরি মুখ চাহি,
হাতে হাত ধরি মিলিত কণ্ঠে উঠেছি আমরা গাহি;
রিক্ত করিয়া হৃদি সম্ভার,
শিখেছি ঢালিতে চরণে মাতার
পর্ণ কুটীরে পাদ পীঠ যার ধরেছে মোহন সাজ।

লুপ্ত যতেক অতীত কীর্ত্তি জেগেছে আবার আজি,
বিদ্যাসাগর কাশীরাম স্মৃতি উঠেছে হৃদয়ে বাজি,
কবি-কঙ্কন চণ্ডীর গান,
আবার উঠেছে মাতায়ে পরাণ,
শিবায়ণ প্রীতি বৈষ্ণব গীতি জেগেছে মরম মাঝ।

কঙ্করময় বন্ধুর এই পাষাণ কঠিন দেশে,
বহিছে নির্ঝর নবীন ছন্দে নৃত্য করিছে হেসে;

এমনি করিয়া ভক্ত-প্রবর
গুণী জ্ঞানী ওগো সুধী সাধু বর
গৌরবে দিও আবরি মোদের যতেক দৈন্য লাজ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মেদিনীপুর।

২। বঙ্গবাণী শ্রীকালীদাস রায় বি, এ রচিত।
শ্রীব্রজমোহন পান (কলিকাতা) কর্ত্তৃক পঠিত।

৩। মিলন উচ্ছাস (কবিতা) শ্রীগণেশচরণ বসু (ঢাকা) কর্ত্তৃক রচিত।
সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক পঠিত।

৪। সেবক প্রশস্তি (কবিতা) শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত।

৫। সাহিত্যের পুষ্টি (প্রবন্ধ) শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, রচিত
পাঠক—লেখক স্বয়ং।

৬। জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য প্রবন্ধ শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ময়মনসিংহ কর্ত্তৃক পঠিত।

৭। স্বাস্থ্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা (প্রবন্ধ। শ্রীরমেশচন্দ্র রায় রচিত
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীধাম কর্ত্তৃক পঠিত।

৮। কালবৈশাখী (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য রচিত
পাঠক—লেখক স্বয়ং।

৯। সাহিত্য সমদর্শন শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য রচিত।
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক পঠিত।

দ্বিতীয় বৈঠক—রবিবার ৩রা বৈশাখ, ১৩২৯।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা।

পঠিত প্রবন্ধের তালিকা।

১০। ত্রিপত্র (কবিতা) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত।
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক পঠিত।

১১। ভারতীয় শিল্প সাহিত্যে শ্রীপলিন কুমার ঘোষ রচিত।

পদ্যের স্থান (প্রবন্ধ) শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস কর্তৃক পঠিত।

১২। অলঙ্কারের উপর উদ্ভিদের শ্রীপ্যারীমোহন দেব শর্ম্মা রচিত।
প্রভাব (প্রবন্ধ) শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক পঠিত।

১৩। উত্তর চরিতে চিত্রদর্শন (প্রবন্ধ) শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী রচিত
পাঠক স্বয়ং।

১৪। বঙ্গ ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থান (প্রবন্ধ) শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব
রচিত।

১৫। অনন্তের চিত্র (প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত মৌলবী ওস্মান আলি বি এ, রচিত।
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল সিদ্দীকী কর্তৃক পঠিত।
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি, এম, এ, পি আর এস্ কর্তৃক পঠিত।

১৬। দ'কারের দান (প্রবন্ধ) শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস রচিত পাঠক স্বয়ং।

সভাপতি মহোদয় কর্তৃক প্রবন্ধ লেখক প্রবন্ধ পাঠক ও সম্পাদককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধের তালিকা।

১। সাহিত্যে কালাপাহাড় শ্রীবরদা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
২। সৃষ্টিরহস্য স্ত্রী জাতি ও স্ত্রী শিক্ষা শ্রীখোন্দকার আফজ হোসেন।
৩। বাংলা লেখা শ্রীকালীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।
৪। জৈন ও জৈন সাহিত্য শ্রীঅমৃত লাল শীল।
৫। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য্য।
৬। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষা শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭। নৈতিক প্রেরণা শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮। ভারতে রমণীর স্থান শ্রীকামাখ্যা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। চণ্ডীদাস ও রামী মহারাজ কুমার শ্রীমহিম নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
১০। চণ্ডীদাসের পদ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
১১। মেদিনীপুরের চলিত কথা শ্রীমহিম কালীপদ দত্ত।
১২। বঙ্গীয় শব্দ সমালোচনা শ্রীরাজ কুমার বেদতীর্থ।
১৩। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও ধর্ম্ম শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৪। কথোপকথনের ইতিবৃত্ত শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইতিহাস শাখা।

৩রা বৈশাখ, ১৩২৯।

স্থান মেদিনীপুর কলেজ গৃহ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই শাখায় পাঠের জন্য সর্ব্বসমেত ৩৪টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল; তন্মধ্যে ৩১টি প্রবন্ধ মনোণীত হইয়াছিল, বাকী ৩টী অমনোনীত হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মনোনীত ৩০টী প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমটি পূর্ব্বদিন পঠিত হইয়াছিল, অন্য ২৪টী পঠিত হইল এবং ৬টী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। নিম্ন পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত প্রবন্ধগুলির ও তাহাদের লেখকগণের নাম দেওয়া হইল।

পঠিত।

১। মঞ্জুশ্রী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

২। মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজা শ্রীযুক্ত মণীষি নাথ বসু সরস্বতী। এম এ, বি এল্

৩। পাঠান যুগে ভারত ,, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। চিত্র-লক্ষণ ,, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ।

৫। নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ,, হীরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

৬। উপনিষদে শিক্ষাপ্রণালী ও ব্রহ্ম বিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব } ,, কুমার ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা, এম এ, বি এল্ পি এচ ডি

৭। কলাবিদ্যা ,, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

৮। পৌরাণিক ভূগোল ,, রাখালরাজ রায় এম এ।

৯। কলিঙ্কের বিরাট লৌহ স্তম্ভ ,, অনুকূল চন্দ্র ঘোষ।

১০। মঞ্জুশ্রী ,, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ।

১১। মেদিনীপুর বক্ষে শ্রীচৈতন্যের পথ ,, ব্রজনাথ চন্দ্র।

১২। বঙ্গ সাহিত্যে বাকুড়ার স্থান ,, রাখালচন্দ্র নাগ।

১৩। প্রাচীন ভারতে কতিপয় ক্ষত্রিয় জাতি ,, বিমলাচরণ লাহা এম এ।

১৪। আনন্দপুরের ইতিহাস ,, আনন্দ চন্দ্র বাগ।

১৫। মারাঠা ইতিহাসের শিক্ষা ,, ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন।
এম, এ, পি, এচ, ডি।

১৬। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থান ,, সত্যভূষণ সেন।

১৭। মন্ত্রে পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ,, শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ।

১৮। শুক্র নীতি ,, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৯। রাঢ়ের কথা—শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন।

২০। গোপীবল্লভপুরের ইতিহাস—শ্রীযুত গদাধর দাস।

২১। প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময়—শ্রীযুত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

২২। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা—

২৩। নদীয়ার কথা—শ্রীযুত দীনবন্ধু চৌধুরী।

২৪। দু একটি সঙ্কেত—শ্রীযুত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

২৫। মেদিনীপুরের কথা—শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল।

পঠিত বলিয়া গৃহীত :—

১। বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব—শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাস,
এম, এ, বি, এল, পি, এইচ্।

২। বেদ রহস্য—শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩। রাজা বিক্রমকেশরী ও বণিকগণ—শ্রীযুত শিবচন্দ্র শীল।

৪। কণ্বারাম বা কণ্বাশ্রমের স্থান নির্ণয়—,, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,
এম, এ।

৫। নবদ্বীপ বিজয়ী পণ্ডিত—শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার সেন।

৬। মহাকবি কালীদাস বাঙ্গালী ছিলেন—শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রবন্ধগুলি পঠিত হইলে পর শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-শাখা।

স্বাস্থ্য-সম্মিলন মণ্ডপ।

৩রা বৈশাখ, প্রাতে ৯টা।

১। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু আই, এস, ও এম্, বি, এফ্, সি, এস, রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এচ্‌ ডি, মহাশয় এই বিজ্ঞান শাখায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল।

৩। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল :—

(ক) "পানীয় জলের বিশুদ্ধিতার আবশ্যকতা ও পল্লী গৃহে এবং গ্রাম সমূহে ইহা সরবরাহ করিবার উপায়"—লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দাস।

(খ) ছাগলের যক্ষ্মা রোগ :—

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্, বি, এম্, আর, এ, এস।

পাঠক—সভাপতি মহাশয়। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। অন্য প্রাণী যত সহজে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয় ছাগল তত সহজে হয় না।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন মহাশয় বলিলেন, অন্য প্রাণীর সহিত তুলনা করিলে ছাগ দেহে যক্ষ্মা রোগ আক্রমণ করিতে পারে না তাহা দেখা যায়। তবে সকল ঋতুতে ও সকল দেশের ছাগলকে যক্ষ্মা বীজাণু ইন্‌জেক্‌সন ও খাওয়াইয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করা দরকার—এ বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রবন্ধ লেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

(গ) "আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী" লেখক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্, এস্, সি পাঠক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ পাঠের পর বলিলেন যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র কথিত উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে যে সব সময়ে ঠিক ফল পাওয়া যায় না—নীচে Sediment পড়ে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

(খ) জ্যোতির্ম্মান মন্দির

লেখক—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম, এ।

(গ) পঞ্জিকা-সংস্কার—শ্রীবরেন্দ্র নাথ দেব।

৪। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয়ের ভৌগলিক সংস্থান বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদকে অনুরোধ করা হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দাস মহাশয় বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করিবার জন্য যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এবং তাহার ক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন সাহা বি, এ বিই মহাশয় বলিলেন যে আমাদের প্রচলিত Filter এ filtration head জল পরিষ্কারের সময় সর্ব্বদা সমান থাকে না সেইজন্য জলও ঠিক সমান ভাবে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু বিনোদ বাবুর আবিষ্কৃত ফিলটারে এই Filtration head টি সর্ব্বদা সমান ভাবে থাকে এইটি ইহার বিশেষত্ব। এই যন্ত্রের সাহায্যে অপরিষ্কার জল একটি পাত্রে থিতাইলে উপরিভাগ হইতে জল লইয়া Filter এর মধ্যে বালির উপর পড়ে। প্রাথমিক পরিষ্কারের কার্য্য প্রথমোক্ত পাত্রে (Chamber) হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কলসী Filter এ এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা সহজে স্থানান্তরিত করা চলে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে এইরূপ Filter পল্লীগ্রামে বিশেষ আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবু বলিতেছেন যে এই Filter এর মূল্য কম হইবে। তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্য-বাদার্হ।

৬। আগামী বর্ষের-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়কে আগামী বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল।

৭। আগামী বর্ষের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন :—

শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় আগামী বর্ষের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন সাহা বি,এ, বিই আগামী বর্ষের জন্য সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র জানা এবং শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

সাধারণ অধিবেশন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা

সভাপতি—শ্রীযুত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী।

১। বালকাগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত মাঙ্গলিক সঙ্গীত গীত হয়।

মাঙ্গলিক সঙ্গীত।

মধুর মিলনের বোধন শঙ্খ মুখর আজিকে ভুবনে,
দিশ দিগন্ত পুলকাকুলিত গীত গন্ধ বরণে;
মলয়ানিল সঞ্চারে বন কুসুম সুরভি বিতরি,
মুগ্ধ মানস নবীন হরষে অঙ্গ উঠিছে শিহরি;
মাধবী কুন্দ কৌমুদী মা'র বরণ বিভাসে নয়নে,
পঞ্চকে পিক বন্দনা গাহে পুলকে কুঞ্জ কাননে।
স্বচ্ছ সরসী বক্ষে মায়ের নলিন চরণ রাজিছে,
মঞ্জুল মণি-মঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণ বিবরে পশিছে;
এস এস প্রেম প্রণয় ব্যাকুল নিবিড় বাহুর বাঁধনে,
ভকতি-পুষ্প অঞ্জলি দানি' মা'র বরাভয় চরণে;
প্রাণ মন খুলি' তুলি' একতান আজিকে গগন পবনে,
জয় বীণাপাণি বিশ্ব-জননী জয় জয় বাণী সঘনে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মেদিনীপুর।

২। সভাপতি মহাশয়, সুকণ্ঠে সঙ্গীতালাপের জন্য শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গায়ক শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র মহাশয়কে দিবার জন্য যে পদক দান করিয়াছেন, তাহা শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী বাবুকে প্রদান করিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে গত রজনীতে প্রতিনিধিগণের মনোরঞ্জনার্থ প্রফুল্ল অভিনয়ে যোগেশ জগমণি ও রমেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দেব কিশোর আচার্য্য, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্ ও মন্মথনাথ দাস গুপ্ত এম, এ. বি, এল মহোদয়গণকে অভিনয় কৃতিত্বের জন্য যথাক্রমে শ্রীযুত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি ও তিনি নিজে এক একটি পদক দান করিবেন।

৪। ১ম প্রস্তাব—সাহিত্যিক ও সাহিত্য বন্ধুগনের পরলোক-গমনে শোক প্রস্তাব ; ১ম দিনের কার্য্য বিবরণের ১৪শ দফা দ্রষ্টব্য।

৫। ২য় প্রস্তাব—প্রস্তাবক সভাপতি মহাশয় "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ; সম্মিলনের গঠন কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সর্ব্বজন বিদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন এই সাহিত্য সম্মিলন সে চেষ্টার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছেন এবং বঙ্গদেশবাসীগণের নিকট এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মন্তব্য—(ক) তাঁহার একটি মূর্ত্তি (Bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্ত্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তর ফলক (Marble tablet) থাকিবে।

(খ) তাঁহার একখানি তৈল চিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(গ) তাঁহার গ্রন্থাবলীর উপযুক্ত সংস্কার প্রকাশিত হইবে। তাঁহার সহিত একটি জীবন চরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবন চরিত স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) গবেষণা পূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্য তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(চ) তাঁহার নামে একটী স্মৃতিভবন নির্ম্মিত হইবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি জড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

৬। পরিচালন—সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিয়া এবং সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

৭। তৃতীয় প্রস্তাব প্রস্তাবক—সভাপতি।

(ক) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন "রমেশ ভবন" নির্ম্মাণ কল্পে সমস্ত সাহিত্য সেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদি পূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হিন্দু মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কল্পে দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ (সার্কুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ সংসৃষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

তৃতীয় (ক) প্রস্তাব সম্পর্কে "রমেশ ভবন" কমিটির ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে "রমেশ ভবন" কমিটি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া "রমেশ ভবন" নির্ম্মিত হইবে এবং তজ্জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি হইতেছে। প্রায় ২৫০০০৲ টাকার উপযুক্ত একতলা বাড়ী সম্প্রতি প্রস্তুত করা হইবে এবং কিঞ্চিদধিক ২০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। চতুর্থ প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে এই

সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন কি উচ্চ সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং ইংরাজী ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও ইস্লামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বঙ্গভাষায় দিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস আচার ব্যবহার কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্ এ, পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ভাষা তত্ত্ব ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও সভ্যতা (Indian antiquities and culture) প্রভৃতির পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়ান্স ফ্যাকাল্টীর সদস্য-

পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গ ভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষায় ও সাহিত্যে ঐচ্ছিকমত পঠন পাঠন ও পরীক্ষা হইবে এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব আনন্দে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষা সমূহেও যাহাতে এই বিধি সত্বর প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বি, এ, এম, এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন তবে অল্পদিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্গ্রন্থ অচিরকাল মধ্যে বহুল পরিমাণে বঙ্গ-ভাষায় রচিত হইবে।

উপরি উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম, এ।
সমর্থক— ,, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
রাজা জগদীশ চন্দ্র দেও ধবল দেব বি, এ।

৯। পঞ্চম প্রস্তাব।

এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার উপর ভারার্পিত হউক। এবং তত্তদ্দেশবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয় তাহার ভার সম্মিলন পরিচালক-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু।
সমর্থক— ,, কেদার নাথ মজুমদার।
,, ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১০। ষষ্ঠ প্রস্তাব।

প্রত্যেক জেলার ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা সংক্রান্ত সাহায্য (Grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতি বৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতিবৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নির্দ্দেশমত প্রতি বৎসর শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা স্ব স্ব জেলায় প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক— ,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন।
,, রমেশচন্দ্র মিত্র।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি এবং ২৪ পরগণা জেলাবাসী তাঁহাদের জেলায় ঐতিহাসিক তথ্যাদি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠনের আয়োজন করিতেছেন।

১১। সপ্তম প্রস্তাব।

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদায়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় গ্রহণ করা হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত রাখাল চন্দ্র নাগ।
সমর্থক—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
শ্রীযুত জলধর সেন।

১২। অষ্টম প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন রেজেষ্টারীর ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঁকীপুরে ও হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতির কার্য্য এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। তদাবস্থায় মেদিনীপুরে সমবেত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন পরিচালন সমিতির উপর ভার দিতেছেন যে সম্মিলন রেজিষ্টারী করা আবশ্যক কি না সে সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিয়া যদি রেজিষ্টারী করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা হইলে হাওড়ায় নিযুক্ত সমিতির সহিত একযোগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রেজিষ্টারী করা স্থির হইলে যেন এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী এম্, এ, বি এল।
সমর্থক— " দুর্গাদাস রায়।
মৌলবী মহম্মদ কে, চাঁদ।

১৩। নবম প্রস্তাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

প্রস্তাবক—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
সমর্থক— শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস।
যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে প্রতিবর্ষে এই প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

১৪। দশম প্রস্তাব।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন সাধারণ সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক।

প্রস্তাবক – শ্রীযুক্ত রাধাকমল রায় এম্ এ।
" লালমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাধারণ সম্মিলন সমিতি :

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
স্যার ,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
,, ,, জগদীশ চন্দ্র বসু
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী
স্যার ,, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
,, ,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লদাস ঠাকুর
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
কুমার ,, অরুণচন্দ্র সিংহ
রায় ,, চুনীলাল বসু বাহাদুর
,, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
,, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
,, বিজয়লাল দত্ত
,, সচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ
,, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
,, শশধর রায়
,, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
,, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রাখাল রাজ রায়
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

মৌলবী শ্রীযুক্ত মনিরুজ্জমান
" " মহম্মদ আক্রাম খাঁন
" " নুর মহম্মদ
" " মোজাম্মল হক
" খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" হরিদাস পালিত
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" জলধর সেন
" বাণীনাথ নন্দী
" তারকচন্দ্র রায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
মিঃ " আসরফ আলি
মৌলবী " আবদুল বারি
" " আবদুল হামিদ
" " মোজাফর আহম্মদ
" " আবদুল হানিফ
" " কাজী ইস্‌দাদুল হক
" সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়
" রমাপ্রসাদ চন্দ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হুগলী।

১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী
২। " মন্মথ মোহন বসু
৩। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৪। কুমার " ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়
৫। " দেবেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল
৬। " অজয়চন্দ্র সরকার

নদীয়া।

১। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমি
৪। ,, মোজাম্মল হক্
৫। ,, মুন্সী মহম্মদ জমীরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ
৬। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ
৭। ,, বীরেশ্বর সেন

খুলনা।

১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
২। ,, সতীশচন্দ্র মিত্র
৩। ,, জগৎপ্রসন্ন রায়
৪। ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৫। ,, অশ্বিনীকুমার সেন
৬। মৌলবী মহম্মদ আতিকার রহমান খাঁ, মোক্তার সাতক্ষীরা

বরিশাল।

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
২। ,, নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
৩। ,, সুকুমার দত্ত
৪। ,, আশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবীশ
৫। ,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ
৬। ,, অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন
৭। মৌলবী হাসেম আলি খাঁ বি, এল

ফরিদপুর।

১। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায়
২। মৌলবী শ্রীযুক্ত রওশান আলী চৌধুরী
৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার
৪। ,, যতীন্দ্রমোহন রায়

৫। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্লাদার
৬। „ বিজয়চন্দ্র মজুমদার
৭। „ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া।

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়।
২। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৩। „ নিত্যধন মুখোপাধ্যায়।
৪। „ গিরিজাকুমার বসু।
৫। „ অক্ষয়কুমার সরকার।
৬। „ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
৭। „ মহম্মদ নরুলহক্।
৮। „ রুদ্রকুমার পাত্র চৌধুরী।
৯। „ বিধুভূষণ পাল চৌধুরী।
১০। „ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।
১১। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২। „ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৩। „ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৪। „ ব্রজমোহন দাস।
১৫। „ নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
১৬। „ রাধাচরণ কুণ্ডু।
১৭। „ সতীশচন্দ্র মিত্র।

ঢাকা।

১। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়।
২। „ রমণীকান্ত দাস।
৩। রায় „ সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর, প্রিন্সিপ্যাল ঢাকা-জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকা।
৪। „ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।
৫। „ বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।
৬। „ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৭। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
৮। „ অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।
৯। সৈয়দ তসদ্দাদ আলী।
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

২৪ পরগণা।

১। শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন।
মৌলবী „ মহম্মদ কে চাঁদ
„ ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
„ হেমচন্দ্র ঘোষ।
„ নিখিলনাথ রায়।
„ মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ।
„ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।
„ রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ হিরণকুমার রায় চৌধুরী।
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র।
„ মৌলবী মহম্মদ আলি, এম এল্ সি, বি এল্
বসিরহাট।

বর্দ্ধমান।

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর।
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সন্তোষকুমার বসু।
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ।
„ দেবেন্দ্র নাথ সরকার।
„ ক্ষীরোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়।
„ যোগেন্দ্র ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।

বীরভূম।

কুমার শ্রীযুক্ত মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
" নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়।
" শিবরতন মিত্র।
" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" মৌলবী মইনুদ্দিন জামেন।

বাঁকুড়া।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বাহাদুর।
" উপেন্দ্র নাথ দাস।
" রাখাল চন্দ্র নাগ।
" বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
" ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত মনীষি নাথ বসু।
" মহেন্দ্র নাথ দাস।
" সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্.এ।
" ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী
" মন্মথ নাথ দাসগুপ্ত।
" রাজা জগদীশ চন্দ্র ধবলদেব।
" মন্মথ নাথ বসু।

মুর্শিদাবাদ।

মহারাজা স্যর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়।
" নলিনীকান্ত সরকার।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়।
" রামকমল সিংহ।

যশোহর।

রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।
শ্রীযুত সতীশকণ্ঠ রায়।
" গিরিজা প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী।
" কেদার নাথ ভারতী।
" মৌলবী হবিবর রহমান।
" মুন্সী মহম্মদ কাসেম।

কাছাড়।

" ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।
" জগন্নাথ দেব।

গৌহাটী।

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।
শ্রীযুত বনমালী বেদান্ততীর্থ।
" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী।
" ভুবন মোহন সেন।
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

গোয়ালপাড়া।

রাজা শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর, আসাম।
" দ্বিজেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কুচবিহার।

কুমার নিত্যেন্দ্র নারায়ণ।
চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ।
আবদুল হালিম।
মৌলবী দীন মহম্মদ।

ময়মন সিংহ।

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী।
" রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।
" কেদার নাথ মজুমদার।
নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী।
সেখ আবদুল জব্বর।
" রামপ্রাণ গুপ্ত।
" ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

ত্রিপুরা।

কুমার সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্ম্মা, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
" নবদ্বীপ চন্দ্র দেব বর্ম্মা, কুমিল্লা।
" অনুকূল চন্দ্র রায়, কুমিল্লা।
" রজনী নাথ নন্দী ঐ
" বরদা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অষ্টগ্রাম, ত্রিপুরা।

নোয়াখালী।

" মহেন্দ্র কুমার ঘোষ।
" আবদুল ওয়াহেদ।
" আবদুল বারি।

চট্টগ্রাম।

রায় নবীন চন্দ্র দত্ত বাহাদুর।
শ্রীযুত বিপিন বিহারী নন্দী।
" ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী।
মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

রাজা ভুবন মোহন রায়।
সতীশ চন্দ্র ঘোষ।

বগুড়া।

নবাবজাদা সৈয়দ আল্‌তাফ আলী।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

বেণীমাধব চাকী।

দিনাজপুর।

মহারাজ জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর।

কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

" বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন।

" রামচন্দ্র সেন।

মৌলবী একেমুদ্দিন আহম্মদ।

মালদহ।

শ্রীযুত বিপিন বিহারী ঘোষ।

" কৃষ্ণচরণ সরকার।

ভাগলপুর।

শ্রীযুত কৃষ্ণ বিহারী গুপ্ত।

মহাশয় তারকনাথ ঘোষ।

শ্রীযুত প্রেমসুন্দর বসু এম্-এ।

মানভূম।

শ্রীযুত হরিনাথ ঘোষ।

" ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এল্।

বাঁকীপুর।

রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

শ্রীযুত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

" নরেশ চন্দ্র সিংহ।

" মথুরা নাথ সিংহ।

" রামলাল সিংহ।

শ্রীহট্ট।

শ্রীযুত রজনী রঞ্জন দেব।

„ অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

„ অচ্যুত চরণ চৌধুরী।

পাবনা।

শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায়।

„ রণজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী।

„ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত।

রাজসাহি।

মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর।

কুমার শরৎ কুমার রায়।

শ্রীযুত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

„ ব্রজসুন্দর সান্যাল।

পূর্ণিয়া।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ চন্দ্র ভটাচার্য্য।

রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর।

কটক।

শ্রীযুত যদুনাথ সরকার এম্ এ।

„ ভূপতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ

কাশী।

শ্রীযুত হরিহর শাস্ত্রী।

গয়া।

শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র সরকার।

মুঙ্গের।

শ্রীযুত হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি-এল্।

রাঁচী।

শ্রীযুত প্রমথ নাথ বসু।

দিল্লী।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পুরুষোত্তম সিংহ।

মীরাট।

নবকৃষ্ণ ঘোষ।

অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কানপুর।

সুরেন্দ্রনাথ সেন।

শচীন্দ্রনাথ সোম।

রঙ্গপুর।

মৌলবী রেয়াজুদ্দিন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদার বি এল।

রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

সেখ ফজলাল কারিম বি এল।

খান বাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দিন বি এল।

১৫। একাদশ প্রস্তাব।

পালিগ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার সম্মিলন পরিচালন সমিতির উপর অর্পিত হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

১৬। দ্বাদশ প্রস্তাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন কোথায় হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য সম্মিলন পরিচালন সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

১৭। ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

মান মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা সমিতিকে

অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
সমর্থক— " খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রস্তাবান্তর্গত শাখা সমিতির অন্যতম সভ্য রায় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে পঠিত হয় এবং পরে বিজ্ঞান শাখায় পঠিত হয়।

১৮। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ নিয়ম "বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে ২৲ দুই টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহারা এই চাঁদা দিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন।

(ক) সম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাব বিচার কালে মতামত প্রদান।

(খ) সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ একখণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্তি।

সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের উক্ত নিয়ম পাঠ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত নিয়মের ২৲ টাকা স্থলে ৪৲ চারি টাকা করা হউক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে পরিচালন সমিতি কর্ত্তৃক এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ সমিতির নির্দ্দেশ মত এই সম্মিলনে উহা গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হইল। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল; বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি তাহা গ্রহণ করেন নাই, এই জন্য ঐ সমিতির নির্দ্দেশমত এই সাধারণ সভায় উহা পুনরায় প্রস্তাব করা হইল।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং শ্রীযুত রাখালরাজ রায় এম্ এ, এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর মতদ্বৈধ হওয়ায় শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। তৎপরে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে অন্যূনতঃ তিন বৎসরের জন্য এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হউক।

১৮। চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

বঙ্গদেশ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ (Director of Public Instruction) এই সম্মিলনে যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ছুটীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য এই সম্মিলনের পক্ষ হইতে উক্ত শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাশ গুপ্ত।
সমর্থক—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
শ্রীযুক্ত বাণী নাথ নন্দী সাহিত্যা নন্দ।

২০। ধন্যবাদ প্রস্তাব—প্রতিনিধি ও পরিচালন সমিতির পক্ষে।

(ক) অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছা সেবকগণ কে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
ডাক্তার আবদুল গোফুর সিদ্দিকী।
শ্রীযুক্ত জলধর সেন।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

(খ) অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সভাপতিগণ কে, প্রতিনিধি ও দর্শকগণ কে

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি।
„ মন্মথ নাথ দাশ গুপ্ত।
„ দেবকিশোর আচার্য্য।

২১। সভাপতি শ্রীযুত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে অভ্যর্থনা সমিতিকে এবং সম্মিলনের সাফল্যের জন্য যাঁহারা যাঁহারা পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার স্বকর্ম্মী ও সুহৃদ স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত এই সম্মিলনের ও সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ এবং বঙ্গ ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম এবং প্রাণের আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া সকলকে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

২২। তৎপরে শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র মহাশয় শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ দাস রচিত "বিদায় গীত" নামক গান গাহিলেন।

বিদায় সঙ্গীত।

ওগো! দূরে ছিলে সেইত ভালো,
স্বপন হয়ে জাগ্‌ছে প্রাণে,
রূপ ধরে আজ এলে কেন,
মিটল না সাধ গন্ধে গানে।

কেন প্রাণের পরশ দিয়া,
তুল্‌লে হিয়া মুঞ্জরিয়া,
সুর হারা এই চিত্ত বীণা
গুঞ্জরিল্‌ তানে তানে।

যদি, পলক তরে চোখের দেখায়,
মিট্‌ল না'ক মিলন আশা,
মনের মাঝে হউক মিলন
প্রাণের পথে যাওয়া আসা।

শুধু, দাঁড়াও, দেখি আঁখি ভরে,
এঁকেনি এ হিয়ার 'পরে
এই হাসি, এই চোখের দেখা
জাগ্‌বে সবার নীরব ধ্যানে।

নাথ দাস।
মেদিনীপুর।

অনন্তর সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল।

সভার কার্য্য শেষ হইলে পর শ্রীযুত ডাক্তার নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় "ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার" নামক বক্তৃতা করিলেন ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের দ্বারা আলোক চিত্র দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

প্রতিনিধি বর্গের নাম।

১। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
২। রায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম এ, বি এল,
৩। শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ,
৪। রায় শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর
৫। " পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর
৬। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৭। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ.
৮। রায় জলধর সেন বাহাদুর
৯। শ্রীযুত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
বি এ, এটরণি এট ল,
১০। শ্রীযুত রামকমল সিংহ
১১। ডাক্তার একেন্দ্র নাথ ঘোষ
১২। শ্রীযুত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১৩। " হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ,
১৪। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী
১৫। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই,
১৬। " যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ,
১৭। " গণপতি সরকার
১৮। " মন্মথমোহন বসু এম এ,
১৯। " অনঙ্গমোহন সাহা
২০। " জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
২১। " নিবারণচন্দ্র দত্ত
২২। " অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩। " ব্রজমোহন দাস
২৪। " হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
২৫। " নৃপেন্দ্রনাথ রায়
২৬। " ফণীন্দ্রনাথ বসু

২৭। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। " হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
২৯। " চারুচন্দ্র মজুমদার বি এ,
৩০। " চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল,
৩১। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩২। পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী
৩৩। শ্রীযুত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৩৪। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ,
৩৫। " বিমানবিহারী মজুমদার
৩৬। কবিরাজ হেমেন্দ্র নারায়ণ দেব ডি এস্ সি,
কবিভূষণ সাহিত্যসাগর ভিষকশিরোমণী।
৩৭। শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
৩৮। " অমরকৃষ্ণ দেব
৩৯। " জ্ঞানদাচরণ দাস
৪০। " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী
৪১। " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
৪২। মৌলবী মহম্মদ কে চাঁদ
৪৩। শ্রীযুত রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ এম এ,
৪৪। " কেদারনাথ মজুমদার
৪৫। " ললিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
৪৬। " রাখালচন্দ্র নাগ
৪৭। " কুমার নরেন্দ্রকুমার লাহা
এম এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস্,
৪৮। শ্রীযুত সতীন্দ্র সেবক নন্দী
৪৯। " নলিনীকান্ত সরকার
৫০। " রাখাল রাজ রায় বি এ,
৫১। " হিরণকুমার রায় চৌধুরী এম এ,
৫২। কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন বিদ্যাবিনোদ বিদ্যাভূষণ,
৫৩। শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪। শ্রীযুক্তনগেন্দ্রনাথ রায়
৫৫। " কিরণচন্দ্র দত্ত
৫৬। " অবতারচন্দ্র লাহা
৫৭। " দক্ষিণারঞ্জন শর্ম্মা
৫৮। " জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ।
৫৯। " কৃষ্ণদাস বসাক
৬০। " পি, আপ্পাজী রাও বি এস সি
৬১। " দুর্গাদাস রায়
৬২। " বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৬৩। " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৬৪। " মহেন্দ্রনাথ মাহান্তি
৬৫। " মহেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
৬৬। " সত্যেন্দ্রচন্দ্র দে
৬৭। পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কবি
৬৮। শ্রীযুত বরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
৬৯। " চণ্ডীচরণ মিত্র
৭০। " বিধুভূষণ সৎপতী
৭১। " মণীন্দ্রকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ
৭২। " প্রেমাঙ্কুর আতীর্থ
৭৩। " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৪। " গিরিজানাথ বসু
৭৫। " যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৭৬। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
৭৭। " মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম এ বি এল
৭৮। " মন্মথনাথ নাগ
৭৯। " সুরেন্দ্রনাথ ভুঞা
৮০। " কাশীনাথ সেন গুপ্ত
৮১। " নলিনীনাথ দে
৮২। " সতীশচন্দ্র দত্ত

৮৩। শ্রীযুত দেব কিশোর আচার্য্য
৮৪। „ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৫। „ নটবর ঘোষ
৮৬। „ শরৎচন্দ্র দে
৮৭। „ রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্
৮৮। „ নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল
৮৯। „ বনবিহারী ভট্টাচার্য্য বি এ
৯০। „ দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ বি এল
৯১। „ শরৎচন্দ্র জানা এম এস সি বি এল
৯২। „ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার বি এ
৯৩। ডাক্তার হেমচন্দ্র সাঁতরা এম বি
৯৪। শ্রীযুত গোঁসাইদাস করণ
৯৫। „ রজনীকান্ত মল্লিক
৯৬। „ সূর্য্যকুমার অগস্তি এম এ, পি আর এস, সি এস্
৯৭। „ মন্মথনাথ মিত্র বি এল,
৯৮। „ বিভূতিভূষণ দাস
৯৯। „ নিবারণচন্দ্র মিত্র বি. এ,
১০০। „ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়
১০১। চৌধুরী যামিনীনাথ মল্লিক
১০২। ডাক্তার দুর্গাচরণ দাস
১০৩। শ্রীযুত মনীন্দ্রনাথ বসু সরস্বতী এম এ বি এল,
১০৪। „ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০৫। „ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ
১০৬। „ ব্রজমাধব রায়
১০৭। „ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল,
১০৮। „ ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত
১০৯। „ ব্রজনাথ চন্দ্র বি, এল
১১০। „ ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র বি, এল

১১১। শ্রীযুক্ত যতীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১১২। „ শ্রীধর নাথ চক্রবর্ত্তী
১১৩। „ মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল
১১৪। „ সত্যেন্দ্র নাথ বসু
১১৫। „ মৌলভী সমীমুদ্দিন আহম্মদ
১১৬। „ কিশোরীমোহন রায়
১১৭। „ মহেন্দ্র নাথ দাস
১১৮। „ দেবেন্দ্র লাল পাঞ্জা
১১৯। „ কুলদাচরণ বেজ
১২০। „ কবিরাজ অনুকূল চন্দ্র দাশ গুপ্ত
১২১। „ শ্রীযুত প্যারীমোহন ঘোষ
১২২। „ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু
১২৩। „ উপেন্দ্রনাথ মাইতি বি, এল
১২৪। „ ভূপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
১২৫। „ পণ্ডিত ভুবনচন্দ্র আর্য্যশিরোমণি
১২৬। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
১২৭। „ প্রফুল্লনাথ মিত্র
১২৮। „ গোবিন্দ চন্দ্র সেন
১২৯। „ পূর্ণচন্দ্র সেন
১৩০। „ ক্ষীরোদ নাথ চক্রবর্ত্তী
১৩১। „ ক্ষীরোদ নাথ বন্দোপাধ্যায়
১৩২। „ পরমেশ্বর সান্যাল
১৩৩। „ ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র
১৩৪। „ শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
১৩৫। „ হরিশ্চন্দ্র গিরি
১৩৬। „ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩৭। „ নগেন্দ্র নাথ জানা
১৩৮। „ কালীপদ দত্ত বি, এল
১৩৯। „ মহিম চন্দ্র দত্ত বি, এল

১৪০। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মণ্ডল বি, এল
১৪১। ,, রাজা জগদীশ চন্দ্র ধবল দেব বি এ,
১৪২। ,, নলিনী রঞ্জন বসু
১৪৩। ,, রমেশ চন্দ্র দত্ত
১৪৪। ,, চারুচন্দ্র সেন
১৪৫। ,, নটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৬। ,, বরেন্দ্র নাথ দেব
১৪৭। ,, নিবারণ চন্দ্র রায়
১৪৮। ,, ফকির দাস চন্দ্র
১৪৯। ,, ইন্দুভূষণ মিত্র বি, এল
১৫০। ,, গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র

ইহাদিগের মধ্যে ১৪৫ জনের প্রতিনিধি "প্রবেশিকা" আদায় হইয়াছে।

আয় ব্যয়ের বিবরণ

জমা।

১। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের চাঁদা ২৩৪ জন সদস্য ৩৲ হিঃ ৭০২৲

২। প্রতিনিধিগণের প্রবেশিকা ১৪৫ জন ২৲ হিঃ ২৯০৲

৩। সম্মিলনের নিমিত্ত সাহায্য প্রাপ্তি ৩০৫১।৶০

৪। টিকিট বিক্রয় বাবদ ১০০ জন ॥০ হিঃ ৪৬ জন।০ হিঃ ও ৵৫ অতিরিক্ত ৬১॥৵৫

৫। সম্মিলনের উদ্বৃত্ত সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় বাবদ ৬/০

মোট ৪১১১৵৫

মোট জমা—৪১১১৵৫

মোট খরচ—৩২০১৵৭॥০

বাকী জমা ৯০৯৸৶১৭॥০

সম্মিলনের উদ্বৃত্ত সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় বাবদ অনাদায়ী ১৭৫।০

খরচ।

১। ডাক টিকিট, টেলিগ্রাম, মনি অর্ডার ফিঃ ইত্যাদি বাবদ ৭৯।৶০

২। রেল ভাড়া ৭৫।/১৫

৩। গাড়ী ভাড়া ২৬১৲

৪। মণ্ডপ নির্ম্মাণ ৭০৬॥/০

৫। আলোক ৯৫৸১০

৬। অভিনয় ৭০৸৫

৭। সাজ সরঞ্জাম আদান প্রদানের জন্য ৪২।৶০

৮। কর্ম্মচারীর বেতন পদাতিক ২ জন মাসিক ১০৲ হিঃ দুই মাসে ৪০৲

৯। প্রতিনিধিবর্গের আহার্য্য ১৩০১॥১৭॥০

১০। স্বেচ্ছাসেবক ১১৫৸/৫

১১। মুদ্রণ ১১৯/০

১২। ভগ্ন বা অপহৃত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ ৩৪॥০

১৩। অন্যান্য খুচরা খরচ ১২৫৲৫

১৪। ফুল মালা ইত্যাদি ২৪/১০

১৫। আলোক চিত্র ৪২৲

১৬। ব্লক ৪৭॥০

১৭। দুঃস্থ সাহিত্যসেবীকে সাহায্য প্রেরণ ২০।০

মোট ৩২০১৵৭॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত। হিসাব পরীক্ষক।
সম্পাদক।

হিসাব-পরীক্ষার বিবরণী।

মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার দেয় প্রবেশিকা ৩৲ টাকা এবং সম্মিলন পরিচালন-সমিতির নিয়মানুসারে প্রতিনিধির দেয় "ফি" ২৲ টাকা নির্দ্ধারিত থাকায় অভ্যর্থনা সমিতির ২৩৪ জন সদস্যের ৭০২৲ টাকা এবং এবং ১৪৫ জন প্রতিনিধির নিকট হইতে ২৯০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত জেলার সাহিত্যানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে ৩০৫১৸/০ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে সম্মিলনের অধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশ লাভের জন্য সাধারনের পক্ষে আট আনা ও ছাত্রগণের পক্ষে।০ চারি আনা হারে টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় ॥০ আট আনা হারে ১০০ জনের নিকট হইতে ও।০ চারি আনা হিসাবে ৪৬ জন ছাত্রের নিকট হইতে মোট ৬১॥০ টাকা ও ভুল ক্রমে ৵৫ অতিরিক্ত আদায় হইয়া মোট ৬১॥৵৫ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। সম্মিলনের উদ্বৃত্ত দ্রব্য ও মণ্ডপ বিক্রয় বাবদ প্রাপ্য ১৮১।/০ টাকার মধ্যে ৬/০ টাকা আদায় হইয়াছে, বাকী ১৭৫।০ টাকা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির হস্তগত হয় নাই। সুতরাং সর্ব্বমোট ৪২৮৬।৵৫ টাকার মধ্যে ১৭৫।০ টাকা অনাদায় বাদে মোট ৪১১১৵৫ টাকা জমা হইয়াছে। টিকিট বিক্রয় ও সম্মিলনের উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও প্রতিনিধি 'ফি" বাদ দিলে দেখা যায় যে দুই মাসের মধ্যে ৩৭৫০।৶০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে; স্বল্প সময়ের মধ্যে আশাতীত অর্থ সংগ্রহ দানশীল, সাহিত্যানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণের বদান্যতা ও সম্মিলন পরিচালকবর্গের অদম্য উৎসাহ অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচায়ক।

সম্মিলনের টাকার যাহা কিছু জমা ("প্রবেশিকা", প্রতিনিধি 'ফি' ও সাহায্য), তাহার প্রত্যেকটিই প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দিয়াই সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১।	সম্মিলন মণ্ডপ নির্ম্মাণ	৭০৬॥/০
২।	ডাক টিকিট, টেলিগ্রাম, মণি অর্ডার "ফি" ইত্যাদি বাবদ	৭৯৷৶০
৩।	সম্মিলনের উদ্যোগীগণের রেল ভাড়া	৭৫৷৴১৫
৪।	গাড়ী ভাড়া	২৬১৲
৫।	আলোক	৯১৸১০
৬।	অভিনয় সংক্রান্ত	৭০৸৫
৭।	সাজ সরঞ্জাম আদান প্রদানের জন্য গাড়ি ভাড়া, কুলী খরচ ইত্যাদি	৪২৭৶০
৮।	দুই মাসের জন্য ভৃত্যের বেতন	৪০৲
৯।	প্রতিনিধিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবক, বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও ভৃত্যবর্গের আহার্য্য ও জলযোগ	১৩০১॥১৭॥
১০।	স্বেচ্ছাসেবক (নিদর্শন পরিচ্ছদ, গাড়ি ভাড়া, রেল ভাড়া ও স্থানান্তরে কার্য্যকালে জলযোগ)	২১৫৸/৫
১১।	মুদ্রণ ব্যয় কাগজ খরচ	১১৯/০
১২।	ফুল মালা ইত্যাদি	২৪/১০
১৩।	আলোক চিত্র ও ব্লক	৮৯॥০
১৪।	দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর সাহায্য	২০।০
১৫।	ভগ্ন ও অপহৃত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ	৩৪॥০
১৬।	অন্যান্য খুচরা খরচ	১২৫৲৫
	মোট	৩২০১৵৸॥০

জমা খরচের বই, রসিদ বই নিদর্শন পত্রের কাগজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সম্মিলনের হিসাব বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় হিসাব রক্ষকের কার্য্যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

মোট জমা— ৪১১১৴৫ টাকা।

মোট খরচ— ৩২০১৶৭৷৹ টাকা।

বাকী জমা—৯০৯৸৶১৭৷৹ টাকার মধ্যে

সম্মিলনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে ৮৯০৸৶১০ টাকা সম্মিলন সম্পাদক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে ১৯৴৭৷৹ টাকা মজুদ রহিয়াছে। মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি—এই উদ্বৃত্ত টাকার যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু

হিসাব পরীক্ষক।

সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের ২৯ শে মাঘ, ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সাল। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় বেলীহলে যে প্রথম সাধারণ সভা আহুত হয় তাহাতেই অভ্যার্থনা সমিতির কার্য্যকরী সভা গঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নির্ব্বাচিত হন,

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্, এ; পি, আর, এস্; সি, এস্।

অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি।

১। ডাক্তার এ, সুরাওয়ার্দ্দী বার, য়্যাটল; চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।
২। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ সাহস রায়।
৩। শ্রীযুক্ত রাজা জগদীশ চন্দ্র দেও ধবল দেব বি, এ।
৪। ,, ,, উপেন্দ্র নাথ মাইতি বি, এল্. চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটী।
৫। রায় মন্মথ নাথ বসু বাহাদুর বি এল।
৬। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্র বি, এল।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্,।
২। ,, ,, ক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত।

অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সম্পাদক।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল।
২। ,, ,, দেবকিশোর আচার্য্য।

৩। " " নলিনী নাথ দে।

৪। " " ব্রজমাধব রায়।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন বসু।

৬। " " শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী।

৭। " " মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল।

সাহিত্য শাখার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস।

দর্শন শাখার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মণীষি নাথ বসু সরস্বতী এম, এ, বি, এল।

ইতিহাস শাখার সম্পাদক।

বিদ্যাদিত্য জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

বিজ্ঞান শাখার সম্পাদক।

১। শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র জানা এম, এস, সি, বি, এল।

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

হিসাব পরীক্ষক।

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু।

২। শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশ গুপ্ত।

(ইনি বদলি হইয়া যাওয়ায় সত্যেন বাবু একা হিসাব পরীক্ষকের কার্য্য করেন)।

সম্মিলনের বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে নিম্নলিখিত শাখা সমিতি সমূহ গঠিত হয়।

১। মণ্ডপ নির্ম্মাণ সমিতি।

২। আহার ও বাসস্থান বন্দোবস্তের সমিতি।

৩। যান বাহন বন্দোবস্ত সমিতি।

৪। স্বেচ্ছা সেবক সমিতি।

৫। সম্মিলন কার্য্যালয় সমিতি।

অতঃপর কার্য্যকরী সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে নিম্নোক্ত মূল সভা ও শাখা সভায় সভাপতি নির্ব্বাচন এবং সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনায় আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা হয়।

মূল সভার সভাপতি রায়-শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি এল।

সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীযুত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। এম, এ,

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুর।

দর্শন শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর। এম, এ, বি, এল

ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি—শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর আই, সি, এস, মহাশয় শারীরিক অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্থলে রায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম, এ, বি এল মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

বিগত শনিবার বঙ্গাব্দ ১৩১০ সালের ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯২০ সালের ৯ই জুন তারিখে আহুত অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে সম্মিলনের আয় ব্যয়ের বিবরণ ও হিসাব পরীক্ষক মহাশয়ের মন্তব্য ও বিবরণী উপস্থাপিত করা হইলে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে উদ্বৃত্ত ৯০৯৮৶১৭৷৷০ টাকার মধ্যে সম্মিলনের কার্য্য বিবরণীর মুদ্রণ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা ও অনাদয়ী ১৭৫৷০ টাকা মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদ মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে দান করা হইল।

পরিশেষে আমাদের এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের সাফল্য কল্পে বাণীর বরপুত্র এবং বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর আশা ভরসাস্থল যে কয়জন মহাত্মা মূল ও শাখা সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত যে সব সহৃদয় সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাঁহারা সেবা

ও সাহায্য দানে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদে সকলকে জনে জনে এই অবসরে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহাই আমাদের ত্রয়োদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলার সহৃদয় সাহিত্যিকবৃন্দ আম দের এই দীন আয়োজনের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী, বিচ্যুতি, অক্ষমতা স্বীয় গু মার্জ্জনা করিয়া আমাদের অক্ষম শিরে তাঁহাদের অনাবিল স্নেহধারা ব করিবেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি।